প্রমথ চৌধুরী

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

সব্যসাচী প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজ-পত্র' তাঁর গাণ্ডীব। আর সবুজ-সভার সভ্যরা পাণ্ডব-সেনার দল। সাহিত্যের কুরুক্ষেত্রে সমগ্র গোষ্ঠীর সাহসিক সংগ্রাম ইতিহাস অস্বীকার করতে পারবে না; প্রমথ চৌধুরীর অধিনায়কতাও অবিস্মরণীয়। তিনি এক হাতে ভেঙ্গেছেন, অন্য হাতে গড়েছেন। অথচ দুঃখের কথা, আজও তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশিত হয় নি কিংবা সমগ্র সাহিত্যের সমালোচনা করা হয় নি। বীরবলের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর কাজটা এখনো দু'চারটি প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এখানে আমি প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য বিচার করেছি, বিশ্লেষণ করেছি—মনোজীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা থেকে শুরু ক'রে রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। এই রাজলেখকের সাহিত্যের একটা পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপণ করার দিকে আমার দৃষ্টি ছিলো। তবে সফল হয়েছি কিনা সে-বিচারের ভার পাঠকের ওপর। আমার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলবার আছে, আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি। প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। প্রমথ চৌধুরীর সুহৃদ ও শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন; তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেলে আমি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আশা রাখি।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বীরবলের ছবি ছাপাবার অনুমতি দিয়ে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ রচনায় উপদেষ্টার আসন নিয়েছিলেন, গ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪
আনন্দচন্দ্র কলেজ,
জলপাইগুড়ি

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

নিবেদন

অত্যল্পকালের মধ্যে 'প্রমথ চৌধুরীর' প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায়—কিন্তু মফঃস্বলে থাকায় আমি যথাসময়ে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারি নি। এর জন্যে সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বইটি পড়ে প্রশংসা করেছেন—কিছু কিছু ত্রুটিও নির্দেশ করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই সংস্করণে গল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি নূতন অধ্যায় যোগ করেছি, কবিতার বিস্তৃত আলোচনা দিয়েছি, সবুজ-পত্রের পূর্ণ সূচীপত্র সংকলন করেছি। বাঙলার সাহিত্য-পত্রের ইতিহাসে সবুজ-পত্রের স্থান নির্ণয় ও সবুজপত্রীদের প্রাসঙ্গিক পরিচিতি বর্তমান সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচনার পূর্ণতাসাধনের জন্যে পুরনো অধ্যায়গুলি সংশোধন করতেও চেষ্টা করেছি।

আর একটি কথা। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে সাময়িক পত্রে বীরবল সম্বন্ধে আলোচনা বেড়ে গেছে—এমন কি একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যন্ত্রস্থ বলে বিজ্ঞপ্তিও বেরিয়েছে। আমার এই আলোচনা-গ্রন্থ যদি বাঙলাদেশে প্রমথচর্চায় কিছুমাত্র সহায়তাও করে থাকে তবে আমি পরিতৃপ্ত।

বড়িষা বিবেকানন্দ কলেজ,
কলিকাতা—৮।
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

১
মনোজীবন

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের আকাশে প্রমথ চৌধুরী একটি একক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রূপের রাজ্যে তিনি ছিলেন বরপুত্র—সুন্দর অবয়বে, প্রশস্ত ললাটে, পরিচ্ছন্ন মুখে, খড়্গাকৃতি নাসায় ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তার প্রমাণ ছিলো। রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বররুচি—তাঁর সাহিত্যের আভিজাত্যে তার স্বাক্ষর আছে। জ্ঞানের পথে তাঁকে বলা যায় বরযাত্রী—তিনি সারাজীবন বই কিনেছেন, পড়েছেন, ভেবেছেন। রূপোর চেয়ে রূপকে, রূপের চেয়ে রুচিকে, রুচির চেয়ে ঋদ্ধিকে বড়ো মনে করতেন তিনি। তাঁর সাহিত্য-প্রতিভায় নব্যতা ছিলো—ছিলো অনন্যতা। লেখার সময় তিনি অনেক পেয়েছেন, কিন্তু অনেক লেখেন নি। তাঁর রচনার সংখ্যা পরিমিত হলেও শাণিত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বাঙলা দেশে প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে এক পরম বিস্ময়।

প্রমথ চৌধুরী জন্মেছেন যশোহরে, মানুষ হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। উন্নত হাস্যরসের লীলাভূমি ও রাজসিক আভিজাত্যের রঙ্গভূমি সেকালের কৃষ্ণনগর। খাঁটি সহরও নয়, আবার গ্রামও নয়—আধা সহর, আধা পাড়াগাঁ। অন্যান্যের সঙ্গে কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাক্‌রা আর কলুরা সেখানে বাস করতো—তাদের দোকানে প্রমথ চৌধুরীর ছিলো নিয়মিত আনাগোনা। শুঁড়ির দোকানে আর গুলির আড্ডায় তিনি গিয়েছেন—সেখানে দেখেছেন যত ছোটলোক আর আধা-ভদ্রলোকদের। কৃষ্ণনগর কলেজের উত্তরে মালোপাড়ায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাঝি আর জেলেরা বাস করতো। তাদের কাছেই প্রমথ চৌধুরী শিখেছেন—নৌকোর কোন্ অংশকে গলুই বলে, কাকে

পাটাতন বলে, আর কাকে. হাল বলে, পাল বলে, কাকে লগিমারা বলে, কাকে গুণটানা বলে। তিনি নিম্নশ্রেণীর ছোকরাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতেন। তাই তিনি লাট খাওয়া, কান্নি মারা, গোত্তা মারা, তাসের সুতো, রেলির সুতো, ফেটির সুতো, খরমাঞ্জা ইত্যাদি শব্দগুলির সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনি করে ছেলেবেলায় নানাশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তার ফল ভালোই হয়েছিলো। নানাজাতের, নানালোকের মুখ থেকে বাঙলা ভাষা শিখতে পেরেছিলেন তিনি। সেকালের নদে-শান্তিপুরের মৌখিক ভাষা ছিলো বেশ উন্নত ধরণের —ধ্বনি কিংবা অর্থ যে-কোন দিক থেকে বিচার করলেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়তো। প্রমথ চৌধুরী তাই সে-ভাষাকে নিজের ভাষার বনেদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বইয়ের ভাষা কখনো তাঁর আদর্শ ছিলো না, একথা তিনি নিজেই বলেছেন 'আত্ম-কথা'তে।

উদার ও সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিলো না। চৌধুরী পরিবার যাদব কীর্তনিয়ার বংশধর হয়েও চিরকাল ভক্তিহীন, শ্যামরায়কে কুলদেবতা রেখেও বৈষ্ণব নন তাঁরা। তার ওপর, প্রমথ চৌধুরীর বাবা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। তিনি দেবদ্বিজকে এড়িয়ে চলতেন, ভয় করতেন খৃষ্টধর্মকে। আসল কথা, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। তাই ছেলেবেলায় ধর্মশিক্ষা পান নি প্রমথ চৌধুরী।

পরিবার ধর্মশিক্ষার প্রতিকূল, তেমনি প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ। প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকালের কৃষ্ণনাগরিকেরা পঞ্জিকা-শাসিত ছিলো না, ছিলো না তাদের ধর্মের অন্ধসংস্কার। কথাটা বিস্ময়ের, না? বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান নবদ্বীপ, নবদ্বীপের লাগোয়া সহর কৃষ্ণনগর। হাঁ, লাগোয়া বটে—কিন্তু ভক্তিমার্গ থেকে অনেক

দূরে। কৃষ্ণনগর আর নবদ্বীপ ভিন্নপথের পথিক। প্রমথ চৌধুরী তাই ধর্ম-সংস্কারের স্পর্শ পান নি, পান নি সাম্প্রদায়িক ভেদ্‌বুদ্ধি। তিনি ছেলেবেলায় মানসিক খোলা হাওয়ায় বাস করেছেন, তাই গড়তে পেরেছেন একখানি সংস্কারলেশহীন ঋজু মন।*

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন রূপবান্। তাঁর পরিবারের পুরুষরা ছিলেন সুপুরুষ আর মেয়েরা ছিলেন গৌরবর্ণা সুন্দরী। বাড়ির পরিবেশ ছিলো সৌন্দর্যব্যঞ্জক। তাই প্রমথ চৌধুরী 'ছেলেবেলা থেকে রূপের ভক্ত', 'যে-রূপ চোখে দেখা যায় সে-রূপের চিরকালই অনুরাগী তিনি।' পাঁচ বছর বয়সে কোন এক মাতাল পিরালীবাবুকে বীরবল (প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম) জলকেলি করতে দেখেছিলেন —বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কথা তিনি মনে রেখেছিলেন—কারণ বাবুটির 'রং ছিল দিব্য গৌরবর্ণ'; কিন্তু পিরালীবাবুর সঙ্গিনী দু'টি স্ত্রীলোকের চেহারা তাঁর চোখে পড়ে নি, কারণ তাদের 'আর যে গুণই থাক্, রূপ ছিল না'। প্রমথ চৌধুরী প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেন, তখন কবিগুরুর অসামান্য রূপই তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। অর্থাৎ তাঁর চোখ নামক ইন্দ্রিয়টি ছিলো অত্যন্ত সচেতন, তাই রূপ কোনদিনই তাঁর চোখ এড়াতো না।†

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন গ্রন্থকীট্। কৈশোর তাঁর কেটেছে লাইব্রেরীর আবহাওয়ায়। তাঁর বাবার ছিলো ইংরেজী বইয়ের একটা বিরাট সংগ্রহ—দেশবিদেশের ইতিহাস, স্কটের উপন্যাস, শেক্সপীয়র-

---

* প্রমথ চৌধুরীর ছেলেবেলাকার কৃষ্ণনগরের সমাজ-জীবনের ওপর কৃষ্ণচন্দ্র-ভারতচন্দ্রের তেমন প্রভাব ছিলো বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি নিশ্চয়ই 'আত্ম-কথা'তে তার ইঙ্গিত দিতেন।

† প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য—'ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য, তাতে ঠুলি পরবার জন্য নয়।'

—বীরবলের চিঠি, বীরবলের হালখাতা।

মিল্টন-বায়রণের বই ছিলো তার মধ্যে। এই গ্রন্থাগারের আনুকূল্যে ছোটবেলাতেই প্রমথ চৌধুরীর ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। পরে অবশ্য তাঁর নিজেরই একটা লাইব্রেরী গড়ে ওঠে—ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের। সেখানেই তাঁর সময় কাটতো, লেখাপড়ায় তিনি দিন-রাত মশ্‌গুল হয়ে থাকতেন। তাই লিখেছেন :

লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা
কাজ আর খেলা।

ছেলেবেলাতেই বীরবল অনেক বাঙলা বই পড়েছেন,—যেমন বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, কৃষ্ণচন্দ্রের বাঙলার ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী-মৃণালিনী-বিষবৃক্ষ-কপালকুণ্ডলা, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, দীনবন্ধুর নবীনতপস্বিনী-লীলাবতী, কালী সিংহের মহাভারত। আর পড়েছেন হরিদাসের গুপ্তকথা। বালকের অপাঠ্য হলেও বইখানির চটক্‌দার ভাব, কথ্যভাষা ও চমৎকার ভঙ্গি তাঁকে খুশি করেছিলো। আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত 'বালক' পত্রিকা পড়তেন। পত্রিকাখানি তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। কারণ 'এর ভাষা অতি সহজ, এবং অতি চতুর, আর রসিকতায় টগ্‌বগ্‌ করতো'।

তখনকার দিনের কৃষ্ণনাগরিকেরা ছিলো যথার্থ হাস্যরসিক। 'সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বাভাবিক ছিলো। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চা করতো।' তাছাড়া, প্রমথ চৌধুরীর বাড়ির লোকেদেরও কথাবার্তায় থাকতো হাসির ছোঁয়াচ। তাই তিনি বাল্যকাল থেকেই মার্জিত হাস্যরসের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য

ইতরজনোচিত রসিকতা প্রমথ চৌধুরী বরদাস্ত করতে পারতেন না; তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'হেয়ার ইস্কুলে থাকতে আমি কলকাত্তাই ছেলেদের প্রতি তেমন অনুরক্ত হইনি। তাদের কথাবার্তা ছিল বিরস, তাদের ভাষা ছিল বিরস, আর তাদের রসিকতা সব বস্তাপচা।'

চৌধুরী পরিবার চিরকালই সঙ্গীত-ছুট্। কীর্তনিয়ার বংশধর হয়েও তাঁরা কীর্তনবিলাসী ছিলেন না। শুধু কীর্তনের কথাই বলি কেন, কোনরকমের সঙ্গীতেরই চর্চা হতো না চৌধুরী পরিবারে। তবে মাতৃসূত্রে প্রমথ চৌধুরী সঙ্গীতপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁর মামার বাড়িতে গানের আবহাওয়া ছিলো, আদর ছিলো, ছিলো নিরবচ্ছিন্ন চর্চা। মা সেখান থেকে সঙ্গীতপ্রিয়তা ও সঙ্গীতপটুতা নিয়ে এসেছিলেন, প্রমথ চৌধুরীর ভাগ্যে মিলেছিলো তারই ছিটেফোঁটা। তাই তাঁর গানের কান ছিলো, ছিলো গানের গলা। পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে এসে তাঁর সেই সঙ্গীতানুরাগ দৃঢ়তর হয়েছিলো, সন্দেহ নেই। ছেলেবেলায় বীরবল অনেক গান শুনেছেন, অনেক গানের আসরে মেতেছেন, অনেক গান গেয়েছেনও। কিন্তু সে আধুনিক গান নয়, ওস্তাদী গান। মার্গ সঙ্গীতেরই কান ও গলা ছিলো প্রমথ চৌধুরীর। গানের মধ্যে তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করতেন পূরবী—পূরবী শুনলে তাঁর মন দমে যেতো। শুধু ভাষার জন্যে নয়, সুরের জন্যেও। আসলে পূরবীর সুর ও স্যাঁতসেঁতে ভাব তাঁর হাস্যরসোচ্ছল ঝকঝকে মনের অনুকূল ছিলো না, তাই তিনি তা একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

'যার গলায় সুর আছে সে গান করতে বসলে তার সুর যেমন আপনা হতেই বাঁকে-চোরে আর ঘোরে; তেমনি যার মুখে ভাষা

ভাল, সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকেরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখার ভাষা। ফরাসীরা যাকে Jeu de mots বলে, সে খেলার চর্চা সে সহরেও করা হত।' এই কৃষ্ণনাগরিক পরিবেশই প্রমথ চৌধুরীকে বাক্‌চাতুরী শিখিয়েছিলো।

'কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা ছিল যথার্থ আর্টিষ্ট। তাদের মত প্রতিমা গড়তে অন্য প্রদেশের কুমোরেরা পারত না। সুন্দর প্রতিমা গড়া ত বড় শিল্পীর কাজ। কিন্তু কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা কেউ শিব গড়তে বাঁদর গড়ত না। প্রমথ চৌধুরী তাদের হাতের চমৎকার আহ্লাদী পুতুল দেখেছেন, যার দাম দু'পয়সা। ওর ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে, যা দেখে হাসি পায়। মুখ ব্যাদান করে এ পুতুল লোককে হাসায় না, হাসায় গড়নের গুণে। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্যরস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুল-নির্মাতাদের ছিল।'

'কৃষ্ণনগরে স্থাপত্যেরও সাক্ষাৎ পাই,—আর্কিটেক্‌চার। রাজবাড়ির চকফটক অতি সুন্দর আর রাজবাড়ির পূজোর দালান ও নাটমন্দির চমৎকার। এ ক'টিই মুসলমান স্থাপত্যের সুন্দর লক্ষণ। এর তুল্য পূজোর দালান ও নাটমন্দির প্রমথ চৌধুরী অন্য কোথাও দেখেন নি।' বীরবলের শিল্পী-মন গঠনে এসমস্তই সাহায্য করেছিলো, সন্দেহ নেই।

ছাত্র হিসারে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত কৃতী ; বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু কৃতবিদ্য হওয়া সত্ত্বেও পরের চাকুরী করতে তাঁর মন সরে নি। সরকারি বৃত্তি অযাচিতভাবে তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রহণ করতে রাজী হন নি ; বহরমপুর ও কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষের পদও প্রত্যাখ্যান করতে

তাঁর মন বিচলিত হয় নি। বস্তুতঃ, 'practical man' বলে যে গালভরা কথাটি আছে তার প্রতি বরাবরই বিতৃষ্ণা ছিলো প্রমথ চৌধুরীর। তাই সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর নজর কোনদিন দেখা যায় নি।*

তিনি নিজে যতই বলুন না কেন, একমাত্র কর্মবিমুখতাই এর কারণ, একথাটা স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত নই।

আসলে সাংসারিক লাভালাভ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রমথ চৌধুরীর মনের চরিত্রের পরিপন্থী ছিলো। তিনি ছিলেন সত্যিই—বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—'man of leisure and letters'। তাই পড়াশুনো শেষ করে অন্য সকলে যখন 'পদস্থ' হবার চেষ্টায় থাকে, প্রমথ চৌধুরী তখন হলেন 'পদাতিক'—বরফ দেখতে গেলেন দার্জিলিঙে, কয়লার খনি দেখে বেড়ালেন আসানসোল আর সীতারামপুরে, ছুটলেন বার দুই মধ্যপ্রদেশে, রবীন্দ্রনাথের সহচর হয়ে ঘুরলেন উত্তরবঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে চললো পড়াশুনো—ভালো করে সংস্কৃত পড়তে শুরু করলেন, শিখতে শুরু করলেন ইতালীয় ভাষা। অ্যাটর্নি আপিসের ধূলোভরা মোটা মোটা জীর্ণ খাতা ঘাঁটতে ভালো লাগলো না তাঁর—তার চেয়ে লোকেন পালিতের সঙ্গে অকারণ তর্ক করতে, 'সুরসিক ও reparteeতে সিদ্ধহস্ত' মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে আপোষে কথার তলোয়ার খেলতে তাঁর উৎসাহ ছিলো বেশি।

তারপর একদিন ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত রওনা হলেন; পথে রাত্রিবেলা প্যারিসের আর কিছু চোখে পড়লো না—শুধু চোখে

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য:

যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়।

——'ভারতচন্দ্র', প্রমথ চৌধুরী।

পড়লো রাজপথে আলোর মিছিল, বৃদ্ধ বয়সে সেই আলোর ছবি তাঁর দৃষ্টি থেকে মুছে যায় নি। লণ্ডনেও প্রমথ চৌধুরীর সৌন্দর্যপিয়াসী মন রইলো সজাগ। শীতের প্রারম্ভে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে গুঁড়ি-গুঁড়ি বরফ পড়তে দেখে তিনি প্রসন্ন হলেন না, হল্‌দে কুয়াশাও পছন্দ হলো না তাঁর।

এক সময় গেলেন ইতালী। মিলানে দেখলেন স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন—অদ্ভুত বাড়ি, তাতে নানা কারুকার্যময় জিনিসের সমাবেশ। বিশেষ করে একটি দোয়াতের শিল্পকর্ম মুগ্ধ করলো প্রমথ চৌধুরীকে। আর তার ভালো লাগলো ভিনিস—সারা সহরের জলপথ ও গণ্ডোলার সৌন্দর্য, এমন কি তাঁর নোংরা অংশ-গুলিও তাঁর চোখ এড়িয়ে গেলো না। রোমের আর্ট, এঞ্জোলার ছবি তাঁর মনোহরণ করলো। বীরবল বিলেতে ঘুরেছেন অনেক, দেখেছেন প্রচুর—কিন্তু নির্বিচারে সব কিছু মনের মধ্যে গ্রহণ করেন নি। তবে পর্লকে (যুক্তরাজ্য) মিসেস পার্নেলকে দেখে তিনি ভাবলেন, অল্প বয়সে মহিলা নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন। আর লঘু-চপল দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন শিয়াল-শিকারের (fox-hunting) বিষয়টাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনের যে ধাত নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন—অনেক কিছু দেখা শুনার পরেও তা বদলে যায় নি। এই কারণেই বিলেত যাওয়াটা তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হয়েছিলো কি না, সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিলো।

প্রমথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলেন—কিন্তু মন দিয়ে প্র্যাকটিস্ করলেন না কোনদিন। বড়োলোক আর বড়োমানুষী চালচলন দেখে বেড়াতে লাগলেন। কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো, মহারাজের ছেলেমেয়েদের নাচ দেখে খুশি হলেন তিনি। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় হলো

কলকাতার শৌখিন বড়োমানুষের দলের সঙ্গে। রাজা মহারাজাদের সঙ্গলাভ, গার্ডেন পার্টিতে যাতায়াত, ব্র্যাণ্ডি আর শ্যাম্পেনের অভ্যাস চললো কিছুদিন। উঁচু সমাজের বিলাসী আবহাওয়ায় দিন কাটতে লাগলো বটে, তবুও প্রমথ চৌধুরীর চোখ দেখতে ভুল করলো না লক্ষ্ণৌয়ের মনোহারিণী বাইজিকে, দার্জিলিংএ সাক্ষাৎ-পাওয়া সুন্দরী ফিঞ্চকে; মন গ্রহণ করতে ভুল করলো না সিমলার কাঞ্চী নামীয় গাইয়েদের। আশ্চর্যের বিষয়, নেপালী ভাষা শেখার চেষ্টাও তিনি এক সময়ে করেছিলেন।

ক্রমেই বীরবল একজন মজলিশী মানুষ হয়ে উঠলেন—কমল হীরে বিদ্যা আর তার দ্যুতি কালচারের সম্বল নিয়ে তাঁর 'কমলালয়ে' সাহিত্য মজলিশও গড়ে উঠলো। এই মজলিশের যজ্ঞেশ্বর ছিলেন তিনি স্বয়ং—আর তাঁর উত্তরসাধক ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সতীশচন্দ্র ঘটক, হারিতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় মজলিশটি বসতো—তবে অন্যান্য দিনেও কেউ কেউ এসে জমায়েত হতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনো সাহিত্যালোচনা, কখনোও সঙ্গীত-চর্চা হতো। শোনা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এস্রাজ বাজাতেন; দিলীপ রায় (যখন সভায় আসতেন), ধূর্জটিপ্রসাদ ও বীরবলের বাড়ির মেয়েরা গানে বা গানের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। সবুজ সভায় সকলেরই আপন মত ব্যক্ত করার ও তর্কে-বিতর্কে যোগ দেওয়ার অবাধ সুযোগ ছিলো; তবে সমস্ত বক্তব্যেরই লক্ষ্য থাকতেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা সেখানে

হতো। আলোচনার লক্ষ্য ছিলো—এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তারা বোঝা না হয়ে উঠে। মজলিশ স্বীকার করে নিয়েছিলো, বিনা বিচারে কোন কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড়ো নামই থাক্ না কেন। আলোচনার ধরণটা ছিলো হাল্কা, কিন্তু বিষয়বস্তু হাল্কা নয়।

এই সবুজ সভার বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রমথ চৌধুরীর ইতিহাস-চেতনা খুবই প্রখর ছিলো—বিশেষ করে য়ুরোপীয় ইতিহাসে। এমন কি একেবারে শেষ বয়সে, কলকাতা ছাড়বার আগে পাঁচ বছর—যখন পুরানো আড্ডা গিয়েছে ভেঙ্গে, অথচ নোতুন আড্ডাও গড়ে ওঠেনি—তখন তরুণ বন্ধুদের (ধূর্জটিপ্রসাদের ভাই বিমলাপ্রসাদ আর অমিয় চক্রবর্তীর ভাই অজিত চক্রবর্তীর) সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সন্ধ্যা কাটাতেন। বহুদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা য়ুরোপের সংস্কৃতি আর ইতিহাস, ধর্ম আর দর্শন, ইতালীয় আর ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা চালিয়ে গেছেন তাঁরা। তারপর শুরু হলো শান্তিনিকেতনে বাস ; গরমে পীড়িত হয়ে মাস চারেক পরেই ফিরে এলেন কলকাতায়—কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত নগরীতে মনের ঠাঁই খুঁজে পেলেন না, খুঁজে পেলেন না পুরানো বন্ধুদের। মজলিশী মানুষ প্রমথনাথ ফিরে গেলেন আবার শান্তিনিকেতনে। সবুজ সভা তাঁর জীবনে ছিলো অনেকখানি, তাকে হারিয়ে তিনি জীবনের এক বিরাট অংশ হারিয়েছেন। তাই কলকাতা দেখে তাঁর চোখও জুড়োয় নি, মনও খুশি হয় নি।

সবুজ সভার সভ্যরা, ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, নানাপ্রকৃতির মানুষ হয়েও প্রমথ চৌধুরীর দৌলতে 'মন' তৈরি করতে পেরেছিলো, সৃষ্টি করতে পেরেছিলো একটি বিশেষ মানসিক ধারার। তাঁদের

মূলমন্ত্র ছিলো বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—সভার যজ্ঞেশ্বরই ছিলেন দীক্ষাগুরু। বুদ্ধিবাদ যেখানে তর্কে (বিশেষ রীতিনীতি মেনে নিয়ে) অভিব্যক্ত, বাস্তবিকতা বা সাময়িকতার দাসত্ব থেকে মুক্ত—সেখানে বুদ্ধির স্বাধীনতা আছেই; অন্যদিকে অবরোহী যুক্তিসাধনা ব্যক্তিবাদেই পৌঁছে দেয়। তাইতো প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যের দল বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম আর রাজনৈতিক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেয় নি; বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জোরে মানসিক খোলা হাওয়ায় বাস করেছেন তারা। এই মন্ত্রসাধনার একটা মন্দ ফলও দেখা না দিয়ে পারে নি, সেটা হচ্ছে, ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি।

সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'ব্যক্তিত্বের মহারথে অপ্রতিহত গতি'; আর সেই ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় মজলিশটি হয়ে উঠেছিলো 'সাহিত্যিক মনের রসায়ন।' তাইতো নিজের জীবনকালেই তিনি ছিলেন একটি ইনস্টিট্যুশান। তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়তর। মনটেইন, বার্ণাড শ'য়ের মতানুসারে, 'was the greatest artist of all—he knew the art of living.' অর্থাৎ তাঁর কাছে জীবনায়ন ও শিল্পায়নে কোন পার্থক্য ছিল না, তাঁর ব্যক্তিপুরুষ ও শিল্পীপুরুষ ছিলো সমধর্মী। প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তা-ই। 'মনের যে আলোতে তাঁর সাহিত্যের প্রকাশ, তার রঙে তাঁর চরিত্রের নানা দিক রঙীন।'

নিঃসন্তান ছিলেন বীরবল, কোন স্নেহের অবলম্বন ছিলো না তাঁর। শেষ বয়সে ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন; তাকে পড়িয়েছেন, তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সেই কালীপ্রসাদ যেদিন বিমান যুদ্ধে মারা গেলো, সেদিন প্রমথ

চৌধুরীর মনে হলো, তাঁর 'জীবনের রস শুকিয়ে গেছে।' স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা তাঁর জীবনে কতখানি ছিলো, তাঁর বুদ্ধিগর্ভ সাহিত্য থেকে তা আন্দাজ করা কঠিন। তবে কালীপ্রসাদের ঘটনায় তার একটু পরিচয় নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়।

অর্থ প্রমথ চৌধুরীর কাছে নিরর্থক ছিলো না, কারণ তাঁর জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অর্থের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, টাকাকড়ির চিন্তাকে তিনি কখনও মনে ঠাঁই দেন নি। লক্ষ্মীর সাধনা করতে তাঁর আগ্রহ কোনদিন দেখা দেয় নি। তাইতো ব্যারিষ্টারিতে পসার তাঁর হলো না, পসার তিনি হতে দিলেন না। লিখতেন—টাকার জন্যে নয়—মনের খুশিতে। 'সবুজ-পত্র' নামক পত্রিকা বের করলেন, তার পেছনে খাটলেন অবিশ্রান্ত, লাভ হওয়া দূরের কথা, নিজের বহু টাকা লোকসান হলো। কিন্তু তার জন্যে আপশোষ করেন নি কোনদিন। এই ধরণের মানুষই হলেন প্রমথ চৌধুরী, এই হলো তাঁর মনের চরিত্র।

এই সব আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে করবেন না যে, প্রমথ চৌধুরীর সাংসারিক জীবন বলে কিছু ছিলো না। তিনি পারিবারিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে খবর রাখতেন, সংসারের বিচিত্র সুখদুঃখের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তবে সাংসারিকতার বোঝাকে তিনি কখনো মন ও জীবনের ওপর চেপে বসতে দেন নি। সংসারকে তিনি এড়িয়ে যেতেন না, কিন্তু এড়িয়ে যেতেন সাংসারিক তুচ্ছতাকে। বস্তুতঃ, সংসারের যে দিকটায় নীচতা আছে, মিথ্যার কারসাজি আছে, খিটিমিটি আছে—তার মধ্যে আর যা-ই থাক, শ্রী নেই। সংসারের এই শ্রীহীন ভারসর্বস্ব দিকটাকে ঘৃণা করতেন প্রমথ চৌধুরী। তাই তিনি 'গৃহী' হয়েও যথার্থ 'গৃহস্থ' ছিলেন না।

আসলে প্রমথ চৌধুরীর দু'টি জীবনের মধ্যে সাংসারিক জীবনটা ছিলো—'এহো বাহ্য'; তাঁর মনোজীবনটাই ছিলো—তাঁর কাছে যথার্থ গ্রাহ্য। 'অন্নময় ও প্রাণময় কোশের অন্তরে যে মনোময় কোশ, তিনি ছিলেন সেই লোকের অধিবাসী; সেখানেই তাঁর বাস্তুভিটা। ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যের জীবনটাই ছিলো তাঁর প্রকৃত জীবন।' তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'যেখানে সংসারের পাপতাপ, রোগশোক প্রবেশ করে না, যেখানে কাজের ভিতর শুধু শাস্ত্রচর্চা, যেখানে সুখদুঃখ নেই—কেবল চিরআনন্দ—সেদেশে কল্পনায় কাকে না নিয়ে যায়।'

———০———

২

'সবুজ-পত্র'

সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে তা একান্ত সহায়ক। সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে নোতুন ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শ প্রচার করা যায়, গড়ে তোলা যায় নোতুন লেখক-গোষ্ঠী। তাই সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই এর একটা বিশিষ্ট স্থান থাকে। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সমাচারচন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাধনা, সবুজ-পত্র, কল্লোলের মতো পত্রিকাগুলির অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। ভাষা ও সাহিত্যের নোতুন ঢঙ্ প্রচলনে ও নব্যপন্থী সাহিত্যিক সম্প্রদায় সৃষ্টির মধ্যে এদের গুরুত্ব অনুস্যূত হয়ে আছে। বস্তুতঃ, এই পত্রিকাগুলি বাঙলা সাহিত্যকে বিকশিত করার কৃতিত্ব অনেকখানি দাবী করতে পারে।

'সবুজ-পত্র' * প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য সৃষ্টি। পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি গড়ে তুলেছিলেন—বাঙলা সাহিত্যের 'বীরবলী যুগ' ও 'বীরবলী চক্র'। কালের বিচারে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁকে 'রবি-চক্রের' অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা,

* তেরশ একুশ সালের (১৯১৪) পঁচিশে বৈশাখ সবুজ-পত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে—প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও কালাচাঁদ দালালের প্রকাশনায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা ও বার্ষিক মূল্য দু' টাকা ছ' আনা নির্ধারিত হয়। সংখ্যাটির লেখক ছিলেন তিনজন—সম্পাদক নিজে, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' প্রথম উচ্চারণ করে সম্পাদক 'মুখপত্রে' আপন বক্তব্য নিবেদন করেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক মানুষ ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁর সম্ভবপর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বাশ্রয়ী ও সার্বভৌম প্রতিভা ছিলো। সেই প্রতিভা কম-বেশি আচ্ছন্ন করেছিলো সেই যুগের অন্যান্য সাহিত্য-সাধককে। কিন্তু রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও প্রমথ চৌধুরী আপন বৈশিষ্ট্যে ছিলেন আপনি স্বতন্ত্র, অবতারণা করেছিলেন বীরবলী যুগের। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত এক নবীন ও নব্যপন্থী লেখক-সম্প্রদায়—বীরবলী চক্রও—সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিলো। 'সবুজ-পত্র' ছিলো সেই বীরবলী যুগ ও বীরবলী চক্র সৃষ্টির মাধ্যম। তাছাড়া, আরও নানাদিক থেকে 'সবুজ-পত্রে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্য-সাহিত্য সাধুভাষায় লেখা হলেও মৌখিক ভাষার লৈখিক ভাষা হওয়ার দাবী মাঝে মাঝে উঠেছে। তখন যেমন গদ্য-গ্রন্থের ('আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ইত্যাদি) তেমনি সাময়িক পত্রিকার মারফতে মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ খৃঃ 'মাসিক পত্রিকা' নামে যে পত্রিকা বের হয়েছিলো, তার প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছে—'যে ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক।' কিন্তু সাহিত্যে মৌখিক ভাষা চালাবার এই সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিলো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; তাছাড়া, মৌখিক ভাষাকে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে তুলে যথার্থ সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টা তখন দেখা যায় নি, কারণ এই ধরণের চেষ্টার সময়ও তখন আসে নি। কিন্তু 'সবুজ-পত্রে'র যুগে মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে সাহিত্য রচনার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়; শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক মৌখিক ভাষাকে মণ্ডনকলার সাহায্যে সর্ব-

জনীন সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টাও চলতে থাকে। এই কারণেই 'মাসিক পত্রিকা'র চেয়ে 'সবুজ-পত্রে'র ভাষা-আন্দোলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজ যে বাঙলা সাহিত্যে মৌখিক ভাষা সাধুভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে—তার পেছনে আছে 'সবুজ-পত্রে'র অনন্য সাধনা।

রবীন্দ্র-প্রতিভা বিচিত্র; তাঁর গদ্য-সাহিত্যও সেই বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। একটু বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, তাঁর গদ্যের ভঙ্গি বারে বারে কম-বেশি বদল হয়েছে। তার মধ্যে 'সবুজ-পত্রে'র সমকালীন গদ্যরীতির নবরূপ বিস্ময়কর। এই সময়ের রবীন্দ্র-গদ্য মৌখিক ভাষায় রচিত; তা অনাড়ম্বর সৌন্দর্যবিশিষ্ট epigrammatic, সচল, সবল ও মধুর। শিল্পীসুলভ বৈচিত্র্যপূজারী রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব গদ্যরীতির পেছনে আছে 'সবুজ-পত্রে'র (এবং প্রমথ চৌধুরীর) প্রভাব। এর আগে 'ছিন্নপত্র', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী' ইত্যাদিতে তিনি মৌখিক ভাষা ব্যবহার করলেও মৌখিক ভাষা তাঁর গদ্যরচনার একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে নি। কিন্তু 'সবুজ-পত্র' প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সমগ্রভাবে মৌখিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করলেন—তা আর কোনদিন পরিত্যাগ করেন নি। এটা পত্রিকাটির পক্ষে যথার্থই গর্বের কথা।

'সবুজ-পত্র' গতানুগতিক ধরণের পত্রিকা ছিলো না। পত্রিকাটি পুরানো চিন্তা ও অস্পষ্ট মনোভাবকে কখনোই প্রশ্রয় দিতো না। নোতুন নোতুন বিষয়ের জ্ঞান আহরণ করা ও দেশ-বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন মত ও পথকে যাচাই করা তার অন্যতম মুখ্য কর্ম ছিলো। বস্তুতঃ, বিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সমাজ ও সাহিত্যের ভাব-সমৃদ্ধিতে 'সবুজ-পত্রে'র অবদান অসাধারণ।

বর্তমান দুনিয়ায় হৃদয়ের পথ প্রায় ব্যতিল হয়ে গেছে। আজকের যুগ বুদ্ধির যুগ। 'সবুজ-পত্র' এই যুগগত বুদ্ধিবাদকে, সর্বদিদৃক্ষু মননশীলতাকে বাঙলা দেশে প্রচার করেছে। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশের আবিষ্কার হচ্ছে—গণবাদ (গণতন্ত্র), সমাজতন্ত্রবাদ, প্রগতিবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদ। এর মধ্যে প্রগতিবাদ প্রচারে 'কল্লোলের' এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে 'পরিচয়ের' কৃতিত্ব অধিকতর হলেও অন্য তিনটি মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব প্রধানতঃ 'সবুজ-পত্রের' প্রাপ্য। তাই 'সবুজ-পত্রকে' বলা যায় বিংশ শতাব্দীর বাঙলার আধুনিকতার অন্যতম প্রধান বাহক।

বাঙলা দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ; বাস্তবিক নয়, মানসিক। বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাচক্রে ও অন্তর্নিহিত ভাবাবর্তে বাঙালীর মনোজগতের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গিয়েছিলো। এই কারণেই তখন বাঙলা দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছিলো মানসিক সংগঠনের। 'সবুজ-পত্র' সেই মানসিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করেছিলো। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘোষণা করেছিলেন—'যৌবনে দাও রাজটীকা'। প্রমথ চৌধুরীও তার জের টেনে লিখেছিলেন—'যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষ সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাঙালী-সমাজের মানসিক সংগঠনের অঙ্গ হিসেবে শাশ্বত যৌবনের মন্ত্রপ্রচার করে 'সবুজ-পত্র' একটা ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে। বলা দরকার, এই শাশ্বত যৌবনের মন্ত্র যুক্তিবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদের ভেতর দিয়েই উচ্চারিত হয়েছে।

বীরবল আমাদের মনকে চিরপ্রচলিত মতবাদের খুঁটি ছেড়ে 'নড়ে বসতে' শিখিয়েছেন। ঐতিহ্যের যে বিপুলকায় স্তম্ভের পেছনে বসে

থেকে থেকে আমাদের দৃষ্টি চারপাশের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে মুক্ত বিচরণে বাধা পাচ্ছিলো, বীরবল তার বেষ্টনীর চারপাশে আমাদের চোখকে উঁকিঝুঁকি মারতে শিখিয়েছেন। মনের যে স্প্রিংয়ে দীর্ঘ অব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে মরচে ধরেছিলো, তাকেই আবার Paradox-এর তেল দিয়ে স্থিতিস্থাপক করতে চেয়েছেন। 'সবুজ-পত্রের' পাতাগুলি তাই স্বাধীন চিন্তার বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হয়েছে। আসল কথা, প্রমথ চৌধুরী মানুষের জীবনকে স্থাণুত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে চলতে শেখাবার জন্যেই 'সবুজ-পত্রে' কলম ধরেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর নিজের দিক থেকে 'সবুজ-পত্রের' গুরুত্ব কতখানি বিচার করে দেখা যাক।

পত্রিকাটির জন্মের পূর্বেও তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন এবং সেই সমস্ত রচনায়ও বীরবলসুলভ রচনারীতি, ভাষারীতি, ভাববৈচিত্র্য, চিন্তাস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিধর্ম ও প্রসাদগুণের সন্ধান পাওয়া যায়। জয়দেব (?), হালখাতা (১৩০৯), কথার কথা (১৩০৯), আমরা ও তোমরা (১৩০৯), তেল, নুন, লক্‌ড়ি (১৯০৫), মলাটসমালোচনা (১৩১৯), তরজমা (১৩১৯), বইয়ের ব্যবসা (১৩২০), সনেট কেন চতুর্দশপদী ? (১৩২০), নোবেল প্রাইজ (১৩২০) ইত্যাদি রচনায় যে ভাবধর্ম (contents) ও রূপকর্ম (form) প্রকাশ পেয়েছে—'সবুজ-পত্রের' যুগে তার কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। 'জয়দেব' প্রবন্ধ প্রমথ চৌধুরীর প্রথম রচনা এবং এই রচনাটি 'সবুজ-পত্রে' পুনঃপ্রকাশ (আষাঢ়, ১৩২৭) করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, তখনো জয়দেব সম্বন্ধে তাঁর পূর্বমতের বিশেষ কোন বদল হয় নি। এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যেক মতামতের পেছনেই 'একটি বিশেষ জাতির মন আছে নূতন দেশকালের স্পর্শে যে মনের জাত যায় না'। তাঁর রচনারীতিও প্রথম থেকেই অনেকটা নির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করেছিলো।

তবে একথা ঠিক, 'সবুজ-পত্র' নিজের কাগজ হওয়ায় প্রমথ চৌধুরী অগণ্য বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও 'সবুজ-পত্রের' যুগে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা ও বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আর একটি কথা। এই পত্রে তিনি বাঙলার সাহিত্যিক সমাজকে শিখিয়ে দিলেন—নীবস বস্তুকে কি করে সরস কবে পরিবেশন করতে হয়, লিখতে জানলে বাঙলার প্রজাস্বত্ব আইন থেকে ('রায়তের কথা') ইতিহাস ('অনু-হিন্দুস্থান') পর্যন্ত সব বিষয় নিয়ে 'সাহিত্য' রচনা করা যায়। এই ধরণের প্রবন্ধ তিনি নিজেই শুধু লেখেন নি, অন্যকেও লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন—যেমন সতীশচন্দ্র ঘটক ও জ্যোতি বাচস্পতির লেখা 'গাছ' নামক প্রবন্ধ।

গল্প-রচনায় প্রমথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠার মূলে আছে 'সবুজ-পত্র'। পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য মৌলিক গল্প তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু 'সবুজ-পত্রের' দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই তিনি স্বরচিত গল্প প্রকাশ করতে শুরু করলেন—পাঠককে একে একে উপহার দিলেন—চার-ইয়ারী কথা, আহুতি, বড়বাবুর বড়দিন, একটি সাদা গল্প, ফরমায়েসি গল্প, ছোটগল্প, অদৃষ্ট ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। বস্তুতঃ, এই গল্পগুলি বাদ দিয়ে গল্প-রচয়িতা প্রমথ চৌধুরীর মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক ও কবি হিসেবে তাঁর অল্প-বিস্তর খ্যাতি ইতিপূর্বেই দেখা দিয়েছিলো ; কিন্তু গল্প-লেখক প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সবুজ-পত্রের' মাধ্যমে। এর কারণ দু'টি হতে পারে। হয়ত বীরবলের প্রবন্ধ ও কবিতার রচনারীতির চেয়ে তাঁর প্রবন্ধাত্মক ও তর্কবিতর্কসঙ্কুল গল্পের রচনারীতি তৎকালীন সাময়িক পত্রিকার

সম্পাদকদের কাছে অধিকতর বিস্ময়কর মনে হয়েছিলো এবং তাঁর গল্প প্রকাশ করার মতো সাহস তাঁদের ছিলো না। তাই যখন 'সবুজ-পত্র' প্রকাশিত হলো, একমাত্র তখনই নিজস্ব ধরণের গল্প লেখার সুযোগ তিনি পেলেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, গল্প-রচনার প্রতিভা যে তাঁর আছে এ-ধারণা প্রমথ চৌধুরীর নিজেরই ছিলো না, পরে শুভানুধ্যায়ীদেব কাছে উৎসাহ পেয়েই (রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে গল্প লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন—একথা তাঁর একপত্র থেকে জানা যায়) তিনি 'সবুজ-পত্রে' গল্প লিখতে শুরু করেন। সে যাই হোক্, গল্প-লেখক প্রমথ চৌধুরীকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব প্রধানতঃ 'সবুজ-পত্রের' প্রাপ্য।

মোটকথা, 'সবুজ-পত্রে' প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের গোড়াপত্তন না হলেও পত্রিকাটির মধ্য দিয়েই তাঁর অনন্য প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। 'সবুজ-পত্রের' নিশান উড়িয়েই তিনি সাহিত্যের পথে জয়যাত্রা শুরু করেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সারস্বত হিসেবে। এইদিক থেকে পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার্য।.

এবার বাঙলা সাহিত্যপত্রের ইতিহাসে 'সবুজ-পত্রের' স্থান নির্ণয় করা যাক।

প্রমথ চৌধুরীর জন্মের (১৮৬৮ খৃঃ) কিছু পরেই (১৮৭২ খৃঃ) বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সগুলির স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত, কিন্তু তাতে বাঙলার অতীত থাকলেও ছিলো না তার ঘরের কথা। কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' ডানায় ভর করে যেদিন তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি দেখা দিলো, সেদিন বাঙালী তার ঘরের কথা শুনে উল্লাস বোধ না করে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো

রাজবত্নুন্নতধ্বনির্"।' এবং মুষল ধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিম বাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল। পত্রিকাটি সমালোচনারও এক নোতুন আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে—শুধু ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার দিক থেকে নয়, নীতি ও রুচির দিক থেকে, রস ও রূপের দিক থেকে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ স্থাপন করে। অক্ষম রচনার সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' নির্মম কঠোর ছিলো; প্রতিভাহীন অনুকারকদের সাহিত্য-জঞ্জাল দূর করার জন্যে বঙ্কিম পত্রিকাটিতে সমালোচনার সম্মার্জনী হাতে নিয়েছিলেন। শুধু এই ধ্বংসের উদ্দেশ্য নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ছিলো 'বঙ্গদর্শনের'—কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে, ভাবনায় বাঙলার শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করে তোলার লক্ষ্য তার ছিলো; শাস্ত্রে ও ইতিহাসে আলোকপাত করে দেশবাসীকে ঐতিহ্যচেতনায় ও বিচারবুদ্ধিতে স্বপ্রতিষ্ঠ করার প্রয়াস ছিলো তার। এই সব কারণে বঙ্কিমকে ঘিরে 'বঙ্গদর্শনের' আসরে গড়ে উঠলো এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী; তাঁরা বিরাট প্রতিভার যাদুস্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠলো, সমধর্মিতার সৌষম্যে তাঁদের রচনায় দেখা দিলো সুরের ঐক্য। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বহু রচনার অজ্ঞাত লেখকসৃষ্টিতে বঙ্কিম ও 'বঙ্গদর্শনের' কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—'বঙ্গদর্শন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু আলঙ্কারিক অর্থে নহে—আক্ষরিক অর্থেই যুগান্তকারী। বঙ্গদর্শন

শুধু বঙ্কিমের প্রতিভার বাহক নহে, সেই যুগেরই প্রতিভার বাহন ছিলো।'

একথা শুধু বঙ্কিমের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯—১২৮২ সাল) নয়, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১২৮৪—১২৮৯ সাল) সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—কারণ এই সময়েও পত্রিকাটির নেপথ্যে ছিলেন বঙ্কিম। তারপর দীর্ঘদিন পরে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির সম্পাদকত্ব (১৩০৮—১৩১৩) গ্রহণ করেন। সম-সাময়িক 'বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে' প্রতিফলিত করার আদর্শ গ্রহণ করছিলো নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'। কবিগুরু নিজে পত্রিকাটিতে অজস্র প্রবন্ধ (হিন্দুত্ব, ব্যাধি ও প্রতিকার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শ, ধর্মের সকল আদর্শ, মাভৈঃ ইত্যাদি সমাজ-ধর্ম-স্বাদেশিকতা-বিষয়ক প্রবন্ধ), 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' উপন্যাস, অনেকগুলি সমালোচনা ('শুভ বিবাহ', 'জুবেয়ার', 'কবিচরিত', 'কবিবিজ্ঞান', 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি), 'উৎসর্গ' ও 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাসম্ভারে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ করেন ; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরাও লেখক হয়ে পড়েন। শুধু লেখা ও লেখক সৃষ্টি নয়, অর্থ সংস্থানও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় কর্তব্য হয়ে পড়েছিলো ; কিন্তু 'বঙ্গদর্শনের' দায়িত্বকে 'মহৎ কার্যের' দায়িত্ব মনে করে 'কষ্ট ও ত্যাগ' স্বীকার করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনকে' যেমন বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে সাহিত্যপত্র হিসেবে সার্থকতা লাভ করিতে দেখি।

'ভারতীর' (১২৮৪) প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেও তার সম্পাদকীয় দপ্তর বদল হয়েছে বারে বারে—স্বর্ণকুমারী দেবী,

হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক হিসেবে 'ভারতীর' আসর জুড়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের আমলে (যখন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীর সম্পাদক চক্রের বাইরে ছিলেন না'—জীবনস্মৃতি) রবীন্দ্রনাথের অজস্র গদ্য-পদ্য রচনা 'ভারতীতে' আত্মপ্রকাশ করে (ভানুসিংহের পদাবলীর সাতটি পদ, 'করুণা' উপন্যাস, ভগ্নহৃদয়, ভগ্নতরী, কবিকাহিনী, প্রভাতসঙ্গীত ও সন্ধ্যাসঙ্গীতের অনেক কবিতা, মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা ইত্যাদি)। বস্তুতঃ, পত্রিকাটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই-বোন-আত্মীয়-পরিজনেরা মিলে এক সাহিত্যের আসর জমিয়েছিলেন—তাতে বাঙলা দেশের পাঠকদের রসিক-চিত্তের খোরাক জুটেছিলো অনেক। স্বর্ণকুমারীও বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে আঠারো বছর 'ভারতী' সম্পাদনা করেন—তাঁর আমলেও রবীন্দ্রনাথের দান থেকে পত্রিকাটি বঞ্চিত হয় নি। নবীন লেখক তৈরি করা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিলো, তাই তাঁদের উৎসাহ ও সহানুভূতি জানাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। সরলা দেবীর সম্পাদনা-কালে অন্যান্যের সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'ভারতীর' বিশিষ্ট লেখক হয়ে ওঠেন। ১৩০৫ সালে এক বৎসরের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকাটির সম্পাদকরূপে দেখতে পাই—বলেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রবন্ধ ও কবিতা এবং কবিগুরুর গল্প ও কবিতার সমাবেশে পত্রিকাটির সৌষ্ঠব ক্রমে বেড়ে ওঠে। সৌরীন্দ্রমোহন ও মণিলালের যুগ্ম-সম্পাদনায় যখন 'ভারতী' প্রকাশিত (১৩২২-১৩৩০), তখন 'ভারতীর দল' বা 'ভারতী-গোষ্ঠী' নামে এক সাহিত্যিক মধুচক্র গড়ে উঠেছিলো—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায় ইত্যাদি অনেক কবি-লেখকই ছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'ভারতী' নিঃসন্দেহে উঁচু জাতের পত্রিকা; দীর্ঘদিন তা বাঙালী পাঠকেব সেবা করেছে, বহু নবীন লেখক সৃষ্টি করেছে, অপরিমিত সাহিত্যসম্ভার পরিবেশন করে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, ফলে বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'ভারতী' বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অবশ্য সাত সম্পাদকের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হওয়ায় সব সময় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধির একমুখিতা ছিলো না—তার 'চরিত্রের' অখণ্ডতা ও বিশুদ্ধতা এবং সাহিত্যাদর্শের স্থিরতা অক্ষুণ্ণ থাকে নি। দীর্ঘদিন টিকে থাকার অপরাধে তার মধ্যে সদাসর্বদা ভাব ও ভাবনার নূতনত্বের সন্ধান মেলে নি, মাঝে মাঝে পত্রিকাটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

'সাধনা' (১২৯৮) ছিলো রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর বাড়ির লেখকদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। প্রত্যক্ষতঃ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, কিন্তু তার আসল সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। কবি 'সাধনার' জন্য লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, এক উপবেশনেই (sitting) ডায়ারি, গল্প, কবিতা লিখে চলতেন—ক্লান্তি বোধ করতেন না। এই সময়েই তাঁর মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ (greatest intellectual expansion) ঘটেছিলো; 'সাধনার' জন্যে লেখাকে তিনি সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—'সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণ ছিল।' এই পত্রিকায় তিনি অনেকগুলি বিখ্যাত প্রবন্ধ ('আধুনিক সাহিত্যে' তার অনেকগুলি গ্রন্থিত) লেখেন, 'হিতবাদীতে' যে গল্প-সাহিত্যের গোড়া পত্তন করেন—তারই জের টেনে 'সাধনার' পৃষ্ঠা ভরিয়ে তোলেন গল্পের ধারায়; পত্রিকাটিকে তাঁর কবিতাসম্পদ থেকেও

তিনি বঞ্চিত করেন নি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মুখে শুনতে পাই—'আকার ছিল তার সাধারণ কেতাবের মত। এখনকার অনেক পত্রিকার মত আকারে সে মস্ত ডাগর না হলেও 'সাধনা' হয়ে আছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে ল্যাণ্ডমার্ক বা ক্ষেত্রসীমা চিহ্নের মত—যেমন হয়ে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা যখন সিদ্ধির সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে, সেই সময়েই সাধনার আত্মপ্রকাশ। সুতরাং সাধনা নামটি হয়েছিল রীতিমত যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তার প্রধান লেখক, মাসে মাসে সব্যসাচীর মত সাধনাকে তিনি সাজাতেন কবিতা দিয়ে, গল্প দিয়ে, প্রবন্ধ দিয়ে, সমালোচনা দিয়ে—এমন কি অনুবাদ দিয়েও। সাধনার মধ্যে লিপিবদ্ধ তাঁর তৎকালীন সাহিত্যাশ্রমের বিচিত্র ইতিহাস। কিন্তু কেবলই কি রবীন্দ্রনাথ? ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন আর এক বিস্ময়কর সাহিত্যশিল্পী—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর প্রতিভাপদ্ম সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হবার আগেই খ'সে পড়েছে ঝোড়ো বাতাসে। সাধনাতে তিনিও নিয়মিত লেখনী চালনা করতেন।··· তার উপরে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনও তিনি শিল্পাচার্য হন নি—তুলি ও কলম নিয়ে খেয়ালের খেলা শুরু করেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবি লিথোগ্রাফ বা শিলাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে সাধনার পৃষ্ঠাকে করত অলঙ্কৃত।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ইত্যাদি লেখকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ণ যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গদ্য-পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া' চলেছেন—তখন বাঙলা দেশ নিঃসন্দেহে একটি খাঁটি সাহিত্যপত্রের সন্ধান পেয়েছিলো।

'সাহিত্য' (১২৯৭) সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলো, সন্দেহ নেই। পত্রিকাটি অনূদিত বিদেশী গল্পের

অজস্র সম্ভার বাঙলা দেশের পাঠককে উপহার দিয়েছে, নূতন ধরণের উপন্যাসের বিচিত্র স্বাদ ও সৌরভে তৃপ্ত করেছে রসপিপাসু পাঠককে। সমালোচনায়ও দেখি, প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশতের' ওপর লেখা প্রিয়নাথ সেনের বিখ্যাত প্রবন্ধটি পত্রস্থ করতে সমাজপতি অস্বীকার করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থ-সলিলের' অনেকগুলি কবিতা ও প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি সনেটও প্রথম 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। তবে রক্ষণশীলতাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ায় তিনি যতখানি গড়েছেন, তার চেয়ে ভেঙ্গেছেন অনেক বেশি। 'অচলায়তনের' নাট্যকারকে 'ব্রাহ্মণ কালাপাহাড় লেখক' নাম দিয়ে বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিকে' 'কুৎসিত উপন্যাস' বলে নিন্দা করেছেন, রবীন্দ্রভক্ত নবীন কবিরা—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ও কালিদাস রায়—এমন কি তাঁর এককালের স্নেহের পাত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি যতটা আঘাত দিয়েছেন, ততটা সহানুভূতি দেখান নি। যথার্থ সমালোচকের নিরপেক্ষতা সমাজপতির ছিলো না। প্রাচ্য চিত্রকলার বিরুদ্ধে—অবনীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় তিনি কুযুক্তির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু, বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে কলহ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায় 'সাহিত্যের' ভূমিকা তাতে নগণ্য নয়। 'বঙ্গদর্শনের' বঙ্কিম একহাতে গঠনের কাজ অন্যহাতে নিবারণের কাজ সম্পন্ন করে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সব্যসাচী' আখ্যা পেয়েছেন—কিন্তু সমাজপতির ভাঙ্গনের কাজের তুলনায় গঠনের কাজ সামান্য বলে তাঁকে 'কাগজের হাতী' (বা 'নব্য দিঙনাগ') নাম দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সুতরাং গোঁড়ামি আর সংস্কারের দাসত্ব করায়, এক মারাত্মক ধ্বংসবিলাসের পরিচয় দেওয়ায় 'সাহিত্য' সৃষ্টিশীল সাহিত্যপত্রের মর্যাদা পেতে পারে না। এইদিক দিয়ে

'বঙ্গবাসী' (১২৮৮) ও 'হিতবাদী' (১২৯৮) পত্রিকার সঙ্গে তার কম-বেশি মিল আছে।

'নারায়ণ' (১৩২১) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি—চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদকরূপে ও বিপিনচন্দ্র পাল ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও লেখকরূপে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-বিরোধী ও 'সবুজ-পত্র'- (সবুজ-পত্রের লেখকসম্প্রদায় ও প্রমথ চৌধুরী সহ) বিরোধী পত্র হিসেবেই নারায়ণের আত্মপ্রকাশ। পত্রিকাটিতে চিত্তরঞ্জন একটি স্তব—'হে ভগবান, তুমিই এক এবং তুমিই বহু; তোমাকে নহিলে আমাদের চলে না; আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে না'—প্রকাশ করে ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ ও প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন; বিপিনচন্দ্র পাল ও গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লেখনী হাতে সেই মন্ত্রের সাধনে অগ্রসর হলেন। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়লেন না; বিপিনচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' 'চরিত্র-চিত্র' প্রবন্ধ লিখে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছিলেন, নারায়ণের পৃষ্ঠায় তারই অনুবৃত্তি হিসেবে লিখলেন 'মৃণালের পত্র' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদকে করলেন আক্রমণ। কবির ঘরে বাইরে উপন্যাসের হলো নির্মম কঠোর সমালোচনা; 'সবুজ-পত্রের' ভাষাদর্শের সমালোচনায় অন্যান্যের সঙ্গে এগিয়ে এলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। শুধু তাই নয়, চণ্ডীদাস থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাঙলা কবিতার মধ্যে জাতীয়তার উত্থান-পতনের ইতিহাস বিবৃত করে 'খাঁটি দেশী কবির' সন্ধান দিলো 'নারায়ণ'—এ যেন সবুজ-পত্রের সবুজ ও সজীব ভাব-ধারার বিরুদ্ধে, সবুজপত্রী যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদের ('ঘরে বাইরে' দ্রঃ) বিরুদ্ধে, ইয়োরোপের আগমনে আমাদের দেশে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বস্তুতঃ, 'নারায়ণ-সম্প্রদায়ের' এই সংস্কার-প্রিয়তা খণ্ডনের

উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ('নূতন ও পুরাতন' ইত্যাদি।) 'নারায়ণ'—সজনীকান্ত দাসের ভাষায়—'একদিকে উলঙ্গ যৌননৃত্য, অন্যদিকে মেটারলিঙ্কের ভূত ঝেড়ে রবীন্দ্রনাথকে কাহিল করার' চেষ্টা চালিয়ে অপযশ অর্জন করেছে। সুতরাং নারায়ণের সৃষ্টি বলে কিছু নেই, এই কারণেই খাঁটি সাহিত্যপত্র হিসেবে তার ব্যর্থতা। 'মানসী ও মর্মবাণী' (১৩২২) পত্রিকাও রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির সমর্থক ছিলো।

'প্রবাসী' (১৩০৮) ও 'ভারতবর্ষ' (১৩২০) গণসেব্য পত্রিকা—নানা রকমের পাঠকের বিচিত্র চাহিদা মেটানোর প্রয়াসে তাদের আয়তন বিপুল, সূচী বিচিত্র, আদর্শ পাঁচমিশেলী, সাধনা প্রসারমুখী, সিদ্ধি অর্থঘটিত। মাঠের কৃষি (agriculture) থেকে মনের কৃষি (culture), অদৃষ্টবাদ (হস্তরেখাবিচার) থেকে পৌরুষবাদ (মনীষীর জীবনালেখ্য), কামান (মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি) থেকে রাধার মান (বৈষ্ণব সাহিত্য) ইত্যাদি কিছুই তাতে বাদ পড়ে নি। তাতে সমাবেশ আছে, সামঞ্জস্য নেই; গুণগত পরিবেশন যেমন আছে, তেমনি আছে পরিমাণগত সরবরাহ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মনীষা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন; পত্রিকা-সম্পাদনার যোগ্যতা তাঁর ছিলো; তাঁর সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গের জন্যে পাঠক আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতো; রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা প্রকাশের কৃতিত্ব তিনি দাবী করতে পারেন। এমন কি নোতুন লেখকদের সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না—এ সবই সত্যি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখক ছিলেন না বলে, সাহিত্য-রচনার প্রতিভা তাঁর ছিলো না বলে 'প্রবাসীকে' কেন্দ্র করে কোন সমধর্মী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী তৈরি হয় নি—সমসাময়িক বা পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের ওপর পত্রিকাটি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিকল্পিত

'ভারতবর্ষ' সম্পাদনা করেছেন জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—তাঁদের মধ্যে জলধর সেন লিখেছেন অনেক, কিন্তু সে লেখার ধার ও ভার এত ছিলো না যে, তাঁকে ঘিরে কোন সৃজনধর্মী সাহিত্যের আসর রচিত হতে পারে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর দখল অবিসম্বাদিত—তবু কোন সমদীক্ষিত লেখক-গোষ্ঠী সৃষ্টি করবার মতো সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিলো না। শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রকাশে 'ভারতবর্ষের' দান অনেকখানি—তৎসত্ত্বেও পত্রিকাটি খাঁটি সৃজনশীল সাহিত্যপত্রের মর্যাদা দাবী করতে পারে না। বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার সাধু সঙ্কল্পের জন্যে নয়, সমাজ-জীবন-সাহিত্য সম্পর্কে কোনও অভিনব দৃষ্টিকোণের জন্যেও নয়—সকল রকমের লেখার মাধ্যম হিসেবেই 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষের' প্রতিষ্ঠা। যদিও 'বাজারে' পত্রিকা তাদের বলবো না, তবুও তাদের পরিচালক-সম্পাদকদের ব্যবসায়-বুদ্ধি যে ছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেখানে বাঙলা দেশের অধিকাংশ ভালো-মন্দ পত্র-পত্রিকার ভাগ্যে ঘটেছে অকাল মৃত্যু, সেখানে এই পত্রদ্বয়ের আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকাটাই তাদের আর্থিক সিদ্ধির প্রমাণ। অনেক পরে প্রকাশিত 'মাসিক বসুমতী' (১৩২৯) সম্বন্ধেও এই জাতীয় কথা বলা চলে—সবদিক থেকেই 'প্রবাসী-ভারতবর্ষ' গোষ্ঠীর মধ্যে এর স্থান (অবশ্য বর্তমানে 'বসুমতীর' সমৃদ্ধি লক্ষণীয়)।

এইতো গেলো 'সবুজ-পত্রের' সমকালীন বা পূর্ববর্তী সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। বোঝা গেলো, অকৃত্রিম সাহিত্যপত্র (সৃষ্টিধর্মী, নব্যপন্থী, সুষমচরিত্র ও বলিষ্ঠ সাহিত্যপত্র) হিসেবে 'বঙ্গদর্শন' ও 'সাধনার' নাম করা যেতে পারে। এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকার গুণ হয়তো ছিলো, বৈশিষ্ট্যও হয়তো ছিলো, তবু এক বা একাধিক ক্ষুদ্র বা মহৎ দোষের জন্যে (অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা বা

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা মহৎ দোষ ছাড়া কিছু নয়) খাঁটি সাহিত্য-পত্রের আখ্যা লাভ করতে পারে নি। বাঙলা সাময়িক পত্রের এই পটভূমিকায় দেখা দিলো 'সবুজ-পত্র'—নোতুন সম্ভাবনা নিয়ে।

'বঙ্গদর্শন' যেমন বঙ্কিমের (এবং রবীন্দ্রনাথের), 'সাধনা' যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি 'সবুজ-পত্র' প্রমথ চৌধুরীর (এবং রবীন্দ্রনাথের ?) —প্রথমটিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে বিরাট শক্তির দীপ্তি, দ্বিতীয়টিতে সার্বভৌম প্রতিভার আলো, শেষেরটিতে অপরিসীম মনীষার জ্যোতি। তবু এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শনের' যুগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো অল্প, প্রতিবাদ ছিল ক্ষীণ, মুষ্টিমেয় পাঠক-গোষ্ঠী ছিল অর্ধ-সচেতন। তাই তাদের ক্ষেত্রে সাহস, নিষ্ঠা, বিদ্রোহ ও সৃষ্টিধর্মের জোরালো পরীক্ষা হয় নি।* কিন্তু 'সবুজ-পত্রের' যুগে চতুর্দিকে ছিলো বিরোধী-পত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ, প্রতিবাদের আগ্নেয় বাণ নিক্ষিপ্ত হতো মুহুর্মুহুঃ, প্রসারিত পাঠকসমাজ বিচিত্র রসবোধ নিয়ে ছিলো সদা-সতর্ক। এমনিতর অবস্থায় 'সবুজ-পত্রকে' ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে, একমুখী আদর্শকে প্রাণপণে অনুসরণ করতে হয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করতে হয়েছে—এক কথায়, তার ইতিহাস জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও অবিচল নিষ্ঠার ইতিহাস। ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী ঘোষণা করেন,—'বঙ্গ সরস্বতীর সেবককে তাঁর সৈনিকও হতে হবে'—তাঁর এই ডাকে আর কারো সাড়া না থাক সাড়া ছিলো 'সবুজ-পত্রের' লেখক-গোষ্ঠীর। তাঁরা প্রতি পদে পদে তর্ক করতে করতে, বিচার করতে করতে, প্রয়োজন হলে বিবাদ-বিসংবাদ করতে

---

* বর্তমানে এত নিত্য নূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হয়েছে যে, এ যুগের তুলনায় 'বঙ্গদর্শনের' যুগের বঙ্গসরস্বতীকে বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

—সবুজ-পত্র, কার্তিক, ১৩২১।

করতে সাহিত্য-সরণিতে এগিয়ে গেছেন—যেমন পথের অন্তরায় সরাতে সরাতে এগিয়ে যায় সৈনিকের দল। তবে 'সবুজ-পত্রের' এই সংগ্রাম নূতনের পক্ষে পুরাতনের বিপক্ষে সংগ্রাম—'সাহিত্য' ও 'নারায়ণের' মতো গোঁড়ামি ও সংস্কারের তরফে প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়। বীজ যেমন গাছে বিকশিত হতে গিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে, তেমনি 'সবুজ-পত্রও' উদ্গম ও বিকাশের দিনে লড়াই করেছে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে।

পত্রিকাটির নেতিবাচক ভূমিকা (negative role) ততখানি যতখানি সংস্কারকে উৎখাত করার প্রয়োজনে প্রযুক্ত ; আর ইতিবাচক ভূমিকায় (positive role) সে সৃষ্টিধর্মী। আমরা জানি, 'সবুজ-পত্রের' পিঠ পিঠ প্রথম মহাযুদ্ধের আবির্ভাব—সুতরাং পত্রিকাটিকে বাইরে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ভেতরে মনের ক্ষেত্রে এক আলোড়নের সম্মুখীন হতে হয়। পত্রিকাটিকে বেশ সাহসের সঙ্গেই নোতুন চিন্তা ও অনুভূতির সমস্ত গবাক্ষ পথ-গুলি উন্মুক্ত করে দিতে দেখি। ফলে জীবনের যে রূপ 'সবুজ-পত্রে' ফুটে উঠেছে—তা যেমন অভিনব, তেমনি চিত্তাকর্ষক। 'চার-ইয়ারী-কথার' আবহাওয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নোতুন, তাতে যে জীবনধর্ম অভিব্যক্ত তার রস আমাদের অনাস্বাদিত। শুধু কি তাই, আমাদের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ অভাব-ক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত মৃতপ্রায় জীবনা-দর্শের মধ্যে 'চার-ইয়ারী-কথা' এবং প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ-পত্রের' যুগের অন্যান্য গল্প জীবনের এক অদৃষ্টপূর্ব দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করলো—তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য আমাদের সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রের ধোঁয়াটে ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় নোতুন করে বাঁচার আলো-হাওয়া ছড়িয়ে দিলো (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য' ও 'গল্প-সাহিত্য' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকার' ছন্দে, 'ফাল্গুনীর'

সঙ্গীতে ও 'চতুরঙ্গের' কাহিনীতে সজীব প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত করলেন। 'ফাল্গুনীর' জীবন সর্দার আসলে যৌবনধর্মী জীবনের সর্দার, 'প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক ক'রে পাওয়ার সত্যে বিশ্বাসী'। 'বলাকায়' সবুজের উজ্জীবন-মন্ত্র উচ্চারিত—জীবনের তত্ত্ব অনন্ত গতিবাদের মধ্যে বিধৃত। 'চতুরঙ্গে' অসম্পূর্ণ জীবনের বিচিত্র ছবি রূপায়িত—তার মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যরূপের ইঙ্গিতও অভিব্যক্ত। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আমাদের তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যের গণ্ডি বিদীর্ণ, সীতা আর সতীর ঘুম পাড়ানিয়া গানে আচ্ছন্ন নারীর পদস্খলনের ইতিহাস রচিত, কঠোরতম পরীক্ষার ক্ষেত্রে জীবনের নগ্ন বাস্তব মূর্তি প্রকটিত। এক কথায়, 'লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে যেমন, তেমনি উপন্যাসের সমস্যা ও চরিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত।' এরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'জন-গণেশের' মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'নবযুগের কথার' কথকতা করলেন; বরদাচরণ গুপ্ত আমাদের শক্তিকে ঝাঁকি দিয়ে খাড়া করবার জন্যে 'নতুন কিছু' করবার আবেদন জানালেন, আমাদের সামাজিক মনের শাপমোচনের জন্যে তার সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়ার ('বুদ্ধিমানের কর্ম নয়') পরামর্শ দিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'ডিমোক্রাসি' ও 'দাদার ডায়েরীতে', বীরেন্দ্রকুমার বসুর 'সবুজ অতীতে', সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'নূতন ও পুরাতন', 'নবীনের প্রতি' (কবিতা) ও 'শাস্ত্র ও স্বাধীনতায়' যে সজীব অনুভূতি ও অভিনব চিন্তার পরিচয় পাই—তা সবুজপত্রীদের গোষ্ঠীগত সমধর্মিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পত্রিকাটির সংগ্রামী চরিত্র ও অখণ্ড সুরের কথা মনে করেই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—'তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ ঘোষণা ছিলো, সে সঙ্গে ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য। তার মানে সাম্প্রদায়িকতা নয়, শুধু দীক্ষিতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। যেখানে সমধর্মীরা

পরস্পরের মনের স্পর্শে বিকশিত হয়ে ওঠেন তাকেই বলে গোষ্ঠী। সেটা যখন ঘটে তখনই কোনো পত্রিকায় সবুজ-পত্রের মতো সুরের ঐক্য দেখা দেয়, চরিত্রের অমন অখণ্ডতা, প্রকাশের অমন প্রথামুক্ত নির্ভয় ভঙ্গী।···যে সংখ্যায় বহু লোকের লেখাও বেরিয়েছে, সেটিও রূপ দিয়েছে সম্পূর্ণ একটি রচনার; অর্থাৎ সেই বহুর মধ্যে দপ্তরির সুতো ছাড়াও আন্তরিক একটি সম্বন্ধ থেকে গেছে। এই অখণ্ডতা গোষ্ঠীসাপেক্ষ, তাই গোষ্ঠী ছাড়া সাহিত্যপত্র হয় না।'

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়,—প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সবুজ-পত্রীরা নোতুন ভাবের, নোতুন ধাঁচের সাহিত্যের কথা শুধু পাঠককে শুনিয়ে গেলেন না, নিজেরা লিখে তার পরিচয় দিয়ে গেলেন। অভিনবকে শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবে দেখিয়ে গেলেন। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, অতুলচন্দ্র, বরদাচরণ, সুনীতিকুমার, কিরণশঙ্কর, সতীশ ঘটক, সুরেশ চক্রবর্তী, হৃষীকেশ সেন, গল্পে—রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশ চক্রবর্তী, বাঁরেশ্বর মজুমদার—কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী, ইত্যাদি লেখকবৃন্দ যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন—তা 'সবুজ-পত্রের' ইতিবাচক ভূমিকাই প্রমাণ করে। সুতরাং 'সবুজ-পত্র' নিঃসন্দেহে একটি অভিনব সাহিত্যপত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'সবুজ-পত্রের' ঘোষিত উদ্দেশ্য কি ছিলো?

বাঙালীর মনকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই 'সবুজ-পত্র' প্রকাশ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে, সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি,—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেননা, জানি নে। সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ,

তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহলে আমরা বাঙালী জাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি নি, তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল, সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না—কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।'

'সবুজ-পত্র' দেশবাসীর মনের সুপ্ত অংশকে জাগিয়ে তুলতে পারবে কিনা—সে সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহ ছিলেন না, কিন্তু জাগ্রত অংশকে যে সুপ্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারবেই তাতে তাঁর কোন সন্দেহ ছিলো না। তিনি জানতেন, নৈসর্গিকী প্রতিভা না থাকলে দেশের নিদ্রিত মনকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়, কিন্তু দেশের জাগ্রত মনকে ঘুমের হাত থেকে দূরে রাখার জন্যে মানুষের চেষ্টাই যথেষ্ট।

আমাদের মনের আংশিক জাগৃতির মূলে আছে ইউরোপের প্রভাব। প্রমথ চৌধুরীর মতে,—'ইউরোপে আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য,

ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্ আর হলাহলই হোক্ তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজি-সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা দেশশুদ্ধ লোক যেদিকে হোক্ কোনও একটা দিকে চলবার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু করছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান, কেউ পূর্বের দিকে পিছু হট্‌তে চান, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মা অনুসন্ধান করছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্তির অনুসন্ধান করছেন। এককথায় আমরা উন্নতিশীলই হই, আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতি-শীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না-হোক্, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি।'

এই মুক্তির ভেতর আনন্দ আছে এবং সেই আনন্দ থেকেই এ-যুগের নবসাহিত্যের সৃষ্টি। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে, তা বলতে না পারলেও, এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন, তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।' তিনি আরো বলেছেন—'ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে

প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা, মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে।'

এককথায়—'একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য' 'সবুজ-পত্রের' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো।

'সবুজ-পত্রের' সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটা কৌতূহলজনক। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় (তেরশ' কুড়ি সালের অগ্রহায়ণ মাসে)। তাতে কবি যে প্রতিভাষণ দেন, তার মধ্যে দেশবাসীর প্রতি কটাক্ষ ছিলো। ফলে সম্বর্ধনা সভার অতিথিরা ক্ষুব্ধ হন এবং কিছুদিন ধরে বিভিন্ন পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিষোদ্গার চলতে থাকে। কবি তাতে ভয়ানক মর্মাহত হন এবং স্থির করেন যে, সাময়িক পত্রিকাতে আর কোনোদিন কিছু লিখবেন না। এই সময় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী একখানি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকাতে লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রমথ চৌধুরী পরে স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারেই 'সবুজ-পত্র' প্রকাশ করা হয়।*

নোতুন পত্রিকা প্রকাশের সম্ভাবনা কবিগুরুকে একটু উদ্গ্রীব ও অস্থির করে তুলেছিলো। তাই তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন—'সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে শুধু চিন্তা করলে হবে না—কিছু লিখতে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি কনিষ্ঠ হয় ত কি রকম হয়। আকারে

---

* 'যাঁর (রবীন্দ্রনাথের) অভিপ্রায় মত সবুজ-পত্র প্রকাশ করা হয়, তার ইচ্ছামত ওপত্র বাঁচিয়ে রাখতে আমি প্রতিশ্রুত হই।'—সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

—সবুজ-পত্র, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩২৪।

ছোট—বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবেও।' পরে স্থির হয় যে, পত্রিকার নাম হবে—'সবুজ-পত্র'। শুনে তিনি উৎফুল্ল হয়ে আবার লেখেন—'সবুজ-পত্র উদ্গমের সময় হয়েছে—বসন্তের হাওয়ায় সেকথা চাপা রইল না—অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব।'

'সবুজ-পত্রের' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও চিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা ভেবে তিনি রীতিমতো উৎকণ্ঠিত—'আমার আশঙ্কা আছে মানসীতে যদি মহারাজকে পেয়ে থাকে তাহলে হয়ত একদিন সবুজ-পত্রের সবুজে তাঁর চোখ না জুড়াতেও পারে—সেটা আমাদের পক্ষে অসুখের কারণ হবে।' শুধু তাই নয়, পত্রিকার রসদ সংগ্রহ করার ব্যাপারেও কবির ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না—'তোমরা···কাগজ ত বের করচ কিন্তু হাতে দু'তিন মাসের সম্বল ত জমাওনি—Think not of tomorrowটা কি সদুপদেশ।'

'সবুজ-পত্রকে' কিভাবে উন্নত করা যায়. কোন্ ধরণের লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশ করলে ভালো হয়, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করতেন—'অন্যান্য মাসিকে যে সমস্ত আলোচ্য প্রবন্ধ বেরয় তার সম্বন্ধে সম্পাদকের বক্তব্য বের হলে উপকার হবে। প্রথমতঃ, যারা উৎসাহের যোগ্য সেই সব লেখকেরা পুরস্কৃত হবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের লেখা সম্মুখে রেখে বলবার কথাটাকে পরিষ্কার করে বলবার সুবিধা হয়। তাছাড়া, আধুনিক সাহিত্যে মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচনার হাল ধরা চাই। প্রতিমাসের সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না; কিন্তু মাসিক পত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে কিছু না কিছু বলবার

জিনিষ পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কিভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।'*

'সবুজ-পত্রের' কোন সংখ্যা যখন ভাল লাগতো, তখন কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন; জানাতেন অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা—'আমার তো বোধ হচ্ছে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে তাহলে বাংলা সাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি এবং রস দিতে পারবে।' আবার 'সবুজ-পত্রের' কোন সংখ্যা খারাপ লাগলেও জানাতে ইতস্ততঃ করতেন না রবীন্দ্রনাথ—'র···র লেখাটি যাকে বলে "সারবান"। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এসব লেখা ভোগ করবার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখবার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজ·পদার্থের ভার ত তার উপরে সয় না—সবুজ-পত্র-পুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে।'

'সবুজ-পত্রের' লেখকের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত অল্প, অধিকাংশ সময়েই রবীন্দ্রনাথ ও সম্পাদকের নিজের রচনায় পত্রিকাটি ভরিয়ে তোলা হতো। এ ব্যবস্থাটা কবির তেমন মনঃপূত ছিলো না—'সবুজ-পত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটি মাত্র লেখক যদি সব কথা লেখে তবে লোকে বলবে কি? এক ত সেটা

---

* রবীন্দ্রনাথের মুখে আরো শুনতে পাই—'সবুজ-পত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি—বিশেষতঃ, যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে। অর্থাৎ সবুজ-পত্রে কেবল ফুলের সূচনা মাত্র করে না তাতে ফলেরও আয়োজন আছে এইটে না প্রকাশ হলে জিনিসটা একটু সৌখীন হয়ে দাঁড়াবে।...সৃষ্টির মধ্যে আরো-ভালোর ডাক কোনদিন থামে নি এবং কোনদিন থামবে না। সবুজ-পত্রের সবুজত্ব এই নিয়ে। যে ডাকঘর দিয়ে এই পত্র আসচে সেই ডাকঘরে তুলট কাগজ চলে না—সেখানে হলদের আমেজ দেখা দিলেই তাকে খসিয়ে দিয়ে সবুজ আপনার জয়পতাকা ওড়ায়। তাই সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েচে: সেইখানকার বার্তা তোমার পত্র বহন কার প্রচার করুক।'

—চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড], রবীন্দ্রনাথ।

দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশঃই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে—তারপরে হয়ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখবোধ করতে পারে।' তিনি এখানেই থামেন নি, তারপরেও তাঁর মুখে শুনতে পাই—'মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তাছাড়া, আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে—এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই সবুজ-পত্রের প্রতি আমার যা-কিছু ঔৎসুক্য।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সবুজ-পত্রের' মধ্য দিয়ে এক নোতুন লেখকসম্প্রদায় গড়ে তোলাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। তাই তিনি বারে বারে আকুল আবেদন জানিয়েছেন—'আরো লেখক চাই। লেখা-সৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায়, কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্যন্ত সবুজ-পত্রের টান পৌঁচচ্ছে না। নবীন লেখকেরা সবুজ-পত্রের আদর্শকে ভয় পায়—তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।'*

'সবুজ-পত্র' প্রায়শঃই ধার্য তারিখে বেরোত না। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'মাসের পর মাস ধার্য

* এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন—যত পার নতুন লেখক টেনে নাও—লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শের সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে।... সাময়িক সাহিত্য অত্যন্ত বেশি যদি খুঁতখুঁতে হয় তাহলে তাকে বিলেতের Old maid-এর মত যৌবন ব্যর্থ করে নিঃসন্তান শুকিয়ে মরতে হবে। চির সাময়িক সাহিত্যই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাচাই ও বাছাই করে—সাময়িক সাহিত্যের আমদরবার; খোষদরবার নয়।'

—চিঠিপত্র [৫ম খণ্ড], রবীন্দ্রনাথ।

তারিখে আমি পাঠকসমাজের নিকট এ-পত্র পেশ করে উঠতে পারি নি। এর প্রধান কারণ, কি 'সবুজ-পত্রের' সম্পাদক কি লেখক কেউ সাহিত্য-ব্যবসায়ী নন, সকলেই অন্য কাজের কাজী। এঁদের সকলকেই, অবসর মত লেখায় হাত দিতে হয় এবং বলা বাহুল্য সে অবসর এঁদের কারও ভাগ্যে নিত্য নিয়মিত জোটে না, কাজেই 'সবুজ-পত্র' যথাসময়ে দেখা দেয় না।' কিন্তু 'সবুজ-পত্র' যাতে বেরোয়, যথাসময়ে বেরোয়—তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিলো না—'ফাল্গুনের সবুজ-পত্র বের করতে আর বেশি দেরি কোরো না—তারপর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই তোমার গল্পটি বেরিয়ে যাক্। তাহলে বেশি দেরি হবে না। এ মাসের 'সবুজ-পত্রের' কপি কি সব তৈরি হয় নি? ঘরে বাইরে ত দিয়েছি—সেটা ফর্মা চারেক হবে। তোমারও কিছু কিছু লেখা নিশ্চয়ই আছে—যদি প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কিছু থাকে দিয়ে দিয়ো। তারপরেই তোমার গল্পটি ছাপা হতে থাক্। তাহলে ১লা চৈত্রেই বেরোতে পারবে।' কখনও রেগে গিয়ে কবি প্রমথ চৌধুরীকে জানিয়েছেন, 'সবুজ-পত্র যদি নিতান্তই যখন তখন বের হয় তাহলে লেখকদের লেখার এবং পাঠকদের পড়বার আগ্রহ দুই-ই কমে যাবে।'

'সবুজ-পত্রের' আর একটি ত্রুটি ছিলো—ছাপার ভুল। সত্যিই সময় সময় এমন সব মারাত্মক ছাপার ভুল দেখা যেতো যা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বহু চিঠিতে এ-সম্বন্ধেও উৎকণ্ঠা ও রোষ প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সবুজ-পত্রের' সম্পর্ক সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা, নির্মম সমালোচকের মর্মঘাতী সমালোচনায় যখনই প্রমথ চৌধুরী ভেঙে পড়েছেন, আর্থিক কৃচ্ছ্রতায় যখনই বিব্রত বোধ করেছেন, নানারূপ প্রতিবন্ধকতায় পত্রিকা প্রকাশ যখনই অসম্ভব হয়ে পড়েছে,

তখনই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছেন আশ্বাস, দিয়েছেন উৎসাহ। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—'আমার ভয় হয় পাছে সমালোচকদের ধাক্কায় তোমাকে বিচলিত করে। এতদিনে এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, এদেশে সম্ভবতঃ সাহিত্যরসজ্ঞ অনেক আছে, কিন্তু তারা প্রায়ই কেউ "সাহিত্যিক" নয়—যেমন ময়রার মুখে সন্দেশ রোচে না তেমনি আমাদের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের কারবার করে, কিন্তু সাহিত্য ভালবাসে না—সে শক্তি তাদের নেই। আমি তাই ওদিকে একেবারেই কাণ দিইনে—কর্ণ টা যদি ঢেউকে খাতির করে তাহলে ত ভরাডুবি!' আবার কখনও অভিভাবকের মতো জোর দিয়ে বলেছেন যে, দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্বে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে 'সবুজ-পত্র' সম্পাদনা থেকে নিষ্কৃতি দেবেন না।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সবুজ-পত্রের' সম্পর্কের স্বরূপ বেশ অনুধাবন করা যায়। প্রমথ চৌধুরী নিজেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—'সবুজ-পত্রের বিরুদ্ধে নানা বদ্‌নাম থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে, প্রথম দু'বৎসর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল—কি ওজনে, কি পরিমাণে এ পত্রের প্রধান সম্পদ। 'সবুজ-পত্র' বাঙলার পাঠকসমাজে যদি কোনরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করে থাকে ত সে মুখ্যতঃ তাঁর লেখার গুণে। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে এ কাগজ চালাতে পারবো, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি। সুতরাং মাসের পর মাস একখানি করে গোটা 'সবুজ-পত্র' আমার পক্ষে একা গড়ে তোলা যে অসম্ভব এ জ্ঞান আমি কখনই

হারাই নি।' বীরবলের নিজের এই স্বীকৃতি ও রবীন্দ্রনাথের 'সবুজ-পত্র' সম্পর্কিত বিভিন্ন চিঠিপত্রের ওপর নির্ভর করেই খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেনঃ '···Sabujpatra was Rabindranath's creation no less than Pramatha Chaudhuri's।' আমরা এতটা বলতে চাই নে বটে, তবে স্বীকার করি—'সবুজ-পত্র' প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Friend, philosopher and guide।'

'সবুজ-পত্রের' সম্পাদনায় বীরবল পেয়েছিলেন কয়েকজন নবীন লেখকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। তখনকার দিনের বাঙলা দেশের সাহিত্যিক, সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই 'সবুজ-পত্রের' ওপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন, 'সবুজ-পত্রের' প্রচারিত ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করেছিলেন। এ সমস্তই নির্বিকারভাবে সহ্য করার মতো মানসিক বল অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর ছিলো। ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিতেন না বলে তীক্ষ্ণ সমালোচনার পরেও মাথা উঁচু করে চলতে পারতেন তিনি। তৎসত্ত্বেও বলা যায়, একদল নবীন লেখকের সহায়তা পাওয়ার ফলেই ক্রূর সমালোচনা উপেক্ষা করতে, 'সবুজ-পত্রের' আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে বীরবলের সুবিধা হয়েছিলো। নবীন লেখকদের এই সাহসিক সহযোগিতা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে করেছেন স্বীকার—'ত্ু'দিন পরে হলেও 'সবুজ-পত্র' যে মাসের পর মাস সশরীরে দেখা দিয়েছে, সে 'সবুজ-পত্রের' নবীন লেখকদের গুণে। তাঁদের একান্ত সহানুভূতির আনুকূল্য ব্যতীত, আমার পক্ষে 'সবুজ-পত্র' চালানো অসম্ভব হত। যখন 'সবুজ-পত্রের' উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ চলছিল, যখন বান্ধবেরাও আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, তখন যে যুবকের দল কায়মনবাক্যে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে

আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 'সবুজ-পত্রের' প্রতি এঁদের প্রীতির মূল্য আমার কাছে যে এত বেশি, তার কারণ এ প্রীতির মূলে এক সাহিত্য-সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নেই।' 'সবুজ-পত্রের' এই নবীন লেখকদের অন্যতম হলেন—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বরদাচরণ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও কান্তিচন্দ্র ঘোষ। এঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনস্বী লেখক হিসেবে পরবর্তীকালে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই তাঁকে 'সবুজ-পত্রের' সার্থকতম সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

'সবুজ-পত্রের' পরিচালক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। সাময়িক পত্রিকাকে জনপ্রিয় করার জন্যে যে ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—তিনি তা করেন নি। বাহ্যিক জৌলুষ থাকলে প্রচারকার্য ছাড়াই পত্রিকা পাঠকের স্থূলদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু 'সবুজ-পত্রের' তা-ও ছিলো না। ব্যবসা-বুদ্ধি যে তাঁর ছিলো না তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন—'কলম চালানো আমার সখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়।—ব্যবসায়ীর হাতে পড়লে সবুজ-পত্র হয় এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত, নয়ত তার চেহারা বদ্‌লে যেত।' তাছাড়া, পত্রিকার আদর্শ সম্বন্ধে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত কড়া ও খুঁতখুঁতে। ফলে সাধারণ পাঠক কিংবা লেখক—কারও কাছেই পত্রিকাটি তেমন প্রিয় হয়ে ওঠে নি। বাজারে যদি কাট্‌তি না হয়, তবে সাময়িক পত্রিকা চলতে পারে না। শুধু পকেটের পয়সা খরচ করে পত্রিকা চালানোর চেষ্টা করা বৃথা। 'সবুজ-পত্রের' তেমন কাট্‌তি ছিলো না, তাই তা টিকে থাকতে পারে নি বেশিদিন। সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ব্যর্থ নন। পত্রিকা-সম্পাদকের উপযুক্ত সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি, পরমতসহিষ্ণুতা ও শৃঙ্খলাবোধ তাঁর ছিলো; ছিলো

ভাবালুতাহীন নির্বিকার একখানি মন। বাঙলা সাহিত্যের চালক-*পদ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সবুজ-পত্রের' আদর্শ সম্বন্ধে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর রক্ষণশীলতা* সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য ; কারণ আদর্শ সম্পাদকের তা হওয়াই উচিত। পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি পরিচালক ও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী পত্রিকাটির স্থায়িত্বের খাতিরে তার আদর্শ ক্ষুন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং সেই কারণে ব্যবসা বা পরিচালনার দিক থেকে তাঁর ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিলো। তিনি নোতুন লেখক তৈরি করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় বেশি নন বটে, কিন্তু উপেক্ষণীয় নন। আত্মবিশ্বাসহীন স্বাতন্ত্র্যবর্জিত অসংখ্য অক্ষম লেখক সৃষ্টি করার চেয়ে স্বল্পসংখ্যক শক্তিমান বলিষ্ঠ লেখক সৃষ্টি করা শ্রেয়—এই ছিলো তাঁর ধারণা। তিনি করেছিলেনও তা-ই। কয়েকজন নবীন অথচ ক্ষমতাশালী লেখককে সহযোগী করে তিনি নোতুন সাহিত্যাদর্শ, ভাষারীতি ও রচনারীতি প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন,—অবশ্য সকলের ওপরে ছিলো রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা। নোতুন সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি সম্পূর্ণ সফল না হতে পারেন, কিন্তু নোতুন রচনারীতি ও ভাষারীতি প্রচলনে তাঁর অসামান্য সফলতা অনস্বীকার্য। বর্তমান বাঙলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বী গদ্য-রচনাই তার প্রমাণ। আর কিছুর জন্যে না হোক্, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি সার্থক রচনা প্রকাশের জন্যে এবং রবীন্দ্রনাথকে মৌখিক ভাষারীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার জন্যে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজ-পত্র' বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'সবুজ-পত্রের' লেখক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব সর্বোপরি। তিনি

ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—সব্যসাচী, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপপরায়ণ সমালোচক হয়েছিলেন বাঙলা সাহিত্য থেকে আবর্জনা দূর করার জন্যে, বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যে হয়েছিলেন সৃষ্টিধর্মী রচনাকার। লেখক প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ। শক্তিশালী লেখনী তাঁর ছিলো, সেই লেখনীর প্রতি আখরে 'সবুজ-পত্রের' আদর্শ পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তাই মনে হয়, সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর পরম সৌভাগ্য যে, তিনি লেখক প্রমথ চৌধুরীকে পেয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরী এক নোতুন ভাষাদর্শ—যাকে বলা যায় বীরবলী মৌখিক ভাষা—তারই প্রচলক। এই ভাষাদর্শ প্রচারের মাধ্যম ছিলো 'সবুজ-পত্র'। এই থেকে কেউ অনুমান করবেন না যে, 'সবুজ-পত্রে' সাধুভাষায় লেখা রচনা বের হতো না। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরী উপযুক্ত মনে করলে সাধুভাষায় লিখিত প্রবন্ধও পত্রস্থ করতেন, এমন কি, বিলেত যাত্রার পূর্বে তিনি নিজে সাধুভাষায় 'জয়দেব' নামক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তা-ও 'সবুজ-পত্রে' পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সবুজ-পত্রের' সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির দোষ-গুণ কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। তার অতিরিক্ত শুধু এইটুকু বলতে পারি—পত্রিকাটিতে ছবি থাকতো না, বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না, প্রচ্ছদপটের রঙ্ সবুজ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যেতো না। তাতে আচার্য নন্দলালের আঁকা একটি তালপাতার ছবি থাকতো। কখনো একটি লেখা নিয়ে (চৈত্র সংখ্যা ১৩২১) *,

* এই সংখ্যাটি সম্বন্ধে 'মানসী'র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'এবারের সবুজপত্রে নূতনত্ব আছে—লেখক একা রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক মুখপত্রে নামাবশেষ হইয়াই আছেন। সেদিন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন, সবুজপত্রের এমন সম্পাদক আমিও হইতে পারি, কিন্তু মুখপত্রে নামটি ছাপিতে রাজী নই।'
—মানসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

কখনো দু'টি নিয়ে (চৈত্র সংখ্যা, ১৩২৪), কখনো বা একটি ছাড়া সম্পাদকের নিজের লেখা একাধিক রচনা নিয়ে (শ্রাবণ, ১৩২৫) 'সবুজ-পত্র' আত্মপ্রকাশ করতো।

এইসব আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, 'সবুজ-পত্রের' আর কিছু না থাক অন্ততঃ 'একটা নিজস্ব চেহারা ছিলো।'

পরিশেষে, বাঙলা দেশের 'সবুজ-পত্র'-বিরোধী পত্রিকাগুলির প্রতিকূল সমালোচনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির ওপর তাঁদের সরোষ আক্রমণ সত্যিই তুচ্ছ করবার মতো ছিলো না।

১৩২১ সালের মাঘ সংখ্যা 'মানসীতে' অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'অলঙ্কারের সূত্রপাত' নামক প্রবন্ধটির একটি সমালোচনা বের হয়। 'ইংরাজি গদ্যের অনুকরণ ও অনুবাদ থেকেই বাঙলা গদ্যের উৎপত্তি'—বীরবলের এই মতের বিরোধিতা করে 'মানসী' লেখেন—'আমরা বলি ইংরাজী গদ্যের অনুকরণ ও অনুবাদ হইতে বাঙলা গদ্যের উৎপত্তি একথাটা ভুল।' এই মন্তব্যের পরিপোষক কোন যুক্তি অবশ্য দেওয়া হয় নি, তাই মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করার উপায় নেই। প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটিতে ইঙ্গগৌড়ীয় রচনারীতির নিন্দা করেছেন, 'মানসী'ও সেই ধরণের রচনারীতি সমর্থন করেন নি। তবে তার মতে—'বাংলা ভাষার সহিত ইংরাজীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষা শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছে।' পত্রিকাটির এই উক্তি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। আজ যে বাঙলা ভাষা সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ তার মূলে ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দের ও ভাষার দান অনেক। তারপর পত্রিকাটি প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতিকে 'ইঙ্গবঙ্গরীতি' নাম দিয়ে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।

(ক) পায়ের বাঁকমল যদি গলায় পরা যায়; তাহলে কণ্ঠের শোভা হয় না **বরং** যদি কিছু বৃদ্ধি হয় ত **সে** শ্বাসরোধের সম্ভাবনা।

(খ) একটু অসতর্ক হলেই অলঙ্কার দর্শনে **গড়িয়ে পড়ে** এবং **ছড়িয়ে যায়।**

(গ) যে মন জন্মাবধি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন সেই **মাটি থেকে আলগা** মন থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

(ঘ) অলঙ্কার কাব্যের **পিঠ পিঠ** আসে এবং উভয়ের ভিতর **পিঠে পিঠে** ভাইয়ের সম্বন্ধ থাকলেও অলঙ্কার কনিষ্ঠ ও কাব্য জ্যেষ্ঠ।

এইসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করা হয়েছে—'উপরের শব্দসমষ্টি বাংলাভাষা নয়, অক্ষর বা শব্দগুলি বাংলা হইতে পারে, কিন্তু কথাগুলি সাধারণের দুর্বোধ্য—আমরা কিছু কিছু ইংরাজী জানি বলিয়াই বুঝিয়াছি ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। উপরের বড় অক্ষরের কথাগুলির সত্য সত্যই কোন অর্থ হয় না; ওভাবে ওসব কথা আমরা মুখেও বলি না।...ভাষার গায়ে যে শব্দ ও শব্দসমষ্টিগুলি তিনি নূতন অলঙ্কার বলিয়া জুড়িয়া দিতে চান, বঙ্গভাষা তাহা সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন, এ দীনতা তাঁহার এখনো আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।'

উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা যে আমাদের মুখের ভাষা নয়, 'মানসীর' মতো আমরাও তা স্বাকার করি। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরী ভাষার সহজবোধ্যতা সম্বন্ধে আপন মত লেখায় সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি ('ভাষাদর্শ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বাক্য কয়টির শব্দপ্রয়োগে ও অন্বয়রীতিতে ইংরেজী ভাষার প্রভাবও সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য। তবে তা সর্বক্ষেত্রে দোষাবহ কিনা সেটাই বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান বাঙলা ভাষার

সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন—ইংরেজী শব্দ, বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও অন্বয়রীতি তার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙলা ভাষার বর্তমান রূপে একমাত্র ইংরেজীজ্ঞানহীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছাড়া আর কেউ আপত্তি পোষণ করেন বলে জানি নে। যদি এটাই স্বাভাবিক হয়ে থাকে, তবে প্রমথ চৌধুরীর বাক্যরীতির কম-বেশি ইংরেজীয়ানাতেও সর্বক্ষেত্রে আপত্তি করা উচিত নয়। অবশ্য যেখানে কানে ঠেকে, বাক্যচ্ছন্দে বাধার সৃষ্টি হয়, অর্থবোধেও বিপত্তি ঘটে—সেখানে আপত্তি করতেই হবে। প্রথম উদ্ধৃতিতে 'বরং' ও 'সে' শব্দ দু'টি যথার্থই অপপ্রয়োগ। দ্বিতীয় উদাহরণের বড় অক্ষরের অংশগুলি বাঙলা ইডিয়ম নয় বলেই আপত্তি করা উচিত নয়। তবে ব্যবহৃত কথাগুলির মধ্য দিয়ে লেখকের বক্তব্য খুব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নি। এই ধরণের কথাচয়নের ফলে ছন্দো-মাধুর্য সৃষ্টি হয় বটে, তবে উদ্দিষ্ট অর্থও খানিকটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তৃতীয় বাক্যটির যে অংশ সম্বন্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে তা কিন্তু বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে বেশ প্রচলিত হয়ে গেছে। কথাগুলি সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থবহ; বাচ্যার্থের চেয়ে ব্যঙ্গার্থ অনেক বিস্তৃত। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর শব্দ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভাষা সমৃদ্ধই হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। চতুর্থ উদাহরণে বড় অক্ষরের শব্দগুলি ব্যবহারের ফলে যেমন একটা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে, তেমনি বক্তব্যও সুপরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং এ-সম্বন্ধেও আপত্তি করা উচিত বলে মনে হয় না।

প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী ভারতবর্ষের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের critic বলেছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরা সব বিষয়ে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে critic-রা তাঁদের মতামত codify করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতেন না বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। 'মানসী' এই উভয় মন্তব্যেই আপত্তি

জানিয়েছেন। বর্তমান সময়ে আলঙ্কারিক ও critic-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলেও প্রাচীনকালে আলঙ্কারিকেরাই ছিলেন critic অর্থাৎ একমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রেই criticism-এর কিছু কিছু নমুনা মেলে। সুতরাং প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন আলঙ্কারিকদের critic বলায় 'মানসীর' আপত্তি করার কি আছে? তবে 'মানসীর' মতো আমরাও স্বীকার করি, প্রাচীনকালে শুধু ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকেরাই নয়, পৃথিবীর সব দেশের আলঙ্কারিকেরাই তাঁদের মতামত codify করে গেছেন। তাই শুধু ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকদের কথা উল্লেখ করে প্রমথ চৌধুরী অবশ্যই অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন।

'মানসী' অধিকাংশ বিষয়ে প্রবন্ধটির নিন্দা করলেও তার শেষাংশে কয়েকটি সত্য কথা আছে বলে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে পত্রিকাটি 'সবুজ-পত্রের' এই সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'টীকা-টিপ্পনীর' প্রশংসা করেছেন এবং 'নূতন বসন' নামক কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'কবিতাটি স্বচ্ছ সুস্পষ্ট না হইলেও ইহাতে কবিত্ব আছে, রস আছে।' রবীন্দ্রনাথের লেখার সমালোচনা প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকীয় কৃতিত্ব নিরূপণে সাহায্য করে না বলেই মন্তব্যগুলির বিচার-বিবেচনা থেকে বিরত থাকলাম।

'সবুজ-পত্র'-বিরোধী পত্রিকাগুলির মধ্যে 'নারায়ণের' নাম করা যেতে পারে। বাঙলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটির গুরুত্ব আছে, তাই 'সবুজ-পত্রের' ভাষাদর্শ সম্পর্কে 'নারায়ণের' মন্তব্য বিচারের যোগ্য। ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'নারায়ণে' 'চলিত-ভাষা ও সাধুভাষা' নামে একটি প্রবন্ধ (লেখক: নলিনীকান্ত গুপ্ত) বের হয়। প্রবন্ধটিতে ভাষা সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, 'নারায়ণের' মতামত মূলতঃ তা থেকে অভিন্ন—এই ধরে নিয়েই আমরা প্রবন্ধটির সার কথাগুলির সমালোচনা করবো।

এই প্রবন্ধের শেষে বলা হয়েছে—'মূল কথা হইতেছে—ম্যাথু আর্ণল্ডের বাক্যে আবার আমরা বলি, simple ও natural হওয়াই সাহিত্যের একমাত্র গুণ নহে, সাহিত্য সর্বোপরি চায় noble হইতে, grand হইতে, উহাতে চাই high seriousness. চলিত ভাষা সহজ, সরল, উহা সুন্দর মনোহারী হৃদয়স্পর্শী হইলেও হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে পাই না অচপল গাম্ভীর্য, নিথর সত্ত্ব, পাই না ধ্যানের, স্থিতপ্রজ্ঞার, আত্মবিধৃত স্থাণুত্ব। সাহিত্যের ভাষার এই যে একটা গম্ভীর উদাত্ত গুণ, ইহার যে বিকৃতি হয় না, তাহা নয়। পণ্ডিতী ভাষাই হইতেছে এই বিকার। কারণ, সে ভাষা শুধু বিদ্যার সম্ভার, শুধু বুদ্ধির অলঙ্কার। সাহিত্যের ভাষা সাধুভাষা। একদিকে যেমন বুদ্ধির ভাষা নয়, অন্যদিকে তেমনি সাধারণের সুলভ অনুভূতির ভাষাও নয়। এই দুইটির প্রকৃষ্ট গুণ যাহা, তাহা লইয়া একটা গভীরতর অভিজ্ঞতার উপর সে ভাষার প্রতিষ্ঠা। একদিকে তাহা সহজ সরল হউক না হউক, কিন্তু জীবনপূর্ণ; অন্যদিকে বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ না হইয়াও আবার মহান, উদাত্ত, সত্ত্বপূর্ণ।' এখানে ম্যাথু আর্ণল্ডের সাহিত্য সম্পর্কে একটি মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে সাধুভাষার সপক্ষে যুক্তি সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিন্তু আর্ণল্ডের মন্তব্যটিই সর্বাংশে সত্য কিনা সন্দেহ আছে। সাহিত্য যত noble, grand ও highly seriousই হোক্ না কেন, মানুষের প্রাণের সঙ্গে যদি তার যোগ না থাকে তবে তার মূল্য কি? সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছবি, ভাষা হচ্ছে অনুভূতির বাহন—তাই যে ভাষা ও সাহিত্য হৃদয়স্পর্শী তার মূল্য অনেক। ভাষায় যখন উদাত্তগুণের সঙ্গে প্রাণধর্মের সমন্বয় হয়, তখন তার তুলনা হয় না সত্যি; তবে এ দু'টির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার প্রশ্ন যদি ওঠে, তবে নিঃসন্দেহে প্রাণধর্মের কথাই বলতে হয়। সাধুভাষার অচপল গাম্ভীর্য, নিথর সত্ত্ব ও আত্মবিধৃত

স্থাণুত্বের চেয়ে চলিত ভাষার সহজ, সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব ও সজীব প্রাণধর্ম কি অধিকতর আদরণীয় নয় ? তাছাড়া, চলিত ভাষায় গাম্ভীর্যের অভাব আছে বলে মনে করা অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' নামক গ্রন্থে মৌখিক ও সাধু এই উভয় ভাষাতে লেখা প্রবন্ধই স্থান পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, গ্রন্থটির সাধু-ভাষার মতো মৌখিক ভাষাও গুরুগম্ভীর সাহিত্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছে। যেমন—'আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখ দ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার করো তখন আনন্দকে বাদ দাও কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না।' এই আলোচনায় গাম্ভীর্য আছে সন্দেহ নেই, তবে নিচের উদ্ধৃতিতেও গাম্ভীর্য কোন অংশে ন্যূন নয়—'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয়-দুঃখ-বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়।' আর প্রকাশ-ভঙ্গির চারুতার দিক থেকে বিচার করলেও এই অংশটি পূর্বোক্ত অংশটির চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

অন্যদিকে সাধুভাষা মহান, উদাত্ত ও সত্ত্বপূর্ণ হলেও কতখানি জীবনপূর্ণ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর একটি কথা। গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের দিকে দৃষ্টি রাখলে সাধুভাষার অনুকূলে যুক্তি দেওয়ার অসুবিধা হয় বলেই নলিনীকান্ত গুপ্ত সাধুভাষা থেকে আলাদা পণ্ডিতী ভাষার কথা বলেছেন এবং তাকে বিকৃত ভাষার পর্যায়ে ফেলতে ইতস্ততঃ করেন নি। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই হচ্ছে যথার্থ সাধুভাষা এবং বঙ্কিমী সাধুভাষাই হচ্ছে যথার্থ সাহিত্যের ভাষা। যদি সাধুভাষাকে অস্বীকার করা হয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকেও অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠতে পারে—এ আশঙ্কাতেই কি লেখক সাধুভাষার পক্ষপাতী? যদি তাই হয়ে থাকে—তবে পণ্ডিতী ভাষা বর্জন করতে গিয়ে তাঁর মনে দুঃখ নেই কেন? বাঙলা সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর ইত্যাদির দান কি তুচ্ছ? আসল কথা, ভাষা-বিচারে ভাবাবেগ বা মোহকে স্থান দিলে সুবিচার হওয়ার সম্ভাবনা কম।

যুক্তির চেয়ে মোহ-ই যে লেখকের প্রধান অবলম্বন, তার প্রমাণ তাঁর অন্য একটি রচনায়ও পাওয়া যায়। ১৩২৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' ('বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) তিনি ভাষা সম্পর্কে একটা আপোষের প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মুখে শুনতে পাই—...'"কচ্ছি", "হয়ে" প্রভৃতি।যদি সাহিত্যে স্থান পায় তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু সেইজন্য সাধু কথাগুলিকে যে অবাঙলা বলিয়া নির্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না।... বঙ্গভাষা (সাধুভাষা) ও বাংলা ভাষার (মৌখিক ভাষা) একটিকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটিকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাংলার হৃদয়ে এতখানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়।' সাধুভাষার সপক্ষে

নিজের যুক্তির মধ্যে দুর্বলতা আছে বলেই লেখক এই আপোষের প্রস্তাব করেছেন বলে মনে হয়। প্রমথ চৌধুরী কখনই এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ করেন নি, কারণ তাঁর নিজের যুক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক আছে বলে তিনি নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন নি। বরং অনেক সময়ে তিনি এই সম্পর্কে বেশ জঙ্গী মনোভাব দেখিয়েছেন বলে অনেকে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তবে তাতে ভড়কে যাওয়ার লোক তিনি ছিলেন না, ভড়কে তিনি যানও নি।

১৩২২ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতীতে' 'ভাষা-সংস্কার-বিচার' নামে একটি প্রবন্ধ বের হয়—লেখক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধটিতে তিনি ভাষা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মত আলোচনা করেন; প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেন—'চৌধুরী মহাশয় নিজের মতটি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার মতটি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে প্রচলিত প্রথাই মানিয়া চলিতে হইবে। যে সকল স্থানে সাহিত্য-সমাজ সুতন্ত্রিত অর্থাৎ যেখানে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন হইতে পারে না, সেখানে কেহ নূতন মত প্রচারের জন্য নূতন ব্যাকরণ অথবা বানান অথবা অন্যবিধ পরিবর্তন দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া যে কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন; কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি সাধারণ প্রবন্ধে নূতন বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি চালাইয়া যান, তবে ভাষার হিসাবে কু-রচিত বিবেচিত হইবে এবং কুত্রাপি মুদ্রিত হইবে না।' অর্থাৎ কথ্যভাষায় লেখা বীরবলের রচনা ভাষা-দুষ্ট বলে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। আমরা জানি, ফরাসী দেশে লেখকদের রচনার বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে স্বাধীনতা আছে—কিন্তু ভাষা সম্পর্কে নেই। এবিষয়ে ফরাসী আকাদমীর শ্যেনদৃষ্টি সদা সতর্ক। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না—সুদীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ফরাসী

গদ্যভাষার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু বাঙলা গদ্যভাষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ দেখা দেয় নি। আর বাঙলা বানান সম্পর্কেও কি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছানো গিয়েছিলো ? তবে কেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অভিধানে নোতুন বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতি নিয়োগ করেছিলেন ? এই সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি করা চলে। প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষার বিপক্ষে ও কথ্যভাষার সপক্ষে বহু যুক্তি দিয়েছিলেন—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন, সাধু ভাষাভাষীর দল সাহিত্যক্ষেত্র দীর্ঘদিন দখল করে আসছেন বলে কোনো বিচারপতির নিকট তাঁর পুরো ডিক্রি পাবার আশা নেই। তাই তিনি নিজের যুক্তি-তর্কে তেমন সাড়া না পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—'আমরা যদি আবার তা (বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্র) জবর দখল করে নিতে পারি তাহলেই বঙ্গ সাহিত্য আমাদের আয়ত্তের ভিতর আসবে।' বস্তুতঃ, যুক্তিবাদী দেশে এ ধরণের কথা বলার দরকার হতো না, কিন্তু দেশবাসীর রক্ষণশীলতা স্মরণ করেই প্রমথ চৌধুরী একটু বেশি সাহসের সঙ্গে জবরদখলের কথা শুনিয়েছিলেন। আর বীরবল যুক্তি-তর্কের পথ অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এই জবরদখলের নীতি (তা তখনকার মতো যতই নিন্দনীয় হোক্) গ্রহণ করেছিলেন বলেই বাঙলা সাহিত্যে কথ্যভাষা আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে প্রমথ চৌধুরী 'ভাষার সংস্কার' নামক যে প্রবন্ধ লেখেন (ভারতী, পৌষ, ১৩২২), রাখালরাজ রায় তার আলোচনা করেন ১৩২৩-এর বৈশাখ সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণীতে'। ক্রিয়াপদের সাধু রূপের বদলে চলিত রূপ ব্যবহার করে ভাষাকে সচল করার বীরবলী সিদ্ধান্তে তিনি

সন্দেহ প্রকাশ করেন। মৌখিক ভাষার নামে প্রমথ চৌধুরী প্রাদেশিকতা (আঞ্চলিকতা) চালাবার চেষ্টা করেছেন বলে রাখালরাজ রায় অভিযোগ করেন এবং সেইক্ষেত্রে বাঙলার নামে এত বিচিত্র চলিত ভাষার সৃষ্টি হবে যা বিদেশীর পক্ষে দূরের কথা—সমস্ত বাঙালীর পক্ষেও আয়ত্ত করা কঠিন হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আর কলকাতার কথ্য ভাষাকে Standard dialect হিসেবে গ্রহণ করলে অন্যান্য স্থানের লোকের বিদ্রোহী হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। 'যাহার' 'তাহার'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'যার' 'তার' ব্যবহার করলে শব্দের প্রকৃত রূপ, উৎপত্তি ও অর্থ-নির্ণয়ে বিভ্রাট হতে পারে। সাধু বাঙলায় সংস্কৃত থেকে যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সমাসের প্রয়োগ এসেছে, তাতে বাঙলা ভাষার উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নি; পারিভাষিক শব্দ গঠনে এখনও আমরা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষার্থী; যে মনোভাব ব্যক্ত করতে বহু খাঁটি বাঙলা কথার দরকার হয়, সেখানে সংস্কৃতানুগ সাধুভাষাতে অল্প কথায় মনোভাব প্রকাশ করা যায়। এই সমস্ত যুক্তিতেই প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-আন্দোলনকে আক্রমণ করেছেন রাখালরাজ রায়। শুধু তাই নয়, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রীরা চলিত ভাষায় ইংরেজী শব্দ, সংস্কৃতসুলভ সমস্ত পদ, দুর্বোধ্য প্রাদেশিক শব্দ চালিয়েছেন বলে বিদ্রূপ করতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। এই জাতীয় সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ-পত্রের' যুগে ও পূর্ববর্তীকালে বহু যুক্তি দিয়েছেন ('ভাষাদর্শ' দ্রষ্টব্য)। তবে ইংরেজী শব্দ ও সংস্কৃতানুগ সমস্ত পদ ব্যবহারে প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রীরা সব সময় যে পুরো সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও তাঁরা একেবারে দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না।

সবুজপত্রী ঃ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ঃ লেখিকা হিসেবে ইন্দিরা দেবীকে

আবিষ্কার করার গৌরব প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজ-পত্রের' প্রাপ্য। তিনি বিদুষী, সঙ্গীতজ্ঞা, বহুভাষাবিদ্—তৎসত্ত্বেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটতো না—যদি স্বামী প্রমথ চৌধুরী ও পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে উৎসাহী না হতেন এবং 'সবুজ-পত্রের' দ্বার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত না থাকতো। প্রবন্ধ রচনায় যে মুন্সিয়ানার পরিচয় ইন্দিরা দেবী দিয়েছেন তা বীরবলী প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধুভাষায় ও ওজন-ভারি জটিল বাক্যে তিনি সাহিত্য রচনা করেন নি, রচনা করেছেন কথ্যভাষায় ও ছোট ছোট সরল বাক্যে। মাঝে মাঝে একটু বিদ্রূপের চমক, একটু paradox ও epigram-এর খোঁচা, একটু অলঙ্কার চর্চা তাঁর বাক্য ও বক্তব্যকে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। 'যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি' (ভদ্রতা, সবুজ-পত্র, পৌষ, ১৩২৪)—এই বাক্যে যেমন প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে, তেমনি 'বাণী' শব্দটির দ্বিত্ব ব্যবহারে বীরবলীয় যমকের অনুসরণ আছে। 'ভদ্রতা চৌকশ, সবল ও সুন্দর, খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত'—এই anthetical রচনা-ভঙ্গি প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের প্রমাণ। 'পরের মনে লাগানো কথা বলব না বলেই যে পরের মন যোগানো কথা বলতে হবে, তার কোন মানে নেই'—মনে-লাগানো ও মন-যোগানো কথা দু'টির মধ্যে একটা বীরবলী চমক নিশ্চয়ই আছে। অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যে যে অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা প্রমথ চৌধুরীর রচনায় একটা অভিনবতা ও উজ্জ্বলতা এনেছে তাতে ফরাসী সাহিত্যে বিদুষী ইন্দিরা দেবীর প্রেরণা সর্বজনস্বীকৃত। 'সবুজ-পত্রের' সম্পাদনা ও পরিচালনায় তিনি পুরোভাগে না থাকলেও নেপথ্যে ছিলেনই এবং সেই নেপথ্য-ভূমিকার মূল্য কোনোমতেই

সামান্য নয়। এক কথায়, ইন্দিরা দেবী সাহিত্যিক ও সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর 'প্রিয় সখী ললিতে কলাবিধৌ'। ১৩২৫ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত ইন্দিরা দেবীর 'গ্রীস ও রোম' প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'বিবির লেখাটা পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম। শেষে ওর নাম পড়বার আগে ওর লেখা বলে মনেও করিনি—প্রবন্ধের বিষয়টির জন্য বলছিনে, ওর ষ্টাইলের জন্য।'

অতুলচন্দ্র গুপ্ত: আত্মীয় কিরণশঙ্কর রায়ের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের যে পরিচয় এবং সবুজ-সভায় তাঁর যে অনুপ্রবেশ, তা কোনোদিক থেকেই ব্যর্থ হয় নি। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, ভাব ও ভাবনায়, রুচি ও বৈদগ্ধ্যে তিনি অচিরেই অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন, তাঁর মন ও মননের এই উজ্জ্বলতা কলমের মুখে ফুটে উঠতে লাগলো। অতুলচন্দ্র প্রমথ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও 'সবুজ-পত্রের' আদর্শ লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রমথ চৌধুরী, 'সবুজ-পত্র' ও সবুজসভা মিলে যে ইন্‌ষ্টিট্যুশান গড়ে উঠেছিলো, তার প্রধান কথা ছিলো বিনা বিচারে, বিশ্লেষণে কোনো কিছুকে মানা হবে না। অতুলচন্দ্র একথা মেনে নিয়েছিলেন এবং মেনে নিয়েছিলেন বলেই প্রাচীন যুগের অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্তমান যুগের পাঠকের প্রশ্নের আলো ফেলে বিচার-বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র থেকে সেইসব মত গ্রহণ করেছেন যা তাঁর মনে লেগেছে এবং সব সময় আলোচনার মূল সূত্রটি তাঁর নিজের করেই রেখেছেন। নিজের মনের ও বর্তমান যুগের আলোকে অতীতের নিরীক্ষা-পরীক্ষার প্রমাণ পূর্বোক্ত ইন্‌ষ্টিট্যুশানের প্রভাবের প্রাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর এই গুরু বিষয়টি কথ্যভাষায় সহজ সরল করে পরিবেশন

করার প্রেরণা ও সাহস প্রমথ চৌধুরীই নিঃসন্দেহে জুগিয়েছেন। বক্তব্যকে, হাল্‌কা না করে আলোচনার ধরণটা হাল্‌কা করলে রচনা যে কত উপাদেয় হয়, তা সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কাব্যবিচারের সঙ্গে অতুলচন্দ্রের কাব্যজিজ্ঞাসার (সবুজ-পত্র, ১৯৩৩) তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যায়। জনগণকে গণেশরূপে কল্পনা করে যে রচনাটি তিনি 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশ করেছেন তাতে একটি গুরুতর বিষয়ের রসাশ্রিত উপস্থাপনা রয়েছে। 'সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্তারাই জনসঙ্ঘকে লম্বোদর গজানন বলেই জেনেছেন। ওর হাত পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের ওপর যে মাথাটি তা মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের······সব দেশের যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা মগজে বুদ্ধির পরিবর্তে জানোয়ারের নির্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা করে এসেছে। সেইজন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও খোসামোদে তুষ্ট করতে হয়েছে।'—এই উক্তিতে রসিকতাচ্ছলে একটা উপেক্ষিত সত্যকে প্রচার করার চেষ্টা দেখতে পাই। একদিকে বিদ্রূপ (বুদ্ধিমানের প্রতি) অন্যদিকে সহানুভূতি (জনগণের প্রতি) মিলে সমস্ত রচনাটিকে সরস ও সারবান করে তুলেছে। বলা বাহুল্য, বীরবলের শিক্ষা ও দীক্ষাই গণেশে সুব্যক্ত। 'সবুজ-পত্রের' লেখক অতুলচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য : 'অতুলবাবুর প্রবন্ধগুলির কথা বলা বাহুল্য। ও হলো পাকা মাথার চিন্তা পাকা হাতে লেখা। বাংলায় মাথা ও হাতের এরকম তাল রক্ষে করে চলার দৃষ্টান্ত বিরল।' ১৩২৪ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত অতুলচন্দ্রের অন্ন-চিন্তা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'অন্ন-চিন্তা আবার পরে আবার ভালো লাগলো।' সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি প্রথমে বীরবলী চল্‌তি ভাষা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর সাধু-

ভাষাতেও গতি ও দ্যুতির অভাব ছিলো না (যেমন 'বাঙ্গালীর শিক্ষা' প্রবন্ধে)। মোট তেরটি লেখা তিনি 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশ করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ উনিশ শ' তের থেকে উনিশ শ' ছেচল্লিশ, এই দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ধূর্জটি-প্রসাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক। যুবক বয়সে একদল বন্ধু নিয়ে মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো বীরবলের পাশে ভিড় করেছেন তিনি: বুদ্ধিধর্ম, চিন্তাশীলতা ও বিচারপ্রবণতার দীক্ষা নিয়েছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। নিজের বিশেষ মনটিকে তৈরি করেছেন গুরুর সহায়তায়। তাইতো চিন্তানায়ক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রমথবাবু বলতেন কোনো কিছুতে ডুবে যেতে নেই। তিনি ধূর্জটিপ্রসাদকে বের্গসঁর রচনায় দীক্ষিত করেন। পরে বের্গসঁর খপ্পর থেকে বাঁচান। আবার ধূর্জটিপ্রসাদ পড়লেন রাসেলের গর্তে। সেখান থেকেও উদ্ধার করলেন। ক্রোচে পড়তে বললেন। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ যাত্রার অভিলাষ ও নোতুন খাসের খিদে প্রমথ চৌধুরীই ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন। এই কারণে তাঁর ওপর গুরুর প্রভাব—স্টাইলে ও বিষয়-বস্তুতে (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-এর প্রভাবও আছে)—অনস্বীকার্য। সবুজসভায় ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জোরেই তিনি বিশিষ্ট আসন নিয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ 'সবুজ-পত্রে' লিখেছেন কম, কিন্তু তাঁর রচনায় মূল্য পরিমাণগত নয়, গুণগত। যে সঙ্গীতচিন্তার জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ, তার শুরু ও প্রকাশ 'সবুজ-পত্রের' মাধ্যমেই হয়েছিলো। এই সব কারণেই বিশ্বভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৩৪৯) ভূমিকায় সবুজ-পত্রের সুলেখক হিসেবে ধূর্জটি-প্রসাদের নাম উল্লেখ করেছেন প্রমথ চৌধুরী।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—'আমাকে আকর্ষণ করেছিল সবুজ-পত্রের লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলী।……তারপর সুরেশ চক্রবর্তীর স্টাইল।' সুতরাং প্রমথ-শিষ্যদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র রচনারীতির গুণে পাঠকের দৃষ্টি নিঃসন্দেহে আকর্ষণ করতেন। তাঁর প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—সাহিত্যের এই ত্রিধারায় রবীন্দ্রনাথ ও বীরবলের পরেই তাঁর নাম করা যেতে পারে। কারণ, 'সবুজ-পত্রের' লেখকদের মধ্যে আর কেউ একই সঙ্গে এই তিন দিকের উল্লেখযোগ্য সাধনা করেন নি। প্রবন্ধে যে ভাষারীতি ও চিন্তাধারা তিনি দেখিয়েছেন, তা বীরবলের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ 'সাহিত্যে জাতরক্ষা' প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরেশচন্দ্রের মতে, সাহিত্যে জাতরক্ষার প্রশ্ন উঠতে পারে না, কারণ, সাহিত্য-সাম্রাজ্যের কোনো বাঁধা ফ্রন্টিয়ার নেই। মানুষের, সমাজের ও জাতির নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে, ফলে একই রকমের রস, একই রকমের সুর, একই রকমের ভঙ্গি চিরন্তন করে রাখবার চেষ্টাটা যে কেবল বিজ্ঞানসম্মতই নয়, তা নয়, তা সেটা সহজ জ্ঞানসম্মতও নয়। এইসব উক্তিতে যে স্বচ্ছদৃষ্টি, যে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিধর্ম, যে যুক্তি-ধারা ও প্রকাশভঙ্গি অভিব্যক্ত তা 'সবুজ-পত্রের'ই উপযুক্ত বলে মনে হয়। কোথাও তিনি সোজাসুজি বিরুদ্ধ পক্ষকে আক্রমণ করেছেন, কোথাও তাদের বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছেন। ফলে ভাবে ও ভাষায় তাঁর প্রবন্ধ মূল্যবান ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখনীতে জোর, চিন্তায় তীক্ষ্ণতা, ভাষায় দ্যুতি ছিলো বলে তিনি একসময়ে সহ-সম্পাদক হিসেবে সবুজ-পত্র পরিচালনার ভারও পেয়েছিলেন। পত্রিকাটিতে সুরেশচন্দ্রের রচনা পরিমাণে ও বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় (সবরকম মিলিয়ে ৩৯টি রচনা)।

পরিশেষে সুরেশচন্দ্রের লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ 'সুরেশের লেখার খানিকটা দূর পর্যন্ত পড়ে মনে হচ্ছিল তোমার লেখা পড়ছি, হঠাৎ পাতা উল্‌টে দেখলুম সুরেশের নাম। লেখাটা খুব ভালো লাগ্‌লো।'

কিরণশঙ্কর রায়ঃ আজকের বাঙলা দেশ রাজনৈতিক নেতা কিরণশঙ্করকে স্মরণ রেখেছে, বিস্মৃত হয়েছে সাহিত্যিক কিরণশঙ্করকে। তিনি তখন ইতিহাসের অধ্যাপক, যখন তিনি প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ-পত্রে' লিখতে এবং তাঁর আসরে আড্ডা দিতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিদগ্ধচিত্ত, মার্জিতরুচি ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। যেমন তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, তেমনি তাঁর লেখায় তার পরিচয় থাকতো। সবুজপত্রীদের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক আত্মীয়তা ছিলো, কিন্তু কিরণশঙ্করের সঙ্গে শুধু সাহিত্যিক আত্মীয়তা নয়, ছিলো জীবনের আত্মীয়তা; জীবনেও (art of living) উভয়ে ছিলেন সমধর্মী। তাই বোধহয় বীরবলের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির ত্রিকাল সম্পর্কে বহু বিচারসিদ্ধ নোতুন চিন্তা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। 'প্রাক্‌টিক্যাল' প্রবন্ধে তিনি বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক বিদ্যার বিরুদ্ধে, মানববিদ্যা (study of humanities) ও পুঁথিগত শিক্ষার সপক্ষে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন। একদিন আমাদের যথার্থ ইতিহাস চেতনা ছিলো না। দেশের খাঁটি ইতিহাস আমরা জানতাম না—কিরণশঙ্কর একথা বলতে ইতস্ততঃ করেন নি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন হয়েছে, তার পরিণতিতে আমাদের মুক্তি ঘটবেই—এ বিশ্বাসও কিরণশঙ্করের ছিলো। 'ঐতিহাসিক,' 'খাঁটি বাঙ্গালী', 'আমাদের অহঙ্কার' ইত্যাদি প্রবন্ধে এমনিতর কত নোতুন কথারই

সন্ধান পাই। সঙ্গে সঙ্গে 'সবুজপত্রের' যজ্ঞেশ্বর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের কথা মনে পড়ে। 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত তাঁর গল্পের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবু 'স্বপ্নহার' গল্পে যে অনন্য শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার উপযুক্ত চর্চা হলে তিনি নিঃসন্দেহে কৃতী কথা-সাহিত্যিক হতে পারতেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ ব্রাইট ষ্ট্রীটের সবুজসভার সভ্য ও 'সবুজ-পত্রের' লেখক হিসেবে এঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষা-বিচারে সুনীতিকুমারের বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব এবং যুক্তিনিষ্ঠা সমস্ত গোষ্ঠীর পক্ষেই মূল্যবান ছিলো। যে সময়ে তিনি মজলিশে যাতায়াত করতেন তখন তাঁর বয়স বেশি ছিলো না—তবু তাঁর বক্তব্য 'আসর' ও 'সবুজপত্রের' পৃষ্ঠায় উপযুক্ত মর্যাদা পেতো। তাঁর বহুমুখী জ্ঞানস্পৃহা বীরবলের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়। এক সময়ে তিনি বীরবলের প্রেরণায় কথ্যভাষাতেই প্রবন্ধ রচনা করতেন। বিদেশে পড়াশুনো ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকার সময়েও তিনি 'সবুজ-পত্রকে' রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে ভোলেন নি। 'আর্য-অনার্য' ও 'বাঙলা ভাষার কুলজী' প্রবন্ধ আজও তাঁর 'সবুজ-পত্রের' যুগের মনীষার স্বাক্ষর বহন করছে। এইসব কারণেই পত্রিকাটির সুলেখক হিসেবে তাঁর নাম প্রমথ চৌধুরী বিশ্বভারতী পত্রিকায় পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন।

সতীশচন্দ্র ঘটকঃ সতীশচন্দ্র ঘটকের পেশা ছিলো ওকালতি, কিন্তু নেশা ছিলো সাহিত্যে। তিনি ছিলেন 'সবুজ-পত্রের' লেখক ও আড্ডাধারী। গুরুগম্ভীর ও লঘুস্বচ্ছ এই উভয় জাতীয় লেখায় তিনি ছিলেন সমান ওস্তাদ। গুরু প্রমথ চৌধুরী বলতেন—'বিজ্ঞতার আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য। গাধাবোট চলে না দেখে, লোকে মনে করে, না জানি তাতে অগাধ মাল বোঝাই আছে।' এবং

'আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এহেন অদ্ভুত ধারণা এদেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখে হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংস মনে করি।' এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই শিষ্য সতীশচন্দ্রের মুখে ঃ 'ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ বলেই জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে হাস্যরস অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য···হাস্যরস জীবন থেকে লোপ পেলে সে সভ্যতা বুনো ও কুনো হয়ে ওঠে।' হাসির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বলেই সতীশচন্দ্র 'হাসি' প্রবন্ধ নিয়ে 'সবুজ-পত্রে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাতে হাসির যে বিশ্লেষণ ছিলো তা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। তবে সতীশচন্দ্র 'সবুজ-পত্রের' শুধু হাস্যরসাত্মক রচনাই প্রকাশ করেন নি, প্রকাশ করেছেন গুরু প্রবন্ধ, গম্ভীর রসের গল্প, গভীর ভাবের কবিতা। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রকাশও কম ছিলো না, কম ছিলো না সরসতা ও উপাদেয়তার উপকরণ। সতীশচন্দ্রের মোট বারোটি নিজস্ব রচনা 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত হয় ('গাছ' প্রবন্ধমালার কোনো কোনো প্রবন্ধ যেমন তিনি নিজে লেখেন, তেমনি কোনো কোনোটি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বাচস্পতির সঙ্গে লেখেন। সব ধরলে ষোলটি প্রবন্ধ তাঁর নাম অঙ্গীকার করে আত্মপ্রকাশ করে)।

বরদাচরণ গুপ্ত ঃ প্রথম যৌবনে বরদাচরণ প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করে নিয়ে 'সবুজ-পত্রের' লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 'সবুজ-পত্রের' আড্ডায় নিয়মিত যেতেন, কিন্তু আলোচনায় স্বয়ং যোগ না দিয়ে তর্কের বিষয়বস্তু ও যুক্তির ধারা লক্ষ্য করতেন। তারপর জোরালো ও তেজালো ভাষায় তার রূপ দিতেন প্রবন্ধে। যৌবনসুলভ সাহস ও স্পষ্টবাদিতা বরদাচরণের ছিলো। সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, জীবনাদর্শে সংস্কারাচ্ছন্নতা ও জড়তার বিরুদ্ধে তিনি মসীযুদ্ধ

ঘোষণা করেছিলেন, 'সবুজ-পত্রের' পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ আছে প্রচুর। মুক্ত বুদ্ধির পক্ষে ও বিকৃত বুদ্ধির বিপক্ষে তার অভিযান প্রমথ চৌধুরীর নববুদ্ধিবাদের (neo-intellectualism) আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে জোরদার করেছিলো। কিন্তু নোতুনকে গ্রহণ করতে গিয়ে তিনিও বীরবলের মতো বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বরদাচরণ সাহিত্যে গুরুর ভাববাদই শুধু মেনে নেন নি, মেনে নিয়েছেন রচনারীতিও। 'ধীরে লেখা ও ধরে লেখার', 'চৌকশ ও চৌরষ' করে লেখার যে আদর্শ বীরবল প্রচার করেন বরদাচরণের লেখায় তারই অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। শব্দচয়নে ও বাক্যগঠনে যত্ন ও নিষ্ঠা তাঁর ছিলো, অর্থধ্বনি ও শব্দধ্বনি একই সঙ্গে যাতে শ্রবণ-মনের সন্তোষ আনে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো সজাগ। তাই প্রমথ চৌধুরী বরদাচরণকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—'লেখক হবার জন্য প্রয়োজন সত্যকার concrete-এর জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ভাষার উপর অধিকার। এই দুই জ্ঞানের সমান পরিচয় তোমার লেখায় পাওয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনতে পাই—'বরদাবাবুর লেখাটিও বেশ সারালো, ধারালো ও রসালো হয়েছে।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বরদাচরণ এযুগের পাঠকের কাছে অপরিচিত হলেও প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য ও 'সবুজ-পত্রে'র সার্থক লেখক হিসেবে স্মরণযোগ্য।

বিশ্বপতি চৌধুরী : বিশ্বপতি চৌধুরী সুরসিক ব্যক্তি। বৃত্তি তাঁর অধ্যাপনা, কিন্তু ব্রত হচ্ছে আড্ডা জমানো। গানের আসর, ছবির ষ্টুডিও, সাহিত্যের মজলিশ ইত্যাদি সব কিছুতেই তিনি মেতেছেন—কারণ তিনি গাইতে পারেন, আঁকতে পারেন। সত্যিকারের একজন শিল্পীর মন তাঁর, কলাতত্ত্বে তাঁর অধিকার অব্যবহিত ও গভীর। তা না হলে ছাত্রাবস্থায় প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে 'হিন্দু সঙ্গীত' নিয়ে বিরোধ ও তর্কে প্রবৃত্ত হতেন না। শুনা যায়, ল' কলেজে অধ্যাপনা করতে

গিয়ে বীরবল ক্লাশ থেকে খুঁজে বের করছিলেন বিশ্বপতি চৌধুরীকে এবং তাঁর অকুণ্ঠ সাহস ও যুক্তিনিষ্ঠার জন্যে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। এই আড্ডারসিক রসসন্ধানী তর্কবিলাসী ব্যক্তিটির ধারালো ও রসালো আলোচনার কথা সবুজ-সভার সভ্যেরা জানেন। তিনি গল্প ও প্রবন্ধ মিলিয়ে চারটি রচনা 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশ করেন। 'দু দুবার' গল্পে যে অপূর্ণতার বেদনা বা গভীর ট্র্যাজেডি আছে তা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি গুরু প্রমথ চৌধুরীর মতোই একটা তাচ্ছিল্যের সুর দিয়েছেন, মাঝে মাঝে বিদ্রূপের ভঙ্গি গভীর দুঃখকে চেপে রাখার প্রয়াস পেয়েছে।

হারিতকৃষ্ণ দেব : 'সবুজ-পত্রের' আড্ডায় শোভাবাজার রাজবাড়ির কৃতী সন্তান হারিতকৃষ্ণ দেবকে দেখা গেছে নিয়মিত, যদিও 'সবুজ-পত্রের' সূচীতে তাঁর নাম দেখা দেয় নি বারে বারে। তিনি ছিলেন মজলিশী লোক, আড্ডা জমানোতেই তাঁর মনের আনন্দ ছিলো। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়-এর গণ্ডি পেরিয়েই তিনি মৌমাছির মতো খুঁজে নিয়েছিলেন সবুজ-সভার মৌভাণ্ডারটি। হারিতকৃষ্ণ চিরজীবন জ্ঞান-তপস্বী— প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এই সমস্ত কারণেই তিনি প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। 'সবুজ-পত্রে' তাঁর দু'টি রচনা প্রকাশিত হয়।

৩

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গ্রামীণ। কিন্তু এই গ্রামীণ সাহিত্যের ইতিহাসেও এমন কয়েকজন লেখকের সন্ধান মেলে—যাঁরা কবিধর্মের সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যে একান্ত সমুজ্জ্বল। তাঁরা সরল ও অসংস্কৃত গ্রাম্যকবি নন; তাঁরা হলেন বিদগ্ধ মনন ও অভিজাত রুচিসম্পন্ন রাজকবি। বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতিকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। তাঁরা চারণ ছিলেন না—বাঙলার প্রাণের সঙ্গে ছিলো না তাঁদের নাড়ীর টান। রাজ-কবিরা নিয়েছিলেন সভাসদ্‌বৃত্তি; তাঁদের ছিলো রাজন্যদৃষ্টি—রাজসভার ঝলসানো রঙিন আলোতে বাঙলাকে, বাঙালীকে দেখেছিলেন তাঁরা। তাই তাঁদের চটকদার 'সভা-সাহিত্যের' বৈশিষ্ট্য 'গ্রামীণ-সাহিত্যের' বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্র ধরণের।* সে যাই হোক্, রাজকবিদের সাহিত্যের কথা মনে রেখেও বলা যায়, সেকালের বাঙলা সাহিত্য গ্রামীণ। এই গ্রামীণ সাহিত্য প্রথম সর্বতোভাবে নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ঈশ্বর গুপ্তের আমলে। গুপ্তকবির সময়ে রাজদরবার ছিলো না, তার বদলে গড়ে উঠছিলো এযুগের রাজধানী নগর এবং সেই নগরের নাগরিকতাবোধ নিয়ে ক্রমে

* সেকালের কবিরা অনেকেই অল্পবিস্তর সভাসদ্‌বৃত্তি গ্রহণ করলেও তাঁদের সকলকেই রাজকবি বলা যায় না। ভারতচন্দ্র যে অর্থে রাজকবি, মুকুন্দরাম সেই অর্থে রাজকবি নন। মুকুন্দরাম সভাসদ্‌বৃত্তি নিলেও গ্রামীণ বাঙলার প্রাণের সঙ্গে নাড়ীর টান ছিলো বলেই তিনি গ্রামীণ কবি, তাঁর সাহিত্য একান্তভাবেই 'গ্রামীণ সাহিত্য'। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রেরও ছিলো সভাসদ্‌বৃত্তি, তবে গ্রামীণ বাঙলার সঙ্গে ছিলো না তাঁর অন্তরের যোগ। তাই তিনি রাজকবি, তাঁর সাহিত্য 'সভা-সাহিত্য'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একই সভাসদ্‌বৃত্তি নেওয়া সত্ত্বেও সেকালের কারো সাহিত্য 'সভা-সাহিত্য' আবার কারো সাহিত্য 'গ্রামীণ সাহিত্য'।

আবির্ভাব শুরু হলো এক শ্রেণীর নাগরিক সাহিত্যিকের। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই নাগরিক সাহিত্যিকেরা রাজকবিদের উত্তরপুরুষ। রাজকবিদের চোখে যেমন ছিলো রাজসভার বিশাল মশাল, তেমনি নাগরিক সাহিত্যিকদের চোখে রইলো রাজপথের আলোর মিছিল। বৃহত্তর গ্রামীণ বাঙলা সেখান থেকে বহুদূরে। বাঙলার নগর—নাগরিক সংস্কৃতি—নাগরিক সাহিত্যের উৎপত্তির এই হলো মোটামুটি ইতিহাস।

কিন্তু এই ইতিহাসকে সকলে স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে, নাগরিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজ ও ঐতিহ্যের কোনো মিল নেই। এদেশে 'নাগরিক জীবন নকল জীবন'—তা ইংরেজ রাজত্বের অভিশাপ মাত্র। সত্যি কি তাই?

সমাজবিজ্ঞান বলে, সভ্যতার বিবর্তনে নগরের সৃষ্টি; মানুষের সামাজিক ইতিহাসের এটা একটা অবশ্যম্ভাবী অধ্যায়। নগর—শতাব্দীর খেয়ালের খুশিতে নয়, যুগের দাবীতে তৈরি মানুষের নোতুন বাসর। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে একদিন যাদের ঘরকন্না শুরু হয়েছিলো, নগরের ইমারতে তাদের আবার অভিষেক হচ্ছে। পৃথিবীর সঙ্গে নোতুন প্রেমে আবদ্ধ হচ্ছে মানুষ। তাই যেখানে কার্থেজের পারে ডিডোর দু'দিনের খেলাঘরে আকাশ ভেঙে জ্যোৎস্না ঝরতো, সেখানে বৈদ্যুতিক কঙ্কালোকে বিলাসী নারীর সঙ্গে কেলি করছে এযুগের মানুষ। লহনা-খুল্লনা-রঞ্জাবতীর সমাজে দেখা দিয়েছে ঊর্মিলা-অচলা-মক্ষিরাণীর দল। মুক্ত মাঠের মিষ্টি হাওয়াকে দূষিত করছে কলকারখানার ধোঁয়া। কোনটা ভালো সে-প্রশ্ন তোলা চলে, কিন্তু তুলে লাভ নেই। নগর—নাগরিক জীবন—নাগরিক সংস্কৃতি ধনতান্ত্রিক যুগের অনিবার্য সৃষ্টি।

প্রমথ চৌধুরী

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবাসীর অধিকাংশ ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ গ্রামে।* তাই এখানকার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রধানতঃ গ্রামীণ। এই গ্রামীণ সভ্যতার দেশেও ইংরেজের রাজত্ব-কালে শিল্পবাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছে ' এবং তাকে গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক পরিবর্তন অবশ্য স্বীকার্য।

তবে একথা ঠিক যে, ভারতবর্ষে গ্রামীণ সভ্যতার তুলনায় নাগরিক সভ্যতার প্রকাশ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যা সীমাবদ্ধ তা নকল নয়, তাকে 'টবে-পোঁতা গাছের' সঙ্গে তুলনা করাও হাস্য-কর। যদি তাই হতো, তবে কলকাতার মতো নগর আমাদের নোতুন চিন্তা, ভাব ও কর্মধারার উৎস হয়ে উঠতো না। অন্যদিকে সীমাবদ্ধ নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে যে সাহিত্য গড়ে উঠছে তা পরিমিত বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। নাগরিক সভ্যতার দেশ ইংলণ্ডে যদি টমাস হার্ডির আবির্ভাব মিথ্যা না হয়, তবে এই গ্রামীণ

---

* সন	—	গ্রাম্য অধিবাসী	—	নাগরিক অধিবাসী
১৯১১	—	৯০·৬%	—	৯.৪%
১৯৪১	—	৮৭%	—	১৩%

'১৭৭৪ খৃঃ যখন ইংরেজ রাজ এই নগরে (কলিকাতায়) ব্রিটিশভারতের রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন ইহা স্বতঃই আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল, কারণ ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেকালের মত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন পল্লী-সমাজের অনুকূল নহে। সেকালের পঞ্চায়েৎ ও জমিদারের কাছারির স্থান এখন সহরের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন সহরের উপকণ্ঠে কলকারখানার প্রতিষ্ঠাও পল্লীসমাজের লোপসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।' বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু।

অবশ্য সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকের অভাব কোনো দেশেই হয় না। তাই টমাস হার্ডিকেও বলা হয়ঃ 'Village atheist brooding and blaspheming over the village idiots.' (G. K. Chesterton)। আর এদেশের নাগরিক সাহিত্য সম্বন্ধেও শুনতে হয়ঃ 'আমাদের নাগরিক সাহিত্য নাগরিক জীবনের মত দেশের প্রকৃত ও সহজ জীবন হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া দেশের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে।...নাগরিক জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুধু নকল সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে।'* সভ্যতার দেশে নাগরিক সাহিত্যিকের আবির্ভাব মিথ্যা হবে কেন? সমাজবিজ্ঞানের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা আছে অন্ততঃ তাদের কাছে এই ধরণের মন্তব্যের কোনো মূল্য আছে বলে মনে হয় না।

প্রমথ চৌধুরী নাগরিক সাহিত্যিক, বিংশ শতাব্দীর বাঙলার নাগরিকতার ভাষ্যকার।

তাঁর সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ড্রয়িংরুম কিংবা ক্লাবঘর—দরজা জানালা বন্ধ। টেবিলের ওপর ইতস্ততঃ বই ছড়ানো, দেয়ালে রঙীন শেডের নিচে বিজলী আলো জ্বলছে। সোফা-কৌচে কিংবা ফরাসে আসর জম-জমাট। চায়ের কাপে ঝড় উঠেছে, শ্রোতা সুনির্বাচিত, বক্তা প্রমথ চৌধুরী। বক্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি ও মননের কসরত আছে, সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক আছে, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দিয়ে অতর্কিত আঘাতের চেষ্টা আছে, আছে তর্কসুলভ নানা অবান্তর কথার সমাবেশ। শ্রোতারা নির্বাক বটে, কিন্তু তাদের সম্ভাব্য যুক্তি নিয়ে 'লক্ড়ি' খেলতে বক্তা কুণ্ঠিত নন। কিংবা বিচিত্র ধরণের নরনারীর বাক্‌বিতণ্ডায় আসরটি

* নব-নাগরিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের এই জেহাদের (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—১৩২১-২২) অন্যতম লক্ষ্য ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

মুখর, কিন্তু সবচেয়ে বেশি শোনা যায় প্রমথ চৌধুরীর গলা। এক-কথায়, আসরটি চণ্ডীমণ্ডপের নয়, এযুগের নগরের ড্রয়িংরুম কিংবা ক্লাবঘরের। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'ফরমায়েসি গল্প' নামক রচনাটির কথা মনে পড়ে। তার পটভূমিকায় আছে কোনো এক জমিদারের একটি বৈঠকখানা—কিন্তু আসলে বৈঠকখানাটি যে একটি ক্লাবঘরেরই নামান্তর মাত্র, তা গল্পটি একটু মনোযোগের সঙ্গে পড়লেই ধরা পড়ে। আর চরিত্রগুলির তর্ক-বিতর্কের ধারা অনুসরণ করলে তাদের নাগরিক অধিবাসী বলেই ধারণা হয়।

কিন্তু স্বীকার করা কর্তব্য, নাগরিকতা প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বিশেষ রঙ আনলেও তার পশ্চাতে ছিলো মানবিকতার একটি বিরাট পটভূমিকা। কোনো মিষ্টিক কল্পনা তিনি প্রশ্রয় দেন নি, কোনো অধ্যাত্ম-চেতনা তিনি স্বীকার করেন নি, কোনো আধিদৈবিক প্রভাব তাঁর দেহ-মনের ওপর ছিলো না। তিনি মানুষকে জানতেন, মানুষকে চিনতেন,—তাঁর ভাবনার বিষয়ও ছিলো মানুষ। তবে দেবতা-নির্ভর যে মানব-জীবন তার চিন্তাও তাঁকে কবলিত করে নি —ডিভাইন তো দূরের কথা। যে মানুষের জীবন পুরুষকারের জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও মনুষ্যত্বের গৌরবে মহিমময় তিনি ছিলেন তারই অনুরাগী। এককথায়, প্রমথ চৌধুরী মূলতঃ ছিলেন হিউমানিষ্ট। যে হিউমানিজম্ 'is the parent of all modern developments whether intellectual, scientific or social' প্রমথ চৌধুরীর মতো সজীব ও সবুজের ভক্ত তাকে স্বীকার করতে দ্বিধা করতে পারেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীর পশ্চিম য়ুরোপের এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ইতিহাস-সচেতন মন অনুরক্ত ছিলো, বুদ্ধি ছিলো সজাগ, দৃষ্টি ছিলো অব্যবহিত ('বাঙলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ দ্রঃ) —তাইতো মানুষকে মুক্ত সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে (not as

the thrall of theological despotism), শুদ্ধবুদ্ধি ও জ্ঞানের আদর্শ স্থাপন করতে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মুখে শুনতে পাই: 'হিউমানিজম্ কথাটির পিছনে পাঁচশো বছরের ইতিহাস রয়েছে। আগেকার দিনে ভাবুকরা ডিভাইনকে কেন্দ্র করে ঘুরতেন। তার বদলে যারা হিউমানকে কেন্দ্র করেন, গির্জায় না গিয়ে ল্যাবরেটারীতে বা লাইব্রেরীতে যান, টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপ বানান, থিওলজির পরিবর্তে ফিলসফি চর্চা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসফির চেয়ার প্রতিষ্ঠা করেন, মানুষের প্রকৃত অধ্যয়নের বিষয় যে মানুষ এই মন্তব্য প্রচার করেন ও মানবনিয়তির ধ্যানে বিভোর থাকেন, তাঁরাই হিউমানিষ্ট ও তাঁদের মতবাদই হিউমানিজম্। মতবাদ না বলে জীবনবেদ বলা যেতে পারে। তাঁরা ডিভাইনপন্থীদের মতো জনপ্রিয় ছিলেন না, জনতা তাঁদের বুঝতে পারত না, তাঁরাও জনতাকে বোঝাবার জন্য বর্ণ পরিচয় ও শিশু-বোধক লিখতে নারাজ ছিলেন।······গ্রামে বাস করলে বিদ্যাসাগরের মতো ঢিল খেতে হতো, গ্রামে তো ডিভাইনওয়ালাদের একচ্ছত্র শাসন। যেমন এদেশে তেমনি ওদেশে। শহরেও যে নির্যাতন ছিল না তা নয়। তবু সেখানে আত্মগোপনের সুযোগ ছিল। পশ্চিমের হিউমানিষ্টরা বেশীর ভাগই লেখাপড়ায় ও অনুসন্ধানে নিবিষ্ট থাকতেন, যেখানে তার ব্যবস্থা ছিল সেইখানেই তাঁদের স্থিতি ছিল। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত আরেক জায়গায় তাঁদের দৌড় ছিল। ধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট। বলা বাহুল্য, এসব নগরেই অবস্থিত।' অর্থাৎ পশ্চিমের হিউমানিষ্টরা নগরে বাস করেই ও লেখাপড়ায় নিবিষ্ট থেকেই হিউমানিষ্ট। প্রমথ চৌধুরীও কলকাতা মহানগরীতে বাস করতেন, হাইকোর্টের সঙ্গে বৃত্তিসূত্রে যুক্ত ছিলেন, ল' কলেজে অধ্যাপনাকালে

ও অন্যান্য সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগও ছিলো। কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় ছিলো লাইব্রেরীতে—পুঁথির জগতে—সেখানে মানব-বিশ্বের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে, বিচার ও বিশ্লেষণে রত ছিলেন। তিনি ছিলেন থিওলজির রাজ্য থেকে যোজন দূরে, ফিলসফি ছিলো তাঁর চর্চার বিষয়। এইভাবেই তিনি যে হিউমানিজমের দীক্ষা ও দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে রবীন্দ্রনাথের হিউমানিজমের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর হিউমানি-জমের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনকে নানাদিক দিয়ে, নানাবর্ণ ও রূপের আলোতে, নানারসের আশ্রয়ে উপলব্ধি করবার সাধনায় ছিলেন ব্যাপৃত ; মানব-জীবন ছিলো তাঁর ধ্যানের বিষয়, অনুভবের বিষয়—হৃদয়ের শিকড় চালিয়ে তিনি মানবরস আহরণ করেছেন আজীবন। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক লেজ্‌নির ভাষায় : 'from a conviction of the nobility of man's mission in the world he derives a philosophy, which culminates in his unhesitatingly positive attitude towards life and in his later conception of the divine nature of mankind.'• অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরীর কাছে মানব-জীবন ধ্যানের বিষয় নয়—অধ্যয়নের বিষয়, অনুভবের উপকরণ নয়—বিচার-বিশ্লেষণের উপকরণ। তিনি হৃদয়ের শিকড় চালিয়ে মানবরস আহরণ করেন নি, বুদ্ধির যন্ত্রে মানবরস নিষ্কাশিত করেছেন। জীবনের রূপ-রস-রঙের পূজারতি নয়, তার সত্য রূপের অনুসন্ধানই প্রমথ চৌধুরীর একমাত্র লক্ষ্য। মানুষকে মানুষরূপে দেখারই চেষ্টা ছিলো তাঁর, মানুষের অমৃতরূপের (divine nature of mankind) সন্ধান তিনি করেন নি। এককথায়, প্রমথ চৌধুরীর মানবতা আস্তিক্যহীন বুদ্ধিবাদ থেকে আর রবীন্দ্রনাথের মানবতা অধ্যাত্ম-বিবেক থেকে উৎসারিত।•

প্রমথ চৌধুরীর এই যে মানববাদ—তার ওপর পড়েছিলো নাগরিকতার প্রলেপ। আমরা তাঁর মনোজীবনের আলোচনায় দেখেছি, ছেলেবেলায় নানাশ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। অতুলচন্দ্র গুপ্তও লিখেছেন: 'প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় রহস্য করে বলেছি যে, ছয় কোটি বাঙালীর মধ্যে প্রমথবাবু চার কোটি লোককে চেনেন।' এ সবই সত্যি। কিন্তু অল্পবয়সে নানা-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করলেও পরবর্তী নিরুদ্বিগ্ন সচ্ছল জ্ঞানানুসন্ধানী নাগরিক জীবনে নাগরিক মানুষের মধ্যেই তাঁকে বাস করতে হয়েছিলো, তখন বৃহত্তর বাঙালী সমাজ তাঁর কাছে আর প্রত্যক্ষ থাকে নি। অন্যদিকে নাগরিক মানুষকেও পথে নেমে এসে দেখার ইচ্ছা তাঁর হয় নি। 'লেখাপড়া যার পেশা নেশা কাজ আর খেলা' তিনি যে পুঁথির জগতের মানুষ, তিনি কি করে পথচারী হবেন?* তবে তখন সমজাতের একশ্রেণীর মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। নগরের যে মজলিশে বিদগ্ধ জনের আসা-যাওয়া, যেখানে চায়ের কাপে চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আলোচনা চলে, যেখানে যুক্তি-তর্কের, বাদ-প্রতিবাদের বাঁকাপথে বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরে পড়ে—সেখানে, নাগরিক জীবনের সেই অংশে তিনি ছিলেন নিত্য-

---

* তাই তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন: 'বাইরের দুনিয়াটা যদি আপনি কম জেনে থাকেন, দেশের মানুষকে ত প্রাণে প্রাণে জেনেছেন, সেটাই কি কম কথা! মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষকে অবহেলা করে আমরা যারা লেখাপড়া নিয়ে মজে থাকি, তাদের জীবনে বিরাট ফাঁক থেকে যায়। কিছুটা ফাঁকিও...।'—চলমান জীবন (২য় পর্ব)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। এখানে 'মানুষকে অবহেলার' করার অর্থ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে না জানা এবং তা যে নাগরিক পরিবেশে তিনি করেছিলেন, তা নিজেই স্বীকার করছেন। অন্যদিকে 'লেখাপড়া নিয়ে মজে থাকার' সময়ে তিনি মানুষকে পেয়েছেন পুঁথির দূতীয়ালিতে, বুদ্ধি ও চিন্তাসূত্রে। ধূর্জটিপ্রসাদ এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের বৃহত্তর সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতির প্রশ্ন তুলেছেন।

হাজির। তখন প্রমথ চৌধুরীর মানব-বীক্ষণ চলেছে নগরের গবাক্ষ-পথে, রাজপথের বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায়। অর্থাৎ পরবর্তী জীবনে তাঁর মানববাদ নাগরিক আবহাওয়ায় অন্ততঃ খানিকটা নাগরিকতাধর্মী হয়ে পড়ে.(অন্যান্য হিউমানিষ্টদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে কিনা সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে হয়েছে)। বীরবলের মানবিকতার ওপর নাগরিকতার এই প্রভাব প্রমথ-শিষ্য সতীশ ঘটকের ভাষায়, নদীর জলে মেঘের ছায়ার মতো ; প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায়, স্বচ্ছ স্ফটিকের বুকে ফুলের বর্ণচ্ছটার মতো। বলা দরকার, এই নাগরিকতা মানববাদের বিপরীত নয়, তার পক্ষে গ্লানিকর নয়, তারই পরিপূরক মাত্র। ✓এককথায়, প্রমথ চৌধুরীর নগরচেতনা তাঁর মানবচেতনারই একটা অভিক্ষেপ (projection) ছাড়া কিছু নয়। একথাটির উল্লেখ না করলে এই নাগরিকতা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

কেউ কেউ প্রমথ চৌধুরীকে বিলেত-ফেরত সাহিত্যিক বলে থাকেন। এই জাতীয় বিশেষণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমার রচনারীতি, আমার মতামত যাঁদের মনঃপূত হয় না, তাঁরা অনেক সময় আমার আগে বিলেত-ফেরত বিশেষণ বসিয়ে দেন। সম্ভবতঃ পাঠক-সমাজকে এই কথা বোঝাতে যে, আমার মতামত সকল আমি বিলেত গিয়ে সংগ্রহ করেছি। কথাটি সত্য নয়, তার প্রমাণ পাঠকমাত্রেই আমার বিলেতযাত্রার পূর্বে লিখিত এই প্রবন্ধেই ('জয়দেব') পাবেন। আমার হাল লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে, আমার একালের ও সেকালের মতামতের পিছনে একটি বিশেষ জাতির মন আছে নূতন দেশকালের স্পর্শে যে মতের জাত যায় না। তিন বৎসর বিলেত-বাসের ফলে আমার মনের ও মতের কিছু বদল হয়নি এমন কথা

বললে একটা মস্ত বাজে কথা বলা হবে, আমার বক্তব্য শুধ্ এইটুক্ যে, বিলেত গিয়ে আমার মনের ধাত বদলে যায়নি।'

'প্রমথ চৌধুরী মননধর্মী লেখক—তার পেছনে তাঁর নিজের জীবন-ধর্মই নেই, আছে যুগধর্মও। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালেই মনে হয়—এটা বিজ্ঞান তথা বুদ্ধির যুগ, তাই যুগধর্মও বুদ্ধিপ্রসূত। যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের জীবনও ক্রমশঃ হৃদয়ধর্মবর্জিত ও বুদ্ধিবৃত্ত হয়ে উঠছে। এই ধনতান্ত্রিক যুগের সৃষ্টি নাগরিক জীবন তার প্রমাণ। প্রমথ চৌধুরী নাগরিকতার কথক—যুগধর্মের পতাকাবাহী। সুতরাং তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধির—মননের লীলা-খেলা অনিবার্য। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য: 'সাধারণ লক্ষণ হিসাবে নবীন সাহিত্যকে মোটের উপর বুদ্ধিপ্রসূত বলা যাইতে পারে। আধুনিক উপন্যাস ও গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক, এমন কি কবিতা, বিশেষতঃ গদ্যকবিতা, সমস্তই বুদ্ধির ভূমি হইতে উদ্ভূত। বরঞ্চ যাঁহাদের রচনায় এই রসের কিছু কমতি, বর্তমান সাহিত্যিক-সমাজে তাঁহারা অকুলীন। ইহা ভালো কি মন্দ সে আলোচনা নিরর্থক। ইহাই যুগধর্ম, এবং খুব সম্ভব, জগতের যুগধর্ম। এবং যুগধর্মের প্রভাবে এ পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যেও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিতেছিল, প্রমথ চৌধুরীর কলম এবং তৎসম্পাদিত সবুজ-পত্রের প্রকাশ তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।'

যুগধর্ম সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

(ক) 'আমারও একটা পলিটিক্স আছে, যুগধর্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণমাত্রায় প্রভুত্ব করে।'

—রায়তের কথার টীকা।

(খ) 'গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সমাজের কি আর্থিক, কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাক্‌তেই সমাজের নূতন ঘর বাঁধতে সুরু না করি, তা'হলে দুদিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে, আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।'

—রায়তের কথার টীকা

(গ) 'সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত কিম্বা সর্বদেশে সর্বকালে সমান বলবৎ কোনও সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা।'

—নূতন ও পুরাতন।

(ঘ) সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চল্‌তে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে।'

—তর্জমা।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ যাকে 'কালান্তর' বলেন, তার ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং তার সমাধানের জন্য নতুন ideal-এর জন্ম হয়। দেশের সঙ্গে দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের চাইতে কালের প্রভেদ তার চাইতেও বেশি স্পষ্ট।

—তৃতীয় প্রস্তাব, ঘরে বাইরে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রমথ চৌধুরী সর্বতোভাবে যুগধর্মের পূজারী ছিলেন। আর যুগধর্মের পূজারী ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন নবীনতার পূজারী; 'সমস্ত কিছু সবুজ ও সজীবের উৎসাহস্থল।' তিনি জানতেন: 'পুরাতনকে আঁক্‌ড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা'; আর 'নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্ততঃ দুদণ্ডের জন্যেও!' তাই প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস: 'জীবনে আমরা সকলেই এক পথের পথিক এবং সে পথ হচ্ছে নতুন

পথ।' সৃষ্টির নিয়মেই পুরাতনের সঙ্গে নোতুনের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। 'জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নব-জীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙ্গে পড়ে, তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনও নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দু পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে—এ আশা দুরাশা মাত্র।' মন্তব্যটির মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ, পুরাতন ও নোতুন সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মত সুপরিস্ফুট। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয়, 'স্থিতি ও গতির মধ্যে কোন দূতীগিরি, সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। আর অতীত যে পরিমাণে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভিত্তি, সেই পরিমাণে তিনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার বেশি নয়। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর অধিক মমতা ছিলো। তিনি নিজেই বলেছেন: 'অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুই-ই বেশি আছে।' অন্যদিকে অতীত ও ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে তিনি কিভাবে দেখেছেন তাও উল্লেখযোগ্য: 'আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে আমরা বড় জোর বর্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিকভাবে, কিন্তু বর্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চেয়ে নির্মাণ করা যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্তমানের জ্ঞানলাভ

করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্তমানকেই সব চাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত, তাই সব চাইতে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড় একটা দৃষ্টিপাত করিনে। ঐ কারণেই বর্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না এবং তার রূপও আমাদের মনে ধরে না। তাছাড়া, বর্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে, কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্তমানের ইয়ত্তা করতে হ'লে কালের ঢেউ গুণ্‌তে হয় ; অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট পদার্থ, তার চারদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়, সুতরাং অতীতের গুণকীর্তন করা নেহাৎ সহজ, বিশেষতঃ চোখ বুজে।' এককথায় তাঁর মতে বর্তমানের আংশিক ব্যাখ্যাস্থল হচ্ছে অতীত, আর বর্তমান হচ্ছে ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল। সুতরাং অগ্রগণ্যতার দিক দিয়ে প্রথম হচ্ছে বর্তমান, তারপর ভবিষ্যৎ এবং সকলের শেষে অতীত। অন্যত্র তিনি বলেছেন: 'কি ছিলুম, সেইটে স্থির করতে হ'লে, পুরণো পাঁজি পুঁথি খুলে বসা আবশ্যক, কিন্তু কি হব, তা স্থির করতে হ'লে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যক, ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষী দেবে?'

এই সব আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ইভলিউসন অর্থাৎ বিবর্তনপন্থী, সমস্ত রকমের জড়তা, স্থিরতা, শিথিলতা, নিশ্চেষ্টতার বিরোধী। 'প্রবাহই হচ্ছে পবিত্রতা—স্রোত মানেই শক্তি', 'জগৎ গতির লীলা, সৃষ্টিছাড়া স্থিতি,' 'জীবন ও মনের সহজ গতি রোধ করে সমাজকে অটল করলেই তা অচল হয়ে পড়ে'—স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ইভলিউসন কি মানুষের চেষ্টানিরপেক্ষ জাগতিক নিয়ম? না, তা নয়। তাঁর মতে: ''ইভলিউসান ক্রমবিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়।

কোনও পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড় প্রকৃতির নেই এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। * ইভলিউসান জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউসানের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউসান অর্থে দৈব নয়,—পুরুষকার। তাই ইভলিউসানের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না।' অন্যত্র বলেছেন: 'এমন কোন জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস বৃদ্ধি ও বিপর্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম—সুতরাং জীবনের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ।' এখানে ইভলিউসানের আলোচনা প্রসঙ্গে দু'টি কথা লক্ষ্যণীয়—'পুরুষকার' ও 'ইচ্ছাশক্তি'। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর মতে ইভলিউসান পুরুষকারসাপেক্ষ এবং সেই পুরুষকারকে নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের সকল রকমের চেষ্টার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। 'জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ প্রকাশ।' আসল কথা, প্রমথ চৌধুরী মার্ক্সের 'Historical Materialism'-এ নয়, ডারুইনের 'Circumstantial Selection'-এ নয়—মোটামুটিভাবে বার্গসঁয়ের Creative Evolution-এ' বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'আমার দার্শনিক গুরু Bergson।' 'প্রাণের ধর্ম যে জীবন-প্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্বলোকবিদিত।······প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়।' 'প্রাণ পশ্চাৎপদ হ'তে জানে না,—তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব, নয় মৃত্যু।' এই ধরণের

* তুলনীয়—'Matter is described as a reverse movement of the flow of reality (i.e., of elan vital).'—The Philosophy of Bergson, C. E. M. Joad.

বহু কথাই আমরা প্রমথ চৌধুরীর মুখে শুনতে পাই। তাঁর চরম কথা : 'মানুষ যখন লাঙ্গলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অন্য কোন কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোণা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষি কাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়, অহং।'

এইখানে বার্ণাড শ'য়ের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সমধর্মিতার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কারণ, শ'ও 'Creative Evolution' -এ বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে অনেক।

এই 'Creative Evolution'-এর দিকে থেকে সৃষ্টিকে, পৃথিবীকে, মানুষকে দেখেছেন প্রমথ চৌধুরী। তাই যা জীবনী-শক্তির প্রতীক ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ—তাকেই তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'সবুজ-পত্রের' আলোচনায় তিনি বলেছেন : 'সবুজ হচ্ছে বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজ গুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং—জীবনের পূর্বরাগের রং। লাল রক্তের রং,—জীবনের পূর্ণরাগের রং। নীল আকাশের রং—অনন্তের রং। পীত শুষ্ক পত্রের রং,—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব সীমায় বেগুনী পশ্চিম সীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।' সবুজের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর আকর্ষণের কারণ এখানে সুস্পষ্ট। অন্যদিকে—মানব-জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন। অর্থাৎ যৌবনের অন্তরে শক্তি আছে; তাই প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী। যৌবনকে তিনি শুধু ব্যক্তির মধ্যে

দেখতে চান না, দেখতে চান সমাজের মধ্যেও—'যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজের যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে,—শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ ও অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে' গেলে' আবার ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।'

যে কারণে প্রমথ চৌধুরী রঙের মধ্যে সবুজকে, জীবনের ত্রিদশার মধ্যে যৌবনকে, ত্রিকালের মধ্যে বর্তমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন,—ঠিক সেই কারণেই তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্তকে, সর্বসাধনার মধ্যে কর্মকে ভালোবেসেছেন। এইবার বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা যায়—যুগধর্ম ও সমস্ত কিছু সবুজ ও নবীনের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর শ্রদ্ধার ব্যাখ্যা মেলে 'Creative Evolution'-এর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে।

বার্ণাড শ' 'Life force'কে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেছেন; মিথ্যা বলেছেন এই পৃথিবীকে, মানুষকে, মানুষের সভ্যতাকে। *

---

* Modern civilisation appears to him as a splendid show without any substance. Here everything is false and nothing is real.

—The Art of Bernard Shaw,
S. C. Sen Gupta,

অর্থাৎ 'Life force'-এর বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সৃষ্টিকে তেমন্ মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সৃষ্টি নয়, স্রষ্টাই (Life force) তাঁর কাছে বিবেচ্য বলে মনে হয়েছিলো। আর প্রমথ চৌধুরী 'Creative Evolution'-এ বিশ্বাস করতেন বলেই জীবনী-শক্তির ও ইচ্ছাশক্তির নিত্য নোতুন প্রকাশকে স্বীকার করেছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই পৃথিবীকে, মানুষকে, মানুষের সভ্যতাকে। জীবনীশক্তির সৃষ্টিপ্রবাহে প্রত্যেক যুগের পৃথিবী ও মানুষ ঢেউ মাত্র; প্রবাহকে বুঝতে হলে যেমন ঢেউয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়, তেমনি 'Creative Evolution'কে বুঝতে হলেও পৃথিবী ও মানুষকে বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ স্রষ্টার জন্যই সৃষ্টিকে যথোচিত মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কোনো কিছু সম্বন্ধেই প্রমথ চৌধুরী মোহ পোষণ করতেন না। মনে রাখতে হবে,—কালপ্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটি যুগকে সেই সময়ের জন্যে স্বীকার করার অর্থ মোহের বশবর্তী হওয়া নয়, ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। কারণ তাহলে মূল বিশ্বাসেরই বিরোধিতা করা হয়—মোহ বা ভাবালুতা স্থিতির পূজারী হতে, 'Creative Evolution'-এর প্রতি বিশ্বাসের অন্তরায় হতে বাধ্য। সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত বলেই, জীবনীশক্তির আধুনিকতম প্রকাশ বলেই নাগরিক জীবনকে, নাগরিক সভ্যতাকে প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন—বিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই নাগরিকতাকে পেছনে ফেলে জীবনপ্রবাহ একদিন এগিয়ে যাবে—সেই শুভদিনকেও স্বীকার করার জন্যে তাঁর মনে শুধু প্রস্তুতি নয়, আগ্রহও ছিলো। ভুললে চলবে না—প্রমথ চৌধুরীর মতো যাঁরা 'Creative Evolu-

tion'-এ বিশ্বাসী—তাঁদের 'সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই—সুমুখে গড়ে উঠ্‌ছে।' *

প্রমথ চৌধুরীর দর্শন 'Creative Evolution' বটে, কিন্তু সেই দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত বা বিযুক্ত কোনো সুসংবদ্ধ বা প্রবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর ছিলো বলে মনে হয় না। সত্য বটে, তিনি মাঝে মাঝে কংগ্রেসের দলাদলি বা আইডিয়েল, Diarchy (দ্বু-ইয়ারকি!), স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের কথা, রায়তের কথা, দেশের কথা, ঘরে বাইরের কথা আলোচনা করেছেন—কিন্তু সেই সব আলোচনাকে কোনো দৃঢ় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদের ফল বলে মনে হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন: 'পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি' তাঁর নেই এবং হবার ইচ্ছাও নেই; কারণ 'দেশের সাহিত্যিকেরা যদি সব পলিটিসিয়ান হয়ে ওঠে, তা হ'লে পাল্টা জবাব দেবার জন্য সব পলিটিসিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠ্‌বে। ফলে মনোরাজ্যে কী ভীষণ অরাজকতা ঘট্‌বে, তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়।' † তাছাড়া, তিনি ছিলেন 'ism-নাস্তিক'; তার প্রমাণ আছে রায়তের কথার ছত্রে ছত্রে। এই সমস্ত কারণেই আধুনিক রীতি অনুযায়ী

* 'It is the nature of life to be creative, and the individual taken as a whole is necessarily creative from the mere fact that he is alive. But if his life is creative, and creative in each moment of it, it is clear that it is not determined by what went before. If it were so determined it would only be an expression of the old, and not a creation of the new.'—The Philosophy of Bergson, C. E. M. Joad.

† এই মতের বিরোধিতা নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়:

(ক) আমরা কল্পনা রাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিক্সের বিষয় হচ্ছে জাতীয় ঘরকরণার বিষয়, সুতরাং পলিটিক্স সম্বন্ধে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আল্‌গা থাকতে পারিনে। —তৃতীয় প্রস্তাব, ঘরে-বাইরে।

(খ) শুধু একালে নয়, কোন কালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স এড়িয়ে যেতে পারে নি।—
—তৃতীয় প্রস্তাব, ঘরে-বাইরে।

কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইজ্‌ম্‌-এর দিক থেকে তাঁকে বিচার করা সহজ নয়।

তথাপি যুগধর্মের প্রভাব তাঁর মনের ওপর পূর্ণমাত্রায় প্রভুত্ব করতো বলেই সাময়িক চিত্তবিক্ষোভের ফলে তিনি মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেশে যখন লর্ড কার্জনের উপদ্রব হয়, তখন তাঁরও মনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো; তাঁরও চোখ ও মুখ একসঙ্গে খুলে গিয়েছিলো।[গ] সেই সব আলোচনা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন গণতন্ত্র (Democracy) ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় (Individualism or Liberalism) বিশ্বাসী। গণতন্ত্রকে তিনি শুধু দেশের মধ্যেই দেখতে চান নি, দেখতে চেয়েছেন সাহিত্যের মধ্যেও। তিনি বলেছেন: 'নব সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে' গণধর্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্যদেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক্, পড়বার

(গ) এ-যুগের পলিটিক্সের মোটকথা হচ্ছে economics, আর অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আমরা সাহিত্যিকেরাও পলিটিক্সের মতিগতি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে বাধ্য। —তৃতীয় প্রস্তাব, ঘরে-বাইরে।

এইসব বিরোধী উক্তি সত্ত্বেও, প্রমথ চৌধুরীর জীবনী ও সাহিত্য পড়লে মনে হয়, তিনি যেখানে সাহিত্যিকদের পলিটিক্স চর্চার পক্ষে রায় দিয়েছেন, সেখানে তাঁর সাময়িক চিত্ত-বিক্ষোভেরই প্রকাশ হয়েছে। রাধারাণী দেবীকে এক চিঠিতে তিনি বলেছিলেন যে, নানাসময়ে নানারূপ mood তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর আসল মত হচ্ছে—'পলিটিক্সে মেতে যাওয়াটা সাহিত্যিকের পক্ষে ক্ষতিকর।... স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করা যে ভয়াবহ, একথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যখন-তখনই আওড়াই।......সাহিত্যের ধর্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহুল্য মন ও মত এক বস্তু নয়।'—সাহিত্য বনাম পলিটিক্স, বীরবলের টিপ্পনী।

অধিকারও সকলের ছিল না—তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন ; এবং তাঁরা কাব্য, দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্র, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে' তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে, আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকবে না এবং কীর্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীরপাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায়, সাহিত্য-জগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল—কিন্তু নিত্য-ব্যবহার্য নয়।······নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হ'লে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই ; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে ; আকাশ আক্রমণ না করে', মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে।······এক কথায় বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতের যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে' অন্ততঃ ষষ্টি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন।······দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্র ধর্মাবলম্বী হয়ে উঠ্‌ছে তার জন্য আমার কোন খেদ নেই। একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে, তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়।' এই মন্তব্যের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সহজ বিশ্বাসের পরিচয় আছে।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে 'হু-ইয়ারকি', 'দেশের কথা—২' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। গণতন্ত্রের দ্বারা স্বীকৃত মানুষের মৌলিক অধিকারের সার কথা হচ্ছে—গভর্ণমেন্ট মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্তব্য, আর সর্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। প্রমথ চৌধুরী গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন 'পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের সাধনমন্ত্র' এবং গণতন্ত্রের মর্মকে 'নতুন ধর্মমত' (যার উদ্দেশ্য পারত্রিক মুক্তি নয়, ঐহিক মুক্তি) বলে প্রচার করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। গণতন্ত্র শুধু লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্রের কথাই বলে না, ব্যক্তিস্বাধীনতার কথাও বলে। প্রমথ চৌধুরী তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরও জোর দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্রের প্রসাদে প্রতি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে পারে বলেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এত আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয়। তাই Seignobos-এর অনুকরণে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, যিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না, গণতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করার অধিকার তাঁর নেই। ব্যক্তি-স্বাধীনতার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মুখে শুনতে পাই : 'বর্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এযুগে মানুষের উপর মনুষের কোনো অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়। অতএব একথাই নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই

ডিমোক্রাসীর গোড়ার কথা, আর তার শেষ কথা এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসীর ভিত্তি ও চূড়া।'

এ থেকে কেউ যেন অনুমান করবেন না যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে প্রমথ চৌধুরী উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক ছিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে একটা সীমা আছে, তা যে দেশ-কাল-পাত্রসাপেক্ষ তা তিনি ভুলে যান নি। তিনি বলেছেনঃ 'আমি অনেক বিষয়ে Liberal অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সকল লোককে কথায়, কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা, এজ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে, তখন জনৈক Liberal বলেছিলেন যে, I would rather have England free than England sober. আমার liberalism অবশ্য অতদূর উঁচুতে ওঠে না। Drunk স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় ত, তা Sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যাচ্ছে।' আশা করি, মন্তব্যটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজনীয়তা নেই।

গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র বলে, সম্পত্তির মালিক হবার সকলেই সমান অধিকার আছে। প্রমথ চৌধুরী সেই জন্যেই 'রায়তের কথায়'—বাঙলার রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে, তার প্রস্তাব করেছেন এবং যুগধর্মকে মেনে নেওয়ার জন্যে বাঙলার জমিদারদের কাছে করেছেন আবেদন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছেনঃ 'আজকের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ্য হ'লে প্রজা যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌বে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই ; এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন এই বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক

না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বল্‌তে পারে না। তবে একথা ভরসা করে' বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের কি আর্থিক কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই গোড়া আল্‌গা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে সুরু না করি, তাহ'লে দু'দিন বাদে হয়ত দেখতে পাবো যে, আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।' প্রমথ চৌধুরীর অর্থনৈতিক চিন্তা যে যুগধর্মী ও প্রগতিশীল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাকে কোনোমতেই বিপ্লবাত্মক বলা যায় না।

আসল কথা, প্রমথ চৌধুরীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দৌড় একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো।

প্রমথ চৌধুরী দর্শনের ছাত্র, দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়। তাই মানুষের মানসিক জড়তা, সঙ্কট ও মুক্তি নিয়ে তিনি যতটা আলোচনা করেছেন, তাদের বাস্তব জীবন নিয়ে ততটা আলোচনা করেন নি। শুধু তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে তিনি সহসা মানসিক জগতে পরিক্রমা করতে শুরু করেন এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সমস্ত বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে এগিয়ে আসেন। যা নিছক দৈনন্দিন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা—তারও মর্ম তিনি একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিলো : 'সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেখলে তাঁর স্বরূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।' ফলে যে সমস্যা বাস্তবধর্মী তার বিশ্লেষণ হয়েছে মানস বা চিন্তাধর্মী; যে সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় নির্দেশ করা উচিত, তার মানসিক বা চিন্তাগত সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মন তাতে খুশি হয় না, তারা বাস্তব সমস্যার বাস্তব

সমাধানেরই পথ দেখতে চায়। যে চিন্তার, যে মতবাদের ফলিত বা বাস্তব কোনো দিক নেই—তা কোনো যুগেই, কোনো সমাজেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বা শ্রদ্ধা বেশি পরিমাণে বা বেশিদিন আকর্ষণ করতে পারে নি। প্রমথ চৌধুরী যে বৃহত্তর জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তার অন্যতম কারণ ইহাই। তার জন্যে ক্ষোভ জাগা স্বাভাবিক, দুঃখ করা চলে, এমন কি অভিমানও হতে পারে—তথাপি তার কারণটাও তলিয়ে দেখা দরকার।

অতি-মানসিকতা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর জনপ্রিয়তার আর একটি অন্তরায় হলো—মানুষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর জীবনদর্শন। তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস তাঁকে গতানুগতিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষের বিচার বা মূল্য নিরূপণ করতে শেখায় নি। * তাঁর মতে, যাকে লোকে মূল্য দেয় না, তার যে সত্যি মূল্য নেই, একথা জোর করে বলা যায় না; আর যাকে মূল্য দেওয়া হয়, তার যে সত্যি মূল্য আছে, তা-ও নিশ্চয় করে বলা কঠিন। আসলে মানুষের প্রকৃতিকে আমরা যেভাবে ভালো-মন্দে বিভক্ত করে থাকি তা কৃত্রিম। তাছাড়া, প্রমথ চৌধুরীর ধারণা ছিলো, জীবনের কোনো একটি দিককে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য দিকগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা সমীচীন (আমরা সাধারণতঃ তাই করে থাকি) নয়। কারণ জীবনের অংশকে সমগ্র জীবনের প্রতিরূপ বলে ধরে নিলে মৌল মনুষ্যত্বের মর্যাদা হানি হয়। মনে রাখতে হবে, 'সমাজ-সংস্কার, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের প্রভাবেই সাধারণ মানুষের

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য :
'মানুষ খারাপ বলে আমি দুঃখ করিনে, কিন্তু মানুষ দুঃখী বলে মন খারাপ করি।'
—ইতিমধ্যে, বীরবলের হালখাতা।

প্রচলিত ধারণা বা মতামতের ওপর এই আঘাত হেনেছেন বলে মনে হয়। বস্তুতঃ, জীবনীশক্তির প্রকাশের দিক থেকে যদি বিচার করা যায়, তবে মানুষের পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে ভ্রান্ত বলে মনে না হয়ে পারে না এবং নোতুন রকমের মানব-বীক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে তাই মানুষের এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে: 'সেখানে স্বপ্ননায়িকা উন্মাদিনী, মিথ্যাবাদীরা চিত্তহারী, বুদ্ধিজীবীরা বাক্যবীর মাত্র এবং মল্ল, গীতজীবিনী আর বিদূষক মহাকাব্যের কুশীলব। সে-জগতে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ, সনাতনী-অগ্রণী এরকম কোন বিভেদই ধরা পড়ে না, যদি কোন পক্ষপাতই প্রকাশ পায় সে একমাত্র মৌল মনুষ্যত্বের প্রতি, আর সেটা সত্যকার পক্ষপাতই নয়। এই নিরপেক্ষতাই বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য এবং সেটাই তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্তরায়।'

আর একটি কারণও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাঙালী ভালোবাসে সেই মানুষকে—যিনি হৃদয়বান, আবেগপ্রবণ, ভাবাসক্ত ও আত্মহারা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ভাবালুতাহীন, নির্বিকার, মননশীল ও আত্মসচেতন। * এককথায়—'প্রমথ চৌধুরীর স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর স্বাভাবিক রুচি ও মানসপ্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।'

---

* কোনো এক সময়ে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন: 'আমি যা চোখের আড়াল করে রাখতে চাই—মনের অসহ্য আবেগ, অনন্ত কামনা, অসীম অতৃপ্তি—Shelleyর প্রতি পাতায় পাতায় তাই। এক একটি কথা হৃদয়ে ছুরির মত বেঁধে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মত গায়ে এসে পড়ে।'

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

'আমার বিশ্বাস যে, যে-ভাব হৃদয়ে ফোটে, তাকে মস্তিষ্কের বক-যন্ত্রে না চুঁইয়ে নিলে কলমের মুখ দিয়ে তা ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়ে না।'

—ইতিমধ্যে, বীরবলের হালখাতা।

প্রমথ চৌধুরীর নির্লিপ্ততার স্বরূপ ও কারণ আলোচনার যোগ্য। আগেই বলা হয়েছে, বিশেষ দার্শনিক বিশ্বাসই তাঁকে সর্বপ্রকার মোহ বা ভাবালুতা থেকে মুক্ত রেখেছে। মানুষের যা কিছু চরম কীর্তি, যা কিছু শ্রদ্ধার বস্তু—সবই তাঁর কাছে সাময়িক বলে মনে হয়েছে, কোনো কিছুই তিনি চিরন্তনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন নি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আজও বাঙালীর অতীত ঐতিহ্যের নামে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, আধুনিক আর্য-ভারতীয় ভাষাগুলির জননীস্থানীয়া সংস্কৃতকে দেবভাষার মর্যাদা দিতে গিয়ে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিগলিত হয়ে পড়ি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতে সৃষ্টির চলমানতার দৃষ্টিকোণে অতীতের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা মূল্যহীন; অতীত বস্তুর 'ফসিলের' চেয়ে বর্তমানের জীবন্ত বস্তুর মূল্য অধিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব-বীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং সেই নিরাসক্তির কারণ তাঁর দর্শন। অন্যদিকে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ বিশ্লেষণ করে, বিচার করে—মানুষের সৃষ্টিকে বুদ্ধির নিরিখে দেখে তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারে। প্রমথ চৌধুরীও তাই করেছেন, ফলে ভাবালুতা বা কল্পনাপ্রবণতা তাঁকে গ্রাস করতে পারে নি। আর করবেই বা কেন? এই সব ব্যাপার হৃদয়ের ধর্ম—প্রমথ চৌধুরী প্রায় হৃদয়ধর্মবর্জিত (হৃদয়ের প্রাথমিক সহানুভূতি কতটুকু আছে, তার আলোচনা 'গল্প-সাহিত্য' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য), তাই তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্লিপ্ততা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'তাঁর (প্রমথ চৌধুরীর) যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সেই তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন।' অর্থাৎ মননধর্ম ও ভাবালুতার একসঙ্গে

ঘর করা চলে না, প্রমথ চৌধুরীর মননধর্ম ছিলো, তাই তিনি ভাবালুতাহীন।

অপরিসীম নির্লিপ্ততা ছিলো বলেই তাঁর সাহিত্যের 'হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে নি।' সমস্ত নিন্দা-প্রশংসা, স্বীকৃতি-উপেক্ষা, বাদ-বিতণ্ডা, লাভ-ক্ষতির ঢেউ তাঁর নির্বিকারত্বের পাথরে আঘাত খেয়ে ফিরে গেছে—সেখানে ভাঙন ধরাতে পারে নি। * বিরোধীরা চমকে গিয়েছেন, আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় নি। তাই চমৎকৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাঙলা সাহিত্যের চালক পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন।

একটা কথা বোধহয় ইতিমধ্যে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদ বা মননধর্ম তাঁর দর্শনের ফলমাত্র (অবশ্য যুগধর্মও আছে তার পেছনে)। 'Creative Evolution'-এর চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা না গেলেও তার মধ্য দিয়ে জীবনী-শক্তি অচৈতন্য থেকে চৈতন্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। সভ্যতা, জীবন ও যুগের হৃদয়ধর্মবর্জিত ও বুদ্ধিবৃত্ত হয়ে ওঠার পেছনে আছে এই উদ্ভিদ্যমান চেতনা। সুতরাং বুদ্ধিবাদ বা মননধর্মের মধ্যে জীবনীশক্তির বিবর্তনের স্বরূপ যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্য

* সমালোচকদের সম্বন্ধে লেখা তাঁর কবিতাটি উপভোগ্য এবং এখানে উল্লেখযোগ্য :

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শত গুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

—সমালোচকের প্রতি, পদ-চারণ।

কিছুর মধ্যেই তেমন হয় না। বুদ্ধি জীবনীশক্তির রূপরেখা অনুধাবন করে নোতুন নোতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, বুদ্ধি হয়ে ওঠে জীবনীশক্তির সক্রিয়তার সহায়ক। অতএব বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর মননধর্মপ্রিয়তার অন্যতম কারণ 'Creative Evolution'-এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস। ফলে হৃদয়বৃত্তিকে তিনি প্রায় আমলের মধ্যেই আনেন নি। তিনি বলেছেন ঃ 'হৃদয়ের দোহাই দিলে এদেশে নির্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের এত্তো বড়ো জিনিষ। যার মাথা নেই, তার মাথা ব্যথার কথা শুনলে আমরা অবশ্য হাসি, কিন্তু যার বুক নেই, তার বুকের ব্যথার কথা শুনলে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই তো এদেশে কোন কাজের কথা বলা এত কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিষ ; এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচু দরের জিনিষ এবং উদর যে অনেকক্ষেত্রে নিজকে মস্তক বলে' পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু মস্তকের সঙ্গে হৃদয়ের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মানুষের মাথায় দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ, সে তত হৃদয়বান, এই হচ্ছে লোকমত।' তাই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে হৃদয়ধর্মের লীলা-খেলা নেই বললেই চলে ; বরং মননধর্মের প্রাধান্যই আছে এবং সেই মননধর্মের প্রাধান্যই তাঁর সাহিত্যকে ভাবগত উচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করেছে।*

---

*এখানে উল্লেখযোগ্য :

'তুমি আর কোন্ না জানো যে মনের ভাব সম্বন্ধে ঠিক যেটুকু তার চাইতে বেশি করে বলা, ভাবের অভাবটুকু বেশি কথা দিয়ে পূরণ করে দেবার চেষ্টা আমার কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়। আমিও কি সবরকম আতিশয্য ও কৃত্রিমতাকে ভয় করিনে ? বেশি করে বলে কি বানিয়ে বলে আমাকে কি কেউ ভুল বুঝিয়ে দিতে পারে ?'

—ইন্দিরা দেবীকে লিখিত প্রমথ চৌধুরীর পত্র।
বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

প্রমথ চৌধুরীর মননধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে Wit ও Humour-এর আলোচনা করা যেতে পারে। Wit হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির কসরত (intellectual exercise), হৃদয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই ; তার 'হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে' জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে না, তা অনেকটা বাক্‌-বৈদগ্ধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে Humour-এর মধ্যে বুদ্ধির লীলা-খেলা থাকলেও হৃদয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ; তার আলোকে জীবনের একটা সামগ্রিক অভিব্যক্তি ঘটে, শাব্দিক চমৎকারিত্বের মধ্যেই তার বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে না। একটা অসাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের অসঙ্গতির আবিষ্কার করতে পারলে Humour হয় বটে, কিন্তু সেই জীবন-সমালোচনার মধ্যে ক্ষমাসুন্দর সহৃদয় সহানুভূতি থাকা চাই। জীবনের বৈষম্য বক্রতা ভ্রান্তির আবিষ্কারের পেছনে যদি নির্মম অভিযোগ বা বিদ্রূপ থাকে তবে যথার্থ Humour হয় না ; কারণ Humour-এর মধ্যে পর-পীড়ন থাকলেও তার একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা অতিক্রম করলেই Humour যথার্থ দুঃখে পরিণত হয়। সুতরাং জীবনের অসঙ্গতির সহানুভূতিহীন উদ্‌ঘাটনকে Wit-এর মধ্যেই গণ্য করা উচিত।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বীরবলী সাহিত্য বিচার করি, তবে সেখানে Wit-এরই আধিপত্য চোখে পড়ে, Humour-এর নয়। আমরা দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী মননশীল লেখক। সজল হৃদয়বৃত্তি নয়, তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীকে, মানুষকে, মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে দেখেছেন, বিচার করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধির অসামান্য ক্রীড়া-কৌশল লক্ষ্য করা যায়—জীবনের অসঙ্গতির আবিষ্কারে, তার নোতুন মূল্যায়নে, যুগধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে, Epigram ও Paradox রচনায় তার প্রমাণ আছে।

কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সহানুভূতি বুদ্ধির সহগ নয় (বিশেষ করে 'বীরবল' ছদ্মনামে যেখানে লিখেছেন), নির্মমতাই তার অবলম্বন। তিনি নিজেই বলেছেন: 'লোকে বলে, আমার লেখার গায়ে কাঁটা আর মাথায় মধুহীন গন্ধহীন ফুল।' বীরবলী সাহিত্যে Wit জাতীয় হাস্যরস আছে বলেই তা কুঞ্চিত ভ্রূ ও বঙ্কিম অধরের পেছনে ফুটে ওঠে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কাহিনী নগণ্য, পাত্র-পাত্রীদের কথা-কাটাকাটি বা বাক্‌চাতুরী (verbal wit) উপভোগ্য, উপভোগ্য তাঁর নিজের প্রবচনধর্মী নানা শানানো মন্তব্য। গল্পের প্রচলিত ঢঙ্ তাঁর হাতে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, প্রবন্ধোচিত যুক্তি-তর্ক ও আলোচনার সমাবেশে তিনি গড়ে তুলেছেন তার এক অভিনব রূপ। শুধু তাই নয়, গল্পের প্রতি স্তরে ঘটনা ও চরিত্রের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এনে পাঠকের প্রত্যাশা ও সহানুভূতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী উপহাস করেছেন। তিনি অনেক অভিনব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাদের জীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন—কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তিনি নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতি বা দুর্বলতা দেখান নি, যেখানে দেখিয়েছেন সেখানেও তার প্রয়োগ সংযত ও পরিণত, অনেকটা প্রচ্ছন্ন। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মতামত, কথোপকথন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চলা-ফেরার অসামঞ্জস্যকে বুদ্ধির তুলিতে বিদ্রূপের কালিতে চিত্রিত করে পাঠকের বুদ্ধিকে তিনি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন, তাদের হৃদয়কে আলোড়িত করার বিশেষ ইচ্ছাই তাঁর ছিলো বলে মনে হয় না। ফলে তাঁর গল্পের মধ্যে যে জীবন-সমালোচনা আছে, তা প্রায় তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাসবর্জিত; যে হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে তার মূলে আছে তাঁর 'বুদ্ধির বপ্রক্রীড়া'। প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সাহিত্যের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য অসামান্য Wit-এরই পরিচায়ক, Humour-এর নয়।

অন্যদিকে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য আলোচনা করলেও দেখি—Wit-এর প্রাচুর্য, Humour-এর অভাব। তিনি 'বীরবলের হালখাতা', 'বীরবলের টিপ্পনী' ইত্যাদি গ্রন্থে বাঙালীর নিষ্ক্রিয়তা, করুণ-রসপ্রিয়তা—এক কথায় তাদের জীবন নিয়ে সমালোচনা করেছেন, করেছেন বিদ্রূপ। কিন্তু সেই বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা তাঁর হৃদয়ের সহানুভূতি পায় নি—তাই বাঙালীকে নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর উপহাস যেমনি কঠোর তেমনি নির্মম (caustic) হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর Wit-এর বাঁকা তলোয়ার যখন বাঙালীর জীবনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার অসঙ্গতির হাস্যোদ্দীপক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছে, তখনও তাঁর হৃদয় সংবেদনশীলতা নিয়ে এগিয়ে আসে নি। জাতির প্রতি যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ তাঁর ছিলো—তাকে প্রচ্ছন্ন ও অলক্ষিত রাখতেই তিনি পছন্দ করতেন। কার্লাইল অভিশাপের কশাঘাতে, সুইফ্‌ট্‌ মর্মভেদী বাক্যবাণে প্রচলিত সংস্কারের শূন্যগর্ভতাকে আঘাত করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর অস্ত্র যুক্তি-তর্কমূলক ব্যঙ্গ। এইদিক থেকে শ'য়ের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। বীরবলী প্রবন্ধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাক্‌চাতুরী। বস্তুতঃ, ভাষার মারপ্যাঁচের মধ্যে বুদ্ধির একটা তলোয়ার-খেলা আছে—যার চমক পাঠকের মনকে হক্‌চকিয়ে দিয়ে যায়। পাঠকের অপ্রতিভ মনের সেই হক্‌চকানির মধ্যে দিয়ে একরকমের রসিকতা—Wit—দেখা দেয়। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্য পড়বার সময় এই Wit-এর সঙ্গে আমাদের পদে পদে পরিচয় হয়।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্য হৃদয়সম্ভূত নয়, বুদ্ধিসম্ভূত। তাঁর মনের সচেতনতা ও মননের উজ্জ্বলতা কাব্যের মধ্যেও পরিস্ফুট। তা 'যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহুরির নিপুণ

হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরী—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করছে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয় নি,—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে।' এই ধরণের রসিকতা যে Wit-এরই এক্তিয়ারে পড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ('বার্ণাড শ' জাতীয় কবিতা এখানে দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে Wit-এর আধিপত্য অবশ্য স্বীকার্য।

Wit একপ্রকারের হাস্যরস, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে Wit আছে, তাই তা কম-বেশি হাস্যরসাত্মক। কিন্তু অন্য কোনো রস কি সেখানে নেই? আছে। মনে রাখতে হবে, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বুদ্ধি, তাকে অভিনব করেছে মজলিশী মেজাজ। তাঁর সাহিত্যের আসর একটা মজলিশ মাত্র এবং তাতে মজলিশী রসই উৎসারিত। 'ফরমায়েসি-গল্প,' 'নীল-লোহিত' জাতীয় গল্প পড়লেই একটা মজলিশী আবহাওয়া অনুভব করা যায় এবং এইসব গল্পে শ্রোতারা যে বক্তাকে প্রভাবিত করেছে, তাতেও কোনো সন্দেহ থাকে না। 'চার-ইয়ারী-কথায়' শ্রোতারা বক্তাদের প্রভাবিত না করলেও বিভিন্ন বক্তার স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার বিবৃতির মধ্যে একটা বাহ্যিক মজলিশী ঢঙ্ আছে। প্রমথ চৌধুরার প্রবন্ধের অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলিও মজলিশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের মজলিশী রস অমার্জিত নয়—সুরুচি ও আভিজাত্যের স্পর্শ আছে তার মধ্যে। হৃদয়প্রধান সাহিত্যের মধ্যে যে রস উৎসারিত হয়ে ওঠে—এ-জিনিস তার চেয়ে আলাদা। বীরবলী সাহিত্য হৃদয়ের রসে পাঠকের মনকে আপ্লুত করে দেয় না; বরং বুদ্ধির চোস্ত প্যাঁচ খেলে ও বাক্‌চাতুরীর চাবুক চালিয়ে পাঠকের মনকে উত্তেজিত করে তোলে, তার আগ্রহকে জাগ্রত করে রাখে।

পাঠকের মনের এই উদ্দীপিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে জমে ওঠে এক প্রকারের রস—তার নাম মজলিশী রস। একে চমক-রসও বলা যেতে পারে। কারণ, বুদ্ধির কশাঘাতে হৃদয়কে দলন করে এর জন্ম হয়।

এই মজলিশী রস উপভোগ করতে হলে চাই মজলিশী খোশমেজাজ ও বুদ্ধিমত্তা। আলঙ্কারিকদের নবরসের মধ্যে মজলিশী রসের স্থান নেই বটে, কিন্তু এই ধরণের একটা মিশ্র রসের অস্তিত্ব প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে উপলব্ধি করা যায়।

নগর দৈহিক ভোগবিলাসের পীঠস্থান, নাগরিকতা ব্যভিচারের সহায়ক। নাগরিক মানুষের মধ্যে কম-বেশি আদিরসের আদর দেখা যায়। এদেশে নাগরিক সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের', মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' ও 'রসতরঙ্গিনীর' এবং ঈশ্বর গুপ্তের আদিরসাত্মক কবিতার খুব জনপ্রিয়তা ছিলো। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই এই ধরণের প্রমাণ মেলে। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন নাগরিকতার ভাষ্যকার, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সাহিত্যে আদিরসের ছড়াছড়ি তো নেই-ই, বরং অভাবই আছে। সাহিত্যিক শুচিবাই তাঁর ছিলো না, সামাজিক কারণে আদিরসকে উপেক্ষা করার মত রক্ষণশীলও তিনি ছিলেন না।* মজার বিষয়, রতিমন্ত্রে যিনি পাগলা দেশকে

* এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) 'সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজমকে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি। তার পরিচয় আমার জয়দেব নামক প্রবন্ধেও পাবেন।'
—আত্ম-কথা।

(খ) 'সমাজভয়ে বাক্‌রোধ হওয়াটা যৌবনের রোগ নয়।'
—'ভারতী', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩১।

(গ) 'আমার মতে, যা সত্য, তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়।'
—যৌবনে দাও রাজটীকা।

দীক্ষিত করেছিলেন, যিনি আদিরসের জোয়ার এনেছিলেন অজয় নদীতে—সেই কবি জয়দেবের ওপর প্রবন্ধ লিখে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন, পরে তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখতেও ইতস্ততঃ করেন নি। সুতরাং সামাজিক ও সাহিত্যিক কারণে যে তিনি আদিরসের বিরোধী ছিলেন তা নয়। 'জয়দেব' প্রবন্ধে কিংবা কবিতাতে জয়দেবকে তিনি উঁচুদরের কবি বলে স্বীকার করতে রাজী হন নি—কারণ জয়দেবের সাহিত্যে আছে আদিরসের আতিশয্য। তার প্রথম কারণ রুচিগত। প্রমথ চৌধুরী মার্জিত রুচিকে একটা বড়ো জিনিস মনে করতেন, তিনি নিজেও ছিলেন 'বররুচি', তাই জয়দেবের 'উন্মদ মদনরাগ' বরদাস্ত করাকে, আদিরসের নেশায় বুঁদ হওয়াকে তিনি রুচিগত অধঃপতন বলে মনে করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুরুচির পরিপন্থী বলেই আদিরস নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে প্রস্তুত ছিলেন না প্রমথ চৌধুরী। আর দ্বিতীয় কারণটি তিনি নিজে ব্যাখ্যা করেছেন: 'যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত—এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা কবিদের মতে, প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীর মন যোগানো। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্য সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে—যদি বিলাসকলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো। এককথায়, যে-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরাও সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।...যৌবনের স্থূল শরীরকে অত আস্কারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে এবং

সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে উঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হ'লে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়।' দেহ ও মনের জ্ঞাতিশত্রুতা জীবনপ্রবাহের পক্ষে, প্রাণের নব নব সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। সুতরাং 'Creative Evolution'-এর প্রতি বিশ্বাসই যে প্রমথ চৌধুরীকে যৌবন ও আদিরসের বাড়াবাড়ির প্রতি বীতশ্রদ্ধ* করার একটা প্রধান কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইখানে আরেকটা কথাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা পূর্বে বলেছি, প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী; অথচ আদিরসের আলোচনায় এখানে দেখা গেল, তিনি যৌবনের দেহসর্বস্বতার বা ভোগোন্মত্ততার বিরোধী। সুতরাং প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে ভোগকে যৌবনের একমাত্র ধর্ম বলে মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম।'

প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের আলোচনায় আমরা দেখেছি, তিনি সঙ্গীতের মধ্যে 'পূরবীকে' একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর সাহিত্য আলোচনা করলেও দেখা যায়, তিনি ছিলেন করুণ-রসের বিরোধী। বস্তুতঃ, হাস্যরসের যিনি ভক্ত, করুণ-রসের বিরোধী হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাছাড়া, তিনি দেখেছিলেন—

* উল্লেখযোগ্য :

কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবনে-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে ॥

—ব্যর্থ জীবন, সনেট পঞ্চাশৎ।

করুণ-রসপ্রিয়তা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই লিখেছেন ঃ "করুণ রসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে ; আমাদের সুখের জন্য না হোক্, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।' প্রমথ চৌধুরীর দর্শন pessimistic ছিলো না, তাই তাঁর মুখে একথা শোভন ও স্বাভাবিক।

এতক্ষণ যে-সব আলোচনা করা গেলো, তা থেকে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, সাহিত্যিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী মৌলিক। বস্তুতঃ, মানসিক দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য তাঁকে অনন্যসাধারণভাবে প্রত্যেক বিষয়ের যাথার্থ্য বিচার করতে প্রেরণা দিয়েছিলো। তাই চিরাচরিত আদর্শের প্রতি, 'দরকারী ভাব ও সরকারী ভাষার' প্রতি, দেশের ও দশের শ্রদ্ধেয় বস্তুর প্রতি বিদ্রূপ তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। তাঁর মেজাজের সঙ্গে পরিচিত হলে তাঁর উক্তিগুলিকে বিদূষকের ন্যায় বিশেষ প্রশ্রয়প্রাপ্ত (privileged) রসিকের উক্তি বলে মনে হয়। সোজাসুজি আক্রমণ না করে এই যে বাঁকাপথে আক্রমণের চেষ্টা ('বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ করার যে-কারণ একটু পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা-ও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য), তাতে ঠিক নির্ভীকতার পরিচয় না পাওয়া গেলেও নিঃসন্দেহে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র (sensual) না হলেও ইন্দ্রিয়বাদী (sensuous) হওয়ার সাধনা করেছেন। মনোজীবনের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, তাঁর চোখ নামক ইন্দ্রিয়টি ছিলো অত্যন্ত প্রখর ; তাই রূপ কোনোদিন তাঁর চোখ এড়াতো না। যিনি বুদ্ধিবাদী, ভাবালুতার বিরোধী, মনোজগতের অধিবাসী—তাঁর এই ইন্দ্রিয়বাদ বা রূপজ্ঞানের কথা শুনে পাঠকের সংশয় জাগতে পারে। তাই এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, প্রমথ চৌধুরী জ্ঞানমার্গের পথিক। 'Knowledge is power'—মতবাদে তাঁর ছিলো অটুট বিশ্বাস। এই জ্ঞানসাধনার অঙ্গ হিসেবে তিনি রূপজ্ঞানকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলোঃ 'ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ছাড়া মানসিক (বা আত্মিক) জ্ঞানলাভ করা যায় না, বাহ্যদৃষ্টি ছাড়া অন্তর্দৃষ্টি আসে না। এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে শুধু জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা নয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক। প্রমথ চৌধুরী বলেছেনঃ 'যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গত বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম aesthetic quality, অর্থাৎ "রূপ" এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম aesthetic faculty, অর্থাৎ "রূপজ্ঞান"।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জড়জগতের পদার্থের পূর্ণ ব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটা aesthetic quality আছে, যার সংস্পর্শে এসে আমাদের মনের aesthetic faculty সুখী হয়। এই সুখই সাহিত্যের উপাদান; তাই সাহিত্যিকের পক্ষে ইন্দ্রিয়বাদের পূজারী হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান থাকলেই বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত বিজ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান আসে পরে। বলা দরকার—বৈজ্ঞানিক সত্য বা দার্শনিক সত্য বা আর্টের সত্য—ইত্যাদি সব সত্যের জ্ঞান সম্বন্ধেই একথা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক, তাই সাহিত্যিকের রূপজ্ঞানের আবশ্যকতার ওপর তিনি বহু প্রবন্ধেই জোর দিয়েছেন। স্বীকার

করতেই হবে, সাহিত্যিকের মনে আলো না থাকলে তাঁর লেখায়ও আলো থাকে না। সাহিত্যিকের মনে যদি আলো আনতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে দিতেই হবে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'দেহের নবদ্বার বন্ধ করে দিলে মনের ঘর আলোকিত কিংবা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে—বলা কঠিন।' ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে কিভাবে মনকে আলোকিত করা যায়, সেকথা তিনি 'রূপের কথা' নামক প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। সাদা আলো যেমন ইথারে প্রতিস্থত (refracted) হয়ে বহুবিচিত্র রূপ লাভ করে, তেমনি আমাদের মূল শরীরের ভেতরে যে সূক্ষ্ম শরীর বা ইথার আছে তাতে জড়জগতের রূপ প্রতিস্থত হয়ে বহুবিচিত্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম শরীর বা ইথারের স্বরূপ প্রমথ চৌধুরী ব্যাখ্যা না করলেও তা যে মনেরই নামান্তর মাত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রমথ চৌধুরী মনের আলোর খাতিরে রূপজ্ঞান পেতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, জ্ঞানমার্গের পথিক জ্ঞানের আলোতেই তো মনকে উদ্ভাসিত করতে পারতেন, বিশেষ করে রূপজ্ঞানের ওপর তিনি জোর দিলেন কেন? সাধারণ জ্ঞান (general) ও রূপজ্ঞানের (particular) মধ্যে একটা পার্থক্য তাঁর কাছে ধরা পড়েছিলো, তাই রূপজ্ঞানের কথা তিনি এত করে বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল; অপর পক্ষে, রূপের আলো রঙীন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল।' অন্যত্র সাহিত্য-সাধনাকে তিনি ফুলের চাষের সঙ্গে তুলনা করেছেন; এইবার বোধহয় বলা যায়, আসলে তা হচ্ছে—প্রমথ চৌধুরীর মতে—আলোর ফুলের চাষ।

রূপজ্ঞান সেই আলোর ফুলের চাষের সহায়ক বলেই বীরবল তার পূজারী হয়ে পড়েছিলেন।

এই আলোচনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, প্রমথ চৌধুরী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা রূপজ্ঞানের স্থূল ফলাফলের দিকটা এড়িয়ে গেছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান মনকে আলোর সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু দেহকে কি ভোগের সন্ধান দেয় না? রূপজ্ঞানের অতিরিক্ত চর্চা করলে কি হয় তার প্রমাণ তো সংস্কৃত সাহিত্যেই আছে। প্রমথ চৌধুরী নিজেই তো স্বীকার করেছেন, সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে-জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ ('যৌবনে দাও রাজটীকা')। সংস্কৃত কবিরা রূপজ্ঞানের অতিরিক্ত সাধনা করতে গিয়েই ভোগবিলাসের চিত্র এঁকেছেন। প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতাও রূপ সম্বন্ধে খুব বেশি সচেতন ছিলো এবং রূপজ্ঞানের আতিশয্য থেকেই তার শিল্পে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে দেহের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে, ভোগের মূর্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। গ্রীক্ সভ্যতার এই স্থূল দিক দেখেই তো জি. কে. চেষ্টারটন্ একটি কঠিন মন্তব্য করেছিলেন: 'Venus was nothing but venereal vice.।' বর্তমান য়ুরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও রূপচর্চার ভোগগত পরিণতিটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। সেখানে আজ নগ্নমূর্তির ছড়াছড়ি, 'লেডি চ্যাটার্লিজ্ লাভারের' মতো বইয়ের প্রাচুর্য। শতকরা একজন যদি এতে সৌন্দর্য খোঁজেন, অবশিষ্ট নিরনব্বই জন তার অশ্লীলতা দেখেই খুশি থাকেন। য়ুরোপে আজ আর্ট ভোগবিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ('তেল, নুন, লক্ড়ি' দ্রষ্টব্য)। এতেই প্রমাণ হয়, রূপচর্চা শুধু মনকেই আলোকিত করে না, দেহের ভোগের প্রবৃত্তিও বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রমথ চৌধুরী যখন বলেন: 'রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে

পারে, কিন্তু লোভের নেই'—তখন তাঁর মতকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

সে যাই হোক, থিয়োরী হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ইন্দ্রিয়বাদকে যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইবার তাঁর নিজের সাহিত্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতের কতটুকু অনুসরণ আছে বিচার করে দেখা যাক। প্রমথ চৌধরীর লেখা পড়লে মনে হয়, ইন্দ্রিয়বাদকে তিনি সমালোচনার মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁকে অপরের শিল্পের রসাস্বাদনে একটা প্রধান উপায় ও উপাদান বলে স্বীকার করতে ইতস্ততঃ করেন নি ('বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগ', 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', 'জয়দেব', 'তেল, নুন, লক্‌ড়ি' ইত্যাদি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তবে কাব্য ছাড়া (বিশেষ করে 'সনেট-পঞ্চাশৎ') তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে রূপবিলাস যথার্থ স্ফূর্তি পায় নি। কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে নরনারীর প্রচুর সমাবেশ হয়েছে। হীরার মতো চোখবিশিষ্টা উন্মাদিনী, সাপের মতো ফণা-ধরা তস্করিণী, শিকারী-চিতার মতো লিক্‌লিকে ছলনাময়ী ('চার-ইয়ারী-কথা'), রুদ্রপুরের রত্নময়ী ('আহুতি'), বড়বাবুর পাটেশ্বরী ('বড়বাবুর বড়দিন'), শ্বেতপাথরে খোদা শ্রীমতী ('একটি সাদা গল্প'), চোখের মতো লম্বা দেহবিশিষ্টা ডানাকাটা পরী ('ফরমায়েসি-গল্প') Lyden jar-এর মতো কিশোরী ('ছোটগল্প'), অপ্সরোপম সুরাট-সুন্দরী ('নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা') ইত্যাদি নারী-চরিত্রগুলি নিছক বর্ণনামাত্র, যথার্থ চরিত্র-সৃষ্টি নয়। অন্যদিকে নীল-লোহিত, সিতিকণ্ঠ ঠাকুর ('সহযাত্রী') night-এর মতো Mr. Day ('ছোটগল্প'), ছোট্ট-মাথা-প্রকাণ্ড-শরীরওয়ালা ভৈরবনারায়ণ ('দিদিমার গল্প'),

bull-dog-এর মতো বড়ো সাহেব ('ভূতের গল্প') ইত্যাদি পুরুষ-চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও এই ধরণের কথাই বলা যায়। যে ব্যঙ্গপ্রধান উদ্ভট মনোবৃত্তি (প্রত্যেকটি চরিত্রের সংজ্ঞা বা বিশেষণই বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের পরিচায়ক) নিয়ে তিনি চরিত্রগুলি, বিশেষ করে রূপসীদের ছবি এঁকেছেন, তাতে মনে হয়, রূপমোহের আবেশ তাঁর নিজের চোখেই কোনোদিন গভীরভাবে ঘনায় নি, পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা দূরের কথা। আসল কথা, প্রমথ চৌধুরীর বস্তুবাদ অতীন্দ্রিয় আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; তাঁর রূপদৃষ্টির প্রেরণা নয়। তাঁর গল্পে মননের ঔজ্জ্বল্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে দেখি, রূপ-শ্রী-সৌন্দর্যের জয়গানের সুযোগ যখনই এসেছে—তখনই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। বাঙালীর মধ্যে জীবনের রঙ্ খুঁজেছেন ('হালখাতা'), অমাবস্যা রাত্রিতে বিদ্যুৎ দেখতে চেয়েছেন ('খেয়ালখাতা'), চকচকে ঝকঝকে বইয়ের মলাট পছন্দ করেছেন, ('মলাট সমালোচনা'), বই দিয়ে ঘর সাজাতে পরামর্শ দিয়েছেন, ('বইয়ের ব্যবসা'), উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীল-লোহিত, পাতার সবুজ রঙের প্রশংসা করেছেন ('সবুজ-পত্র'), ঋতুর মধ্যে অপরূপসজ্জিত বসন্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ('যৌবনে দাও রাজটীকা'), বঙ্গের জন-সাধারণের সকাল-সন্ধ্যা রূপের ঢেউ খেলিয়ে বেড়ানো দেখে খুশি হয়েছেন ('রূপের কথা')। কিন্তু এতে রূপদৃষ্টি ও রূপমুগ্ধতার চেয়ে রূপের প্রতিসরণই মুখ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সৌন্দর্য তাঁর চোখে এসে লাগলেও সেখানে রঙ্ ধরিয়েছে কিনা সন্দেহ জাগে।

তবে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার (বিশেষ করে 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর) রূপ-রসবিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। প্রতিটি ভাব যেন তাঁর অনুভূতির কাছে রূপাবয়ব নিয়েই দেখা দিয়েছে। স্বর্গগত প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন :

'তাঁহার (প্রমথ চৌধুরীর) কবিতা sensuous অর্থাৎ শরীরী, রূপ-রসবিশিষ্ট, ধরিবার ও ছুঁইবার, কেবল অপরিণত ভাবের কুজ্ঝটিকা নয়।' 'চোরকবি' নামক কবিতাটির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন: 'কোনও চিত্রকরের তুলিকায় এমন সুন্দর আলেখ্য কি সম্ভবপর? তুমি সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পার? কিন্তু কোন্ বর্ণের অজানিত মহিমার দ্বারা—কোন্ দেহভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকৌশলময় রেখাপাতে প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যাসুন্দরীকে আঁকিবে?' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাব্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর ইন্দ্রিয়বাদ অনেকটা কার্যকরী হয়েছে (যদিও বুদ্ধিবাদ অনুপস্থিত নয়)।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তাঁকে রূপমুগ্ধ স্রষ্টা বলে মনে হয় না। এর কারণ বোধহয় তাঁর অতন্দ্র বুদ্ধিধর্ম। প্রমথ চৌধুরীর প্রখর মননবৃত্তি সজাগ প্রহরীর মতো তাঁর গভীর রূপদৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো এবং প্রহরীটি এত বেশি সজাগ ছিলো যে, রূপাবেশ কবির চোখের বাইরের দেউড়ি পার হয়ে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে নি। প্রমথ চৌধুরী প্রখর ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে রূপমুগ্ধ স্রষ্টা হতে পারেন নি, রূপের প্রতি অসামান্য আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও রূপ যে তাঁর চোখে ও মনে রঙ্ ধরায় নি—তার কারণ হিসেবে বুদ্ধিবাদকে নির্দেশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে রূপ নিঃসন্দেহে তাঁর জীবন-দর্শনের দর্শনীয় প্রান্তিক কারুকার্য (embroidery) হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী রূপের মধ্যে কেবল প্রাণ খুঁজেছেন, এ যেন আরক্তিম আলোকধারার মধ্যে কেবল উত্তাপ খোঁজা। রূপানুভূতির মধ্যে যদি সুস্থ সমাজগঠনের শক্তি থেকেও থাকে তবে তাকে রূপের একটা উপজাতের (by-product) পরোক্ষ বিকিরণ

ছাড়া অন্য কিছু মনে করা উচিত নয়। অথচ প্রমথ চৌধুরীর ভেতরে রূপানুভূতির চেয়ে রূপের এই উপজাতের পরোক্ষ বিকিরণের প্রতিই যেন আকর্ষণ বেশি ছিলো। তিনি নিজেই বলেছেন : 'এজগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ ; সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশি শক্তি চাই।······কদর্যতা দুর্বলতার বাহ্য লক্ষণ, সৌন্দর্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে, মন্দিরে, বেশে, ভূষায়, মানুষের আশায়, ভাষায় নব-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।' রূপের মধ্যে শক্তিকে সন্ধান করার এই প্রেরণা তিনি খুব সম্ভবতঃ তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস থেকেই পেয়েছিলেন। সৃষ্টিমূলক বিবর্তনবাদে (Creative Evolution) শক্তির মূল্য স্বীকৃত। প্রমথ চৌধুরী বার্গসঁয়ের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রূপের মধ্যে শক্তি খুঁজেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাতে রূপানুভূতির রাজপথ ছেড়ে তার 'by-product'-এর শাখাপথে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছিলো। ইন্দ্রিয়বাদের (sensuousness) দিক থেকে তাতে ক্ষতি না হয়ে পারে নি।

তবে স্বীকার করতেই হবে, রূপ যেমন তাঁর মনের ঊর্ধ্বায়িত (sublimated) সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার কাজে লাগে নি, তেমনি লাগে নি স্থূল শরীরের কাজে। তিনি কোথায়ও রূপকে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে দৈহিক প্রবৃত্তির কাছে আকর্ষণীয় করে তোলেন নি। তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে কিংবা কবিতায় ইন্দ্রিয়বাদের আরাধনার মধ্য দিয়ে ভোগলালসাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপপ্রয়াস চোখে পড়ে না। সুতরাং রূপের সঙ্গে লোভ ও ভোগের সম্পর্ক থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর

রূপচর্চার মধ্যে লোভের বা ভোগের প্রবেশ ঘটে নি। তাঁর সাহিত্যে আর যে রসই থাক শৃঙ্গার রস নেই।

প্রমথ চৌধুরী শুধু 'বীরবল' ছদ্মনামেই নয়, স্বনামেও সাহিত্য রচনা করেছেন। তৎসত্ত্বেও 'বীরবল' নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সাহিত্য আজও বীরবলী সাহিত্য, তাঁর ষ্টাইল আজও বীরবলী ষ্টাইল বলে পরিচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রমথ চৌধুরীর আসল নামটি ছদ্মনামের পেছনে অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। তার কারণ কি ?

✓ সম্রাট আকবরের সেনাপতি ও সভাকবি ছিলেন রাজা বীরবল। ইতিহাসে তিনি যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন নি, খ্যাতিলাভ করেছেন বিদূষক হিসেবে। তিনি ছিলেন কবি, গায়ক, গল্পরচয়িতা ও সুরসিক। আকবরের প্রশ্ন এবং 'কবীশ্বর' ও 'সফা-চাতর' বীরবলের চোখাচোখা জবাব নিয়ে আজও অনেক 'কেচ্ছা' প্রচলিত আছে। সেই সব 'কেচ্ছার' মধ্যে বীরবলের Wit, বাক্‌পটুতা, ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও রসিকতার পরিচয় পাই। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই সবেরই ভক্ত। তাই ছেলেবেলাতেই বীরবলের নাম তাঁর মনে বসে গিয়েছিলো। অন্যদিকে সাহিত্যিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'বাঙালী জাতির বিদূষক', রসিকতাচ্ছলে অনেক সত্য কথা বলতে তিনি চেষ্টা করেছেন। সুতরাং 'বীরবল' ছদ্মনাম যে কেন তিনি গ্রহণ করেছেন তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'হাসিমুখে অনেক কথা বলা যায়, যা গম্ভীরভাবে বল্‌লে লোকের সহ্য হয় না। আর তাছাড়া আমার এই ধারণাও জন্মে যে, অনেক ক্ষেত্রে তর্ক করা বৃথা, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মজুরি পোষায় না। এই কারণে আমি··· সাহিত্যের আসরে নামলুম, বীরবল সেজে।' আর ঐতিহাসিক বীরবলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যের

সামঞ্জস্য আছে বলেই তাঁর 'বীরবল' ছদ্মনামটির জনপ্রিয়তা এত বেশি। বাঙলা সাহিত্যে বীরবলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাইঃ 'সাহিত্য রাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরেজেরা বলেন, এক কোকিলে বসন্ত হয় না—অর্থাৎ আর পাঁচ রঙের আর পাঁচটি পাখিও চাই। বাংলা সাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্ত ঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাকবে, কাঠ-ঠোক্‌রাও থাকবে, লক্ষ্মা-পেঁচাও থাকবে, হুতোম-পেঁচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে, তখন নানা তুচ্ছ পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক 'বউ-কথা-কও' নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক 'চোখ-গেল' নিয়েও দর্শন হয় না।' ৮

প্রমথ চৌধুরীকে এ-যুগের ভারতচন্দ্রও বলা হয়। কেন? তাঁরা উভয়ই উচ্চব্রাহ্মণবংশে ও ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে প্রমথ চৌধুরী যেমন আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে সারাজীবন কাটিয়েছেন, ভারতচন্দ্রের ভাগ্যে তা ঘটে নি। সাংসারিক জীবনে প্রমথ চৌধুরী ও ভারতচন্দ্রের মিল বা গরমিলের কথাটা আসলে তুচ্ছ। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁদের মধ্যে ছিলো সাহিত্যিক আত্মীয়তা; তাঁরা উভয়েই ছিলেন সচেতন মনের অধিকারী—'প্রমোদের প্রভু'। তাঁরা দু'জনেই ব্যবহারিক জীবনকে শিল্পী-জীবনের ওপর প্রভুত্ব করতে দেন নি। যেমন ভারতচন্দ্র তেমনি প্রমথ চৌধুরী সুন্দর ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছেন। ভারতচন্দ্র ভাষাকে 'রসাল' করতে গিয়ে তাকে 'যাবনী মিশাল' (আরবী-ফরাসী-শব্দ-মিশ্রিত) করতে ইতস্ততঃ করেন নি। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাইঃ

মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥

পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সেই সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥
'পাতশার নিকট বাঙলার বৃত্তান্তকথন'

—অন্নদামঙ্গল।

শুধ তাই নয়, তিনি সমসাময়িক মৌখিক বাঙলাকে (নদীয়ার) আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীও তাঁর ভাষাকে 'চৌকশ ও চৌরস' করতে গিয়ে 'খাঁটি বাঙলার' দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং দরকার মতো জুতসই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি। বীরবল নিজেই বলেছেন: 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি।'

ভারতচন্দ্রের ভাষায় নদীয়ার বাক্‌চাতুর্য ও রসিকতা আছে। 'সুন্দরের' প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

এইরূপ পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাক্‌ছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥

আসলে এই 'বাক্‌ছল' শুধু সুন্দরের নয়, তার স্রষ্টা স্বয়ং ভারতচন্দ্রেরও বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে শব্দচাতুর্যের দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলো না। 'কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব। কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব।' কিংবা—'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভালো নহে তাহা, ভারত যেমত চাহে, সেই খেলা খেলহে।' এই ধরণের বাগ্‌বিন্যাসের চটক, চাতুর্য, ঔজ্জ্বল্য ও পারিপাট্য নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। আসল কথা, ভারতচন্দ্রের কাব্যের

প্রসাদগুণ তুলনাহীন ; তাঁর 'হাতে বঙ্গসরস্বতী একেবারে তন্বী-শ্যামা— শিখরিদ্দশনা রূপ লাভ করেছে।'

প্রমথ চৌধুরীর ভাষার বনেদ কৃষ্ণনাগরিক (নদীয়া) মৌখিক ভাষা ও কৃষ্ণনগরের প্রভাবে তাঁর ভাষার (বা রচনার) মধ্যে রসিকতার অভাব নেই। তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে ত সে দুটি গুণ এই নদীয়া জেলার প্রসাদে লাভ করেছি।' ভারতচন্দ্রের মতো প্রমথ চৌধুরীও অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন, তাঁর রচনায়ও মণ্ডনকলার অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছন্দঃশিল্পের গরিমা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বস্তুতঃ, ছন্দের বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যের মধ্যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। নোতুন নোতুন ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর উৎসাহের অভাব ছিলো না।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্য গদ্যের তুলনায় হীনপ্রভ ; তথাপি 'সনেট-পঞ্চাশতের' ছন্দোগত গাঢ়তা ও 'পদ-চারণের' ছন্দোবৈচিত্র্য আকর্ষণীয়। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তাঁর গদ্যের ছন্দোমাধুর্য। স্বীকার করতেই হবে, তাঁর গদ্যের মণ্ডনকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তার ছন্দোগুণ।

রসের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে আদিরস প্রধান হলেও হাস্যরস আছে ; প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে হাস্যরস আছে বটে, তবে আদিরস নেই।

ভারতচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন ও চিত্ররচনাকৌশলের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রাঙ্কন ও চিত্ররচনাকৌশলের সমধর্মিতা আছে। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যে তেমনি বীরবলের গল্পে চরিত্রগুলি অনেকটা বাক্‌সর্বস্ব জীব ; তাদের প্রাণের উত্তাপের চেয়ে বুদ্ধির ও কথার

উত্তাপ বেশি। মনের অস্থির ভাবকে ভারতচন্দ্র এমন ক্রমে ও কৌশলে ফুটিয়ে তুলতেন, যাতে তা চিত্ররূপ ধারণ করে।

প্রমথ চৌধুরীর রচনাতেও বর্ণনার ওস্তাদিতে ভাবের চিত্র গড়ে উঠেছে। 'নীল-লোহিত' সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 'সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল ঐ চিত্র-শিল্পীর হাতেরই তুলির আঁচড়।' একথা স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমথ চৌধুরীকে ইংরেজী সাহিত্যের চেষ্টারটন্ (১৮৭৪-১৯৩৬) ও ফরাসী সাহিত্যের মন্‌টেইনের (১৫৩৩-১৫৯২) সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

চেষ্টারটন্ ইংরেজী সাহিত্যের একজন দিকপাল না হলেও কতকগুলি কারণে তাঁর পাঠকের সংখ্যা অনেক। তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ক্ষুরধার বুদ্ধির চমকপ্রদ লীলা। Wit-এর অতি-প্রাচুর্য চেষ্টারটনের সাহিত্যের মধ্যে একটা চটক এনে দিয়েছে। সাধারণ লেখক গাম্ভীর্যের সঙ্গে যে-কথা বলতে ইচ্ছুক, তিনি সে-কথাই Wit-এর খেলা দেখিয়ে বলেছেন। তিনি জানতেন, এযুগের লোক নিগূঢ় চিন্তাকে ভয় করে, তাই গভীর সাহিত্যের চেয়ে সংবাদ-সাহিত্যের (journalistic literature) প্রতি তাদের টান বেশি। চেষ্টারটন্ তাঁর সাহিত্যকে 'জার্নালিজিম্'-এর কাছাকাছি এনেও Wit-এর সাহায্যে তার মধ্যে চিন্তার খোরাক ছড়িয়ে দিয়েছেন। অন্ততঃ Wit-এর রস আহরণ করবার জন্যেও লোকে একটু চিন্তা করুক, এই ছিলো তাঁর ইচ্ছা। অর্থাৎ তাঁর Wit-এর উদ্দেশ্য যেমন লোক-হাসানো, তেমনি লোক-ভাবানো। তাছাড়া

যে-সব উপেক্ষিত সত্যের দিকে সাধারণের আকর্ষণ নেই, সেদিকে আকর্ষণ জন্মাতে গিয়ে Wit-কে অবলম্বন না করে তিনি পারেন নি। কারণ Wit-এর আর কোনো শক্তি না থাক বিমুখ পাঠককে প্রণোদিত করার শক্তি আছে।

প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন বুদ্ধির পূজারী ; Wit-এর ভক্ত। তিনি বাঙলা সাহিত্যে বীরবল সেজে Wit-এর তলোয়ার-খেলা শুরু করেছিলেন। তাতে একদিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ইস্পাতী উজ্জ্বলতা এসেছে, অন্যদিকে উপেক্ষিত সত্যের মূর্তি বিমুখ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেই বলেছেন : 'হাসিমুখে (Wit) অনেক কথা বলা যায় যা গম্ভীরভাবে বললে লোকের সহ্য হয় না।' এতেই বোঝা যায়, তিনি Wit-এর জন্যেই Wit সৃষ্টি করেন নি, সত্য-প্রকাশের গভীরতর উদ্দেশ্যও তাঁর ছিলো। অন্যদিকে চেষ্টারটনের মতো প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যকে জার্নালিজিমের কাছাকাছি এনে ফেলার বিরোধী ছিলেন। তিনি সাধারণের মুখের দিকে তাকিয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি, যে-কোনো 'বাজারে' জিনিসের প্রতি তাঁর অপরিসীম বিতৃষ্ণা ছিলো।

Paradox অবশ্যই Wit-এর মধ্যে পড়ে। চেষ্টারটনের রচনা Paradox-এ ভরপূর। একটা সামগ্রিক যুক্তিকে Paradox-এর সঙ্কীর্ণ কুক্ষিতে স্থান দিতে পারলে বিস্ময় ও উত্তেজনার সৃষ্টি হবেই, একথা তিনি জানতেন। তাছাড়া, অবহেলিত বা অজ্ঞাত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি Wit-এর মতো Paradox ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে Paradox হচ্ছে,—'Truth standing on her head to attract attention ('Paradoxes of Mr. Pond')। St. Francis of Assisi-তে দেখি, Paradox-এর সাহায্যে তিনি একদিকে

যেমন ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, অন্যদিকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগধর্মের স্বরূপটি নিষ্কাশিত করেছেন। কিন্তু Paradox-এর মোহে তিনি এতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, অনেক সময় পরিমিতি রক্ষা করতে পারেন নি। চেষ্টারটনীয় Paradox-এর অফুরন্ত ধারা স্থানবিশেষ বিরক্তিকর মনে হয়, মনে হয় Paradox রচনা তাঁর একটা মুদ্রাদোষেই (obsession) পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। St. Francis of Assisi-তেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

প্রমথ চৌধুরীও Paradox-এর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর Paradox রচনার কারণ 'জড়ভাবে প্রতিষেধক উত্তেজনা সঞ্চার' ও পাঠকের মনে Wit-জাতীয় হাস্যরস সৃষ্টি ('ষ্টাইল' অধ্যায়ে Paradox-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। 'Pagan civilisation had been a very high civilisation···it was the highest that humanity ever reached'—চেষ্টারটনের এই উক্তি যেমন আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী, তেমনি বিরোধী প্রমথ চৌধুরীর নিচের উক্তিটি: 'তর্জমা করার শক্তির ওপরেই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে, সুতরাং একাগ্রভাবে তর্জমার কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।'

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোনো পার্থক্য নেই।' গ্রীক-জাতির প্রসঙ্গে চেষ্টারটনের মুখে শুনতে পাই: 'Pan was nothing but panic. Venus was nothing but venereal vice.'—এতেই ধারণা হয় প্রমথ চৌধুরী ও চেষ্টারটনের সংশয়বাদের (scepticism) প্রকৃতি অনেকটা একই ধরণের।

প্রমথ চৌধুরী যেমন অনেক প্রবচনমূলক ও epigrammatic উক্তি করেছেন, তেমনি করেছেন চেষ্টারটন। চেষ্টারটনের

যে-কোনো লেখা পাঠ করলেই এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বীরবলের সাহিত্যে যেমন শব্দ নিয়ে লোফালুফি আছে, তেমনি আছে চেষ্টারটনে: 'He liked as he liked ; he seems to have liked everybody, but especially those whom everybody disliked him for liking'. কিংবা 'The agreement we really want is the agreement between agreement and disagreement'. চেষ্টারটন্ এই দুইটি উক্তিতে 'like' ও 'agreement' শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন; প্রমথ চৌধুরী যে শব্দের খেলায় পেছিয়ে পড়েন নি, তার প্রমাণ আছে নিচের উক্তিতে: 'তবে যার প্রাণ আছে, তার পক্ষে সেই প্রাণ রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এতই স্বাভাবিক যে হাজারে ন-শ নিরানব্বইটি প্রাণী বিনা কারণে প্রাণপণে প্রাণ ধারণ করতে চায়।'

এখানে 'প্রাণ' শব্দটি নিয়ে বীরবলের লোফালুফি লক্ষ্য করবার মতো।

চেষ্টারটন্ ও প্রমথ চৌধুরীর অলঙ্কার রচনার মধ্যে বেশ একটা মিল যে আছে, তার প্রমাণ:

It might almost as truly be called the mistake of being natural and it was a very natural mistake.—St. Francis of Assisi.

কন্‌গ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি, তার প্রাণে ধড় এসেছে।—কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল।

The truth is that people who worship health cannot remain healthy.—St. Francis of Assisi.

When man goes straight, he goes crooked.—St. Francis of Assisi.

আমাদের সরল নাম লাভ করতে হলে অসরল হওয়া আবশ্যক।—ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রচনারীতির দিক থেকে, চেষ্টারটন্ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে বেশ সমধর্মিতা আছে। তবে চেষ্টারটনের রচনায় বুদ্ধির যতটা সুদূরপ্রসারী লীলাখেলা ও তড়িৎপ্রায় ঝল্‌সানি আছে, প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ততটা নেই। তাই চেষ্টারটনের মতো প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধির চমক পাঠককে বিভ্রান্ত করে না।

রচনারীতির দিক থেকে কম-বেশি সমধর্মিতা থাকলেও মতবাদের দিক থেকে এই দুই লেখকের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বললেই চলে। চেষ্টারটন্ ঐতিহ্যবাদী, অতীতমুখী। তার চিন্তার গতি ছিলো গোঁড়ামির দিকে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের দিকে। বস্তুতঃ, অতি প্রাচীন সত্যের মহিমায় তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী অতীতমুখী নন, বর্তমান-পূজারী ; ঐতিহ্যবাদী নন, যুগবাদী। তাঁর চিন্তার গতি ছিলো সংস্কারমুক্তির দিকে, বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধিৎসার দিকে। সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরী ও চেষ্টারটনের রচনারীতির ঐক্য বিস্ময়কর নয় কি ?

জীবনের দিক থেকে মন্‌টেইন্ ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে সমধর্মিতা আছে বলে মনে হয় না। মন্‌টেইনের মতো প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে বলা যায় না ঃ 'a man without money, without vigilance, without experience, but also without hate, without ambition, without avarice and without violence.' তবে উভয়েই ছিলেন গ্রন্থপ্রিয় ও চিন্তাশীল। প্রমথ চৌধুরীর যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত প্রখর ছিলো, তেমনি মন্‌টেইনের 'senses are sound, almost to perfection.'

মন্‌টেইন্ ফরাসী সাহিত্যে একটা নোতুন 'school'-এর প্রবর্তক। প্রমথ চৌধুরীও আপন ভাবাদর্শ, সাহিত্যাদর্শ ও রচনারীতিকে অবলম্বন করে একটা নোতুন 'school'—বীরবলী চক্র বা সবুজ-পত্রের দল

গড়ে তুলেছিলেন ; তবে এই দুই 'school'-এর স্বরূপের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে মনটেইনের সাহিত্যের পার্থক্য যেমন অতি-প্রত্যক্ষ, তেমনি অতি-প্রত্যক্ষ সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে বীরবলী সাহিত্যের পার্থক্য। মনটেইন্ যেমন অনেক বিষয়ে নোতুন আলোকপাত করেছেন, তেমনি প্রমথ চৌধুরীও অনেক উপেক্ষিত সত্যকে কিংবা সত্যের অনেক উপেক্ষিত দিককে উদ্ঘাটিত করেছেন,—তবে এই ক্ষেত্রে তাঁর সমধর্মিতা মনটেইনের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা চেষ্টারটনের সঙ্গে। মনটেইন্ যেমন নানা প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি প্রমথ চৌধুরীও কথ্যভাষাগত নানা শব্দ অবজ্ঞার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে রচনায় প্রয়োগ করেছেন। মনটেইন্ সম্বন্ধে G. E. B. Saintsbury বলেছেন : 'Montaigne thoroughly and completely exhibits the intellectual and moral complexion of his own time.' প্রমথ চৌধুরীও যুগধর্মী লেখক—যুগের নীতিগত না-হোক বুদ্ধিগত সমস্ত সম্ভাবনা তাঁর লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে।

সাহিত্যিকদের তুলনামূলক আলোচনায় মূলগত প্রেরণার প্রশ্নটা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। এই দিক থেকে মনটেইনের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কোনো রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। বীরবলের রচনা বুদ্ধিপ্রধান ; মনটেইনের রচনা মেজাজপ্রধান—তাতে লঘুপদক্ষেপে যদৃচ্ছ সংক্রমণের স্বচ্ছন্দতা আছে। ল্যাম্বের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন মনটেইন্, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী কোনোক্রমেই ল্যাম্বের সগোত্র নন।

মনটেইনের লেখায় পুরনো চিন্তা ও মনোভাব নোতুন খাতে বয়ে গেছে ; প্রমথ চৌধুরী পুরনো চিন্তা ও মনোভাব নিয়ে কারবার করেন নি। মনটেইন্ সাহিত্যিক হিসেবে 'humorous without

being satiric' আর প্রমথ চৌধুরী 'witty as well as satiric' 'ঠিক মাত্রা-অনুসারে কষের খাদ দিতে পারলে হাস্যরসে জমাট বাঁধে, এ-বিশ্বাসকে লেখায় রূপ দিতে বীরবল কসুর করেন নি ('সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

মন্‌টেইনের রচনা উদ্ধৃতির দ্বারা কণ্টকিত, কোথাও কোথাও উদ্ধৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের কোনো মন্তব্য স্থান পায় নি। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য থেকে অজস্র অনুচ্ছেদ আপন লেখায় আহরণ করেছেন বলে মন্‌টেইনের মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। এতে যদি তার মৌলিকতার অভাব সূচিত না-ও হয়, তবু তাঁর নিজের বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ (show of erudition—Andre Gide) যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ক্বচিৎ উদ্ধৃতি থাকলেও উদ্ধৃতির দ্বারা তা কখনই কণ্টকিত নয় এবং তিনি মন্‌টেইনের মতো অন্যের কাছ থেকে যদৃচ্ছভাবে ঋণ গ্রহণ করতেন না। বীরবলের রচনা পড়েও তাঁর মৌলিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে না। তবে মন্‌টেইনের মতো প্রমথ চৌধুরীও মনোজগতের অধিবাসী—পুঁথিগত সংস্কৃতির (bookish culture) ধারক ও বাহক।

এখানে আর একটা কথা বলতে চাই। মন্‌টেইনের চেয়ে la Rochefoucauld (১৬১৩-১৬৮০) জাতীয় 'literary courtier'-দের মতো একটু বাঁকা চাউনি অথচ স্বচ্ছ অনুভূতিবিশিষ্ট ফরাসী লেখকদের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মিল বেশি। la Rochefoucauld তির্যক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন; তিনি বিক্ষিপ্ত, অস্থির ও অমার্জিত রচনারীতি পছন্দ করতেন না। শব্দব্যবহারে ও কথারচনায় তিনি যথার্থ পরিমিতি রক্ষা করে চলেছেন; তবে বক্তব্যকে ক্ষুণ্ণ করে তিনি কোথাও মিতব্যয়িতা দেখান নি। প্রমথ

চৌধুরীরও একটা অনাসক্ত, বিদ্রূপাত্মক, সংশয়বাদী ও বঙ্কিম দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো; 'চৌকশ' রচনারীতির তিনিও ছিলেন পূজারী। তাঁর লেখায়ও যেমন অতি-কথন তেমনি অল্প-কথন নেই। তবে la Rochefoucauld ছিলেন cynical, আদর্শবাদে অবিশ্বাসী। জীবনের কটু-কষায় অভিজ্ঞতাই তাঁর কাছে মুখরোচক ছিলো। তাঁর সমকালীন ফরাসী রাজসভায় মনুষ্যত্বের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—তা ছিলো আত্মসুখতৎপর এবং বাইরে মসৃণ, ভেতরে মর্যাদাহীন। এরই প্রতি লক্ষ্য রেখে la Rochefoucauld তাঁর জীবন-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সমাজে প্রচলিত বাঁকাচোরা রীতিনীতির সংশোধন-প্রয়াসী। এই দিক দিয়েই la Rochefoucauld-এর সঙ্গে বীরবলের অমিল।

তবে আসল কথা হচ্ছে, শুধু মন্‌টেইন্ বা la Rochefoucauld নয়—সমগ্র ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবই প্রমথ চৌধুরীর ওপর ছিলো। ফরাসী সাহিত্যের যে যে বৈশিষ্ট্য প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করেছিলো, তা হলো এই :

ফরাসী সাহিত্য বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে; চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় না—অকিঞ্চিৎকর বলে উপেক্ষা করে না। এক কথায়, যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর বুদ্ধির অগম্য—ফরাসী সাহিত্যে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না।

ফরাসী সাহিত্য আলোকপ্রিয় অর্থাৎ দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, তাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য সরাসরি ধরা দেয় না, শুধু আভাষে ইঙ্গিতে আত্ম-পরিচয় দেয়, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া

যায় না। এই আলোকপ্রিয়তার ফলে ফরাসী সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

মনের বিচারবুদ্ধিহীন কল্পনাসর্বস্বতা ও নিরঙ্কুশ আবেগ-প্রবণতা ফরাসী সাহিত্য বর্জন করে।

উচ্চবাচ্য বা কটুবাক্যের চেয়ে তীক্ষ্ণ হাসি যে অধিকতর শক্তিশালী—ফরাসী সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে।

ফরাসী সাহিত্যে ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতার লেশমাত্র নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম। এই স্বচ্ছতা, এই উজ্জ্বলতার বলেই ফরাসী সাহিত্য যুগে যুগে য়ুরোপের অপরাপর সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ফরাসী সাহিত্য বিজ্ঞানসম্মত মানব-বীক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী। তাই দেখা যায়, মলিয়ার তাঁর সাহিত্যে ধর্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি পৃথিবীর লোকের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু এসকল মূর্তি দেখে মানুষ ভয় পায় না, হাসে।

ফরাসী সাহিত্যে হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রস থাকলেও ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত রস সেখানে নেই।

মানুষের সচেষ্ট ও সচেতন মনের ওপর নির্ভর করায় ফরাসী সাহিত্যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা আছে।

ফরাসী সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে। চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে।

ফরাসী মন সকল প্রকার মিথ্যার, সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসী মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।

ফরাসী সাহিত্যে লিপি-চাতুর্যের অভাব নেই। তা সম্পূর্ণভাবে আর্টের গুণসম্পন্ন।

ফরাসী লেখকেরা যুগে যুগে রচনার বৈচিত্র্য নয়, ঐক্য সাধন করে একটি আদর্শ-রীতি গড়ে তোলবার জন্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন এবং সে-বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছেন। এই যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসী শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠে।

ফরাসী সাহিত্যে দেশবাসীর সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসী সাহিত্যের ভাষা গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্যবর্জিত।

পদনিবাচন ও পদযোজনায় যাতে রেখার সুষমা থাকে, সামঞ্জস্য থাকে. রচনার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত, পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হয়, যাতে করে একটি রচনা পূর্ণাবয়ব, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সমগ্র হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে ফরাসী দেশের সাহিত্য-শিল্পীর সাধনা।

অত্যুক্তি, অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধপাণ্ডিত্য ফরাসী সাহিত্যে দেখা যায় না। ('ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়'—'নানাকথা' দ্রষ্টব্য)

✓ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে যে ফরাসী সাহিত্যের এই সব বৈশিষ্ট্যেরই কম-বেশি চর্চা আছে—তা এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে, যেমন তাঁর পরিহাসবোধ ও বিদ্রূপাত্মক রুচি, ভাবালুতা ও সংস্কারহীন মনোভাব, উজ্জ্বল ও চটুল বুদ্ধির তেমনি তাঁর গদ্যের সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ ও সতেজ রূপের পেছনে আছে ফরাসী প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্যে আর যাই থাক শুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা নেই—আছে ফরাসী সাহিত্যে। প্রমথ চৌধুরী

সেখানে থেকেই তার দীক্ষালাভ করেন। মনে রাখতে হবে—প্রমথ চৌধুরী ফরাসী ভাষা জানতেন, ফরাসী সাহিত্য পড়তেন, এমন কি অনুবাদ পর্যন্ত করতেন। ফরাসী মনের ধাতের সঙ্গে তাঁর নিজের মনের ধাতের মিল ছিলো বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিলো।

এইতো গেলো বীরবলের নানা প্রসঙ্গ। দেখা গেলো, তাঁর সারস্বত সাধনার লক্ষ্য ছিলো বুদ্ধির মুক্তি। তাঁর কাছে বিদ্যা পণ্ডিতের স্থূল অহঙ্কার রচনার উপকরণ নয়—তিনি বিশ্বাস করতেন, সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। 'রুচি ও অগ্রগতির মান ছিলো তাঁর মানবতায় জাগ্রত, কাজেই শিবে বানরে গোলমাল তিনি করেন নি। পরিবর্তনের আভাস ইঙ্গিত, ইতিহাসের ধর্ম তিনি বুঝেছিলেন।··· রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের যে উৎস ও প্রসারে···উনিশ শতকী সংস্কৃতি, তার সঙ্গে তাই যোগ খুঁজেছিলেন বিস্তৃত লৌকিক শিল্পসাহিত্য ধারার, ব্যাপকতর অতীতের ও বর্তমানের। আমাদের আগের পুরুষের প্রগতিরহস্য তাই তাঁকে যন্ত্রণায় হাসিয়েছিল। তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভেবে কাতর হন নি, ইঙ্গ-বঙ্গের ব্যাপ্তিও চান নি, হিঁদুয়ানীও চান নি। তাঁর এই চোখ খোলা কঠিন সাধনার আস্থা আজও আমাদের আত্মীয় লাগে। সাধনা যে কঠিন তার প্রমাণ বীরবল বারবার দিয়েছেন। এমন কি পরিবেশের প্রভাব পরোক্ষে হয়তো তাঁর রচনাতেও স্পর্শেছে। তারই জন্যে হয়তো ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে থেকে থেকে অতি চপল, হাস্য হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত···। অবশ্য তাঁর পরিবেশ ছিল পরাক্রান্ত; গ্রামভারী মূর্খতা, প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডূকতা, যুক্তিহীন বুলি, অন্ধ বিশ্বাসের নেকড়ের পালের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যে প্রায় একমাত্র আশ্রয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একমাত্র কিন্তু প্রবল, অলোকসামান্য প্রতিভার মহীরুহ।···রবীন্দ্রনাথের লোকান্তর রচনাবলী

ও ব্যক্তিস্বরূপকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন কিন্তু অনুকরণ করেন নি, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পাশে প্রমথ চৌধুরীর মুক্ত দৃষ্টিসত্তা তাই আজও বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বিষয়।'

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজও আমরা উপলব্ধি করতে শিখি নি, তাঁর গভীরতর মূল্য অকপটে স্বীকার করি নি, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে চাই নি। বস্তুতঃ, আমাদের চিন্তার ছাঁদে এখনও বুদ্ধির বয়ন কতটুকু, জীবনের নক্‌শায় বুদ্ধিচর্চার অভ্যাস কাজ করছে কতখানি? চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এখনও আমরা গুরুবাদ, অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবাবেগের দাসত্ব করে থাকি। নিষ্কামতা (detachment) ও নিরাসক্তি (disinterestedness) নিঃসন্দেহে সংশয়, দ্বিধা ও মদালসতার চেয়ে ভালো—আরও ভালো প্রতিক্রিয়াশীলতার চেয়ে, তবু আমরা বুদ্ধিহীনতার অন্ধগলি আর দুর্বুদ্ধির বিপথ ছেড়ে বুদ্ধির আলোকিত পথে চলেছি কি? অথচ একজন খাঁটি ইণ্টেলেক্‌চুয়াল হিসেবে প্রমথ চৌধুরী একথাই বারে বারে বলে গেছেন। হতে পারে, তাঁর বুদ্ধিচর্চার প্রণালী একটু স্বতন্ত্র ধরণের, আমাদের জ্ঞানচর্চার রীতির সঙ্গে তার মিল নেই—তাঁর বুদ্ধির শিক্ষা দিয়ে জীবনের পরিচিত দিকের পরীক্ষা হয় না,—তবু তাঁর মুক্ত বুদ্ধি, তার শাণিত স্বাতন্ত্র্য আমাদের পরম ধন। অন্ততঃ 'মুক্তির বুদ্ধি' খোঁজার দিনে তো বটেই। 'বীরবলের যে লোকায়ত মানবতা, যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারের আস্থা এবং সে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন যে চেষ্টা তার প্রয়োজন আজও এতো বেশি বাস্তব যে মনে হয় বীরবলের সভ্যতাপ্রচার বাংলা দেশের দিক থেকে বুঝি বৃথায় গেছে।'

৪

ভাষাদর্শ

এক ভাষা-আন্দোলনের নেতা হিসেবেই বাঙলা দেশে প্রমথ চৌধুরী অধিকতর পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, সাধুভাষায় নয়—মৌখিক ভাষাতেই বাঙলা সাহিত্য রচনা করতে হবে। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়াও হয়েছিলো গুরুতর। কিন্তু তাতে প্রমথ চৌধুরী পেছিয়ে যান নি, আরো জোরের সঙ্গে মৌখিক ভাষার সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরিণামে জয় হয়েছে তাঁরই। আধুনিক বাঙলা গদ্যের সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে তাঁর সেই জয়ের চিহ্ন। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-দর্শের পূর্ণ পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

একদল য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাঙলা ভাষার উৎপত্তি। স্বর্গগত রমাপ্রসাদ চন্দও বলেছিলেন, বাঙলা সংস্কৃতের দুহিতা হওয়া দূরের কথা—দৌহিত্রও নয়; বাঙলা মাগধী প্রাকৃতেরই বংশধর। প্রমথ চৌধুরী এই মতেরই সমর্থক ছিলেন। তাই বাঙলা ভাষার সংস্কৃতের অঞ্চল ধরে বেড়ানো তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না; শুধু তাই নয়, তাঁর মতে, বাঙলা ভাষাকে শাসন করবার কোনো অধিকার সংস্কৃতের নেই। অথচ বাঙলা গদ্যসাহিত্য আলোচনা করলে, সংস্কৃতবহুল বাঙলা সাধুভাষার আধিপত্যই চোখে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী তার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'প্রাচীনকালে এদেশে একটি মাত্র ভাষা ছিল—যে ভাষাকে আমরা শূদ্র বলি;—এই শূদ্রভাষার অন্তর থেকেই ব্রাহ্মণ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং সাধুভাষা হচ্ছে বর্ণব্রাহ্মণ ভাষা।

লেখার ভাষার এই ব্রাহ্মণত্ব লাভের মূলে আছে রাজপ্রসাদ। নবাবী আমলে গৌড়ের রাজদরবারে বাঙলা ভাষার উপনয়ন হয়, পরে ইংরাজি আমলে কলকাতার কেল্লায় তা পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।' অর্থাৎ রাজপৃষ্ঠপোষকতায় শূদ্র মৌখিক ভাষা থেকেই ব্রাহ্মণ সাধুভাষার উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং সাধুভাষা নয়—মৌখিক ভাষাই বাঙালী জাতির প্রাণের ভাষা। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরীর মতে বাঙালীর মৌখিক ভাষাই বাঙলা ভাষা। তিনি বলেছেনঃ 'কেউ হয় ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাঙলা ভাষা কাকে বলে।...এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনা চিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আস্‌ছি, এবং আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাঙলা ভাষা? বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালীর মুখে।'

প্রমথ চৌধুরীর মতে, যতদূর সম্ভব বাঙালীর মুখের ভাষাতেই বাঙলা সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। 'আসল কাথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন—একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।'

বাঙালীর মুখের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ 'তা খাঁটি বাংলাও নয়, খাঁটি সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনরূপ খিঁচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত শব্দ প্রকৃত কিংবা

বিকৃত রূপে বাংলা কথার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি ও মানি।...শব্দ কল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে, তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বাঙালীর মুখের ভাষার মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: 'গঙ্গা যেমন বাংলা দেশে প্রবেশ করা মাত্র দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে, একদিকে পদ্মা আর একদিকে ভাগীরথীর আকারে বয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাও (এখানে বাংলা ভাষার অর্থ বাংলা মৌখিক ভাষা) তেমনি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। মাহাত্ম্য যেমন পদ্মার জলে নেই, ভাগীরথীর জলে আছে,—তেমনি ভাগীরথীর উভয়কূলের বাংলা ভাষায় যে মাহাত্ম্য আছে, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ভাষার সে মাহাত্ম্য নেই। এই ভাগীরথীর ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা। আমরা যে ইংরেজী আমলের কেতাবী ভাষার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি, তার কারণ আমাদের—আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতার কেল্লার গড়খাইয়ের বদ্ধজলের পরিবর্তে বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে আবার ভাগীরথীর প্রবাহ এনে ফেলা।' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী ভাগীরথীর উভয়কূলের মৌখিক ভাষাকে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা করার অভিলাষী ছিলেন।

কিন্তু মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করবার প্রস্তাব বিবেচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে। মৌখিক ভাষার শব্দসম্পদ সর্বত্র ঠিক মার্জিত ও রুচিসঙ্গত নয়—সুতরাং তাকে সাহিত্যের ভাষা করার কি অসুবিধা নেই? এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরেই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকর মুখে চলে না, এমন কোনও শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে

পারি না। slang, ভাষা নয়; হয় তা অপভাষা, নয় উপভাষা। ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।...আমরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটিভাবে ব্যবহার করতে চাই। ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে তা...বাগ্‌ভট্টালঙ্কারের একটি বচনে বেশ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।—অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম্। অর্থাৎ সেই সেই দেশে কথিতভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ।' এক কথায়, প্রমথ চৌধুরীর মতে, বিশুদ্ধ অপভ্রংশ শব্দ নিয়ে গঠিত মৌখিক ভাষাই বাঙলা সাহিত্যে প্রযোজ্য।

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সাধুভাষাই বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে আধিপত্য লাভ করেছে, সাধুভাষাই লৈখিক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই সাধুভাষার সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন: 'একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভারও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।' পূর্বে আমরা নোতুনত্বের লোভে নির্বিচারে অনেক সংস্কৃত শব্দকে বাঙলা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি; অথচ সেগুলি ঠিক খাপ খায় নি। প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাব, যথোপযুক্ত বিচারের পর তার গুটিকতককে মুক্তি দিতে হবে। তার ফলে বাঙলা ভাষার মধ্যে খানিকটা নির্মলতা আসবে। আর যে-সকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টতঃ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। তারপরে প্রশ্ন ওঠে, প্রয়োজন হলেও কি নোতুন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা চল্‌বে না? এসম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'একথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে তারই প্রতিদিনের খোরাক

যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি করতে হলে প্রধানত অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বের করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর থেকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে, ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।'

ধাতুরূপ ও সর্বনামপদের পার্থক্যই সাধুভাষা ও মৌখিক ভাষার অন্যতম প্রধান পার্থক্য। সাধুভাষায় এই সবের পূর্ণতর আর মৌখিক ভাষায় (ভাগীরথী তীরের মৌখিক ভাষায়) সংক্ষিপ্ততর রূপ ব্যবহৃত হয়। প্রমথ চৌধুরী ধাতুরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 'প্রদেশভেদে আজও বাঙ্গালীর মুখে 'আস্তে আছি', 'আসিতেছি' এবং 'আস্‌ছি', এই তিন রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং কথাবার্তায় এর শেষোক্ত রূপটিই যে আমাদের কানে ভালো লাগে ও ভদ্র শোনায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা যদি কানের পরামর্শ শুনি, তাহলে লেখায় 'আসিতেছির' পরিবর্তে 'আস্‌ছি' লিখতে কুণ্ঠিত হব না।' সর্বনাম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—'সর্বনামের প্রথম পুরুষের দেহ হতে যে 'হা' কালবশে খসে পড়েছে—তাকে

কুড়িয়ে নিয়ে জুড়িয়ে দিলে, সে পুরুষের গায়ের জোর বাড়ে না—শুধু গা ভারি হয়।'

এইবার ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যাক।

মাগধী প্রাকৃত থেকে বাঙলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। তার বাঙলা ভাষাকে শাসন করবার কোনো অধিকার সংস্কৃত ভাষার নেই।

বাঙলা সাধু ভাষা বাঙালী জাতির প্রাণের সৃষ্টি নয়—তা রাজপুরুষের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা নিতান্ত অযত্নে গঠিত হয়েছে। সুতরাং বাঙলা সাধু ভাষাকে বিনা দ্বিধায় বাঙলা সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করা উচিত।

বাঙালীর মুখের ভাষার সঙ্গে তার প্রাণের সম্পর্ক আছে—তাই বাঙলা মৌখিক ভাষাকেই বাঙলা সাহিত্যের ভাষা করা সঙ্গত।

বাঙলা মৌখিক ভাষার নানা রূপ-ভেদ আছে। তন্মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীরের মৌখিক ভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ভাগীরথী অঞ্চলের বাঙলা মৌখিক ভাষাই হবে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা।

বাঙলা মৌখিক ভাষাকে বাঙলা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দকে সাধুভাষীরা নির্বিচারে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে আমদানী করেছেন—যথাসম্ভব বিচারের পর তাদের কোনো কোনোটিকে বর্জন করতে হবে (অর্থাৎ যেগুলিকে বর্জন করলে কোনো ক্ষতি নেই)।

যে সকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টতঃ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে—তা যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

নিতান্ত প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত ভাষা থেকে সেই সমস্ত শব্দ গ্রহণ করা হবে—যা বাঙলা ভাষার সঙ্গে খাপ খেয়ে যেতে পারে।

সংস্কৃতের অত্যাচারে যে-সমস্ত খাঁটি বাঙলা শব্দ বাঙলা সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের ও বিভক্তির যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে, যথাসম্ভব তাদের বর্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয় ('যথাসম্ভব' শব্দটি এখানে বিশেষ বিবেচনা করেই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ঃ 'ধর্মকর্ম শব্দটিকে যদি কোথাও ধম্মকম্ম রূপে উচ্চারণ করা হয়ও, তথাপি তা সাহিত্যে চলবে না।' সুতরাং অর্ধতৎসম বা তদ্ভব শব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রেও যে প্রমথ চৌধুরী বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই)।

মৌখিক ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের যে রূপ দেখা যায়, তাই কানে ভালো ও ভদ্র শোনায়। সুতরাং তা সাহিত্যেও ব্যবহার করতে হবে।

বাঙলা সাধু ও মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে এই হলো প্রমথ চৌধুরীর মত। এই মত ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে টেকে কিনা—সে আলোচনা আমরা করতে চাই নে। তবে প্রমথ চৌধুরীর সমর্থনে একটি কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে। যদি সাধুভাষার উদ্ভব স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, তবে সাধুভাষা বনাম মৌখিক ভাষার বিবাদটা মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে কেন? ভাষা নিয়ে আন্দোলন প্রমথ চৌধুরীই প্রথম শুরু করেন নি, তার আগেও বহুবার এ নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে। শুধু তাই নয়, —মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যেমন সাধুভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন—অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে', কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়', 'হরিদাসের গুপ্তকথায়', দীনবন্ধু-মাইকেলের নাটকে মৌখিক ভাষা

চালাবার চেষ্টা হয়েছে। যখন সে চেষ্টাটাই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিলো—'সবুজ-পত্রের' আমলে—তখনই সাধু ও মৌখিক ভাষার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বর্তমানে মৌখিক ভাষা সাধু-ভাষার স্থান গ্রহণ না করলেও তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। যদি সাধুভাষা দেশজ ও স্বভাবজ হয়ে থাকে—তবে কেন এমন হলো?* এর উত্তরে উষ্মা প্রকাশ করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। সুতরাং বাঙলা সাধুভাষার মধ্যে কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে বলে অভাষাতাত্ত্বিকেরও সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অন্যান্য দেশেও ভাষার ষ্টাইল নিয়ে আন্দোলন দেখা দেয় বটে, তবে ভাষার মূল প্রকৃতি নিয়ে নয়। সাধুভাষা ও মৌখিক ভাষার বিবাদটা অনেকটা ভাষার মূল প্রকৃতি নিয়ে। সুতরাং সমস্ত বিষয়টিই যে বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, টেকচাঁদ ঠাকুর ('আলালের ঘরের দুলাল') ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ('হুতোম প্যাঁচার নক্সা') ভাষা-আলোলনের চেয়ে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব এত বেশি কেন? 'আলাল' ও 'হুতোমে' মৌখিক ভাষার যে নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে বীরবলের মৌখিক ভাষার পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদটা কি?

---

*এ-সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার বলেন: 'Literary Bengali of prose, during the greater part of the 19th Century, was thus a doubly artificial language and with its forms belonging to Middle Bengali and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a 'Modern English' with a Chaucerian grammar and a super-Johnsonian vocabulary, if such a thing could be conceived.'—Origin & Development of Bengali Language. রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত'—শব্দতত্ত্ব।

এর উত্তরে বলা যায়, 'আলাল' ও 'হুতোম' এসেছিলো ভাষার পরিবর্তন-তরঙ্গের অবরোহণের দোলায়। পণ্ডিতী ভাষার প্রতি-ক্রিয়ারূপেই টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের মৌখিক ভাষার আত্মপ্রকাশ। বিদ্যাসাগরের হাতে সাধুভাষা বাক্যগত ভারসাম্যসৃষ্টি, যতিচিহ্নের প্রচুর ব্যবহার, অন্তর্নিহিত ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন, সুষম পদ-সংস্থান-রীতি অনুসরণ, সাবলীল গতিচ্ছন্দ রক্ষা ও বিশুদ্ধ-মার্জিত-ওজস্বী শব্দ-প্রয়োগের ভেতর দিয়ে একটা গভীর মর্যাদা, বনেদী কৌলিন্য ও সংযত-সুন্দর ক্লাসিক রূপ লাভ করেছে বটে—তথাপি প্রাণ-স্পন্দনের অভাবের জন্যেই তা পণ্ডিতী ভাষার আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রাণ-স্পন্দনের কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর অভাবে ভাষা আবেদনহীন হয়ে পড়ে। এমনিতর পরিস্থিতিতে টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন 'পণ্ডিতী ভাষার বিপরীত বৃত্তক্রান্তি' দেখাবার জন্যেই শ্রীহীন রূপহীন অথচ প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ মৌখিক ভাষার অবতারণা করলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'হুতোম' ও 'আলালের' ভাষা সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা নয়। এই দুইটি গ্রন্থে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষার স্পর্শ সর্ব-প্রযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ; শুধু তাই নয়, জোর করে চালানো হয়েছে চল্‌তি ধাতু, আরবী-ফার্সী-গ্রাম্য-দিশি শব্দ, সমাসবর্জিত পদ, মৌখিক ভাষার বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায় : 'এ যেন হরিজন উদ্ধারের পর্ব। এ যেন গোঁড়ামির প্রতিশোধ লওয়ার জন্য চামার চণ্ডাল সবারই গলায় পৈতা পরাইয়া দেওয়া।' একেবারে উপভাষা-ঘেঁষা মৌখিক ভাষায় রচিত হওয়ায় 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষার বাহ্যিক পরিপাট্য নেই, শুদ্ধ-সংযত শ্রী নেই, গভীর-গম্ভীর ধ্বনি নেই, মার্জিত রসস্ফূর্তি নেই, নেই সর্বগুণান্বিত রচনাভঙ্গির শিল্প-সৌন্দর্য। তবে সারল্য ও সরসতা, প্রাণধর্ম ও সজীবতার দিক

থেকে এই দু'টি গ্রন্থের ভাষা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। স্বীকার করতেই হবে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছ কথাগুলিকে বাণীরূপ দেওয়ার পক্ষে এ-ভাষা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তবে উঁচুস্তরের অনুভূতি, গহন-গভীর চিন্তা, নিগূঢ় তত্ত্ব ও জটিল সমস্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা সন্দেহের বিষয়। আসল কথা হচ্ছে, 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষা যুগান্তকারী পূর্ণাঙ্গ ভাষার মর্যাদা পেতে পারে না।

তারপর এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের প্রতিভা একদিকে বিদ্যাসাগরের সাধু ভাষাকে, অন্যদিকে 'আলাল' ও 'হুতোমের' মৌখিক ভাষাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিলো—এই উভয় জাতীয় ভাষা রইলো তাঁর নোতুন ভাষারীতির রাসায়নিক সংশ্লেষের অলক্ষ্য উপাদানরূপে—তারা সাহিত্যের পাদপ্রদীপ থেকে যবনিকার অন্তরালে অপসারিত হলো। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরী সাধু ভাষার বহিঃসৌষ্ঠব গ্রহণ করলেন, গ্রহণ করলেন 'আলালী' ও 'হুতোমী' ভাষার অন্তঃস্পন্দন। তিনি জহ্নু মুনির মতো 'আলাল' ও 'হুতোমের' ঘোলা জল পান করে তাকে নির্মল করে দিলেন, এবং সেই নির্মল জাহ্নবী-ধারার যৌবনজলতরঙ্গকে বিদ্যাসাগরী ভাষার স্ফটিক-স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ ধারায় সঞ্চারিত করে দিলেন। একের রূপ ও অন্যের প্রাণ মিলে বঙ্কিমের ভাষা-স্রোতস্বিনী পূর্ণাঙ্গিনী হয়ে উঠলো। দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়—বিদ্যাসাগরের ভাষা যদি হয় 'thesis', তাহলে 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষা 'antithesis' এবং বঙ্কিমের ভাষা 'synthesis'। বস্তুতঃই, বঙ্কিমের সাহিত্যে সাধু ভাষা সংপৃক্তির সূচকাঙ্কে (point of saturation) এসে পৌঁচেছে। তার জড়তা (stagnation) চলে গেছে, গতিবেগ এসেছে; সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে (power of assimilation and

analysis) যথাসাধ্য শোষণ করে ভাষা হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (elastic)। শুধু তাই নয়, ভাষার কলায়নও (artistic decoration) তখন একটা প্রশংসনীয় স্তরে পৌঁচেছে। বঙ্কিমের পূর্বে বাঙলা ভাষায় এই সব ব্যাপার ঘটলো না কেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবন ও মনের সঙ্গে তাল রেখেই ভাষার বিবর্তন হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্বের সংস্পর্শে এসে বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে ও চিন্তার জগতে যে ভাঙা-গড়া শুরু হয়েছিলো—তা বঙ্কিমের সময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করে ; পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী সমস্ত চিন্তা ও কর্মের ধারা সমন্বায়িত (synthetic) আদর্শের সাগর-সঙ্গমে মিলিত হয়ে তাকে উদ্ভিন্নযৌবনা করে তোলে। সুতরাং বঙ্কিমের হাতে বাঙলা ভাষার পূর্ণ পরিণতি আসতে দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বঙ্কিমের পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ—সার্বভৌম প্রতিভা ও সর্বাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব নিয়ে। কবিগুরু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর আত্মোপলব্ধির মূর্ত প্রতীক। বঙ্কিমের সময়ে বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনা আত্ম-সংগঠনের পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করেছিলো, রবীন্দ্রনাথের কালে সেই ক্ষেত্রই আত্মোপলব্ধির ফুলে-ফলে সার্থক হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষাকেও চরম সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে দেখি। বঙ্কিমের সৃষ্টি নবযৌবনা ভাষা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর স্পর্শে পূর্ণযৌবনা হলো—তার মধ্যে অপূর্ব শ্রী, অসামান্য লাবণ্য ও চরম বলিষ্ঠতা স্ফূর্তি লাভ করলো। অস্বীকার করবার উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাধুভাষাকে শক্তি ও চারুতার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব সাধুভাষার এই চূড়ান্ত উন্নতি-যুগের পরে। তখন ভাষা আবার স্থবির, আড়ষ্ট হয়ে এসেছে—ভাবাবেগের

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উচ্চশীর্ষ থেকে নেমে এসে তা বুদ্ধিগত আলোচনার শাখাপথে প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নানা নোতুন চিন্তা সমাবেশ, নোতুন রচনারীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে ভাষার ক্ষেত্রে নোতুনতর আন্দোলন আসবে—তারই সম্ভাবনায় যেন সমস্ত পরিস্থিতিটা থম্‌থমে। মনে রাখতে হবে, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের যুগসন্ধি অনেক সময় দেখা যায়। প্রমথ চৌধুরী এলেন এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের শুভ-মুহূর্তে। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, সাধুভাষাতে নয়, মৌখিক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে। তাঁর পরম সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গ্রাস না করে তাঁর ভাষাদর্শ ও রচনারীতির আরো বিচিত্র সার্থক প্রয়োগ দেখালেন। অলৌকিক কবি-প্রতিভা তাঁর ভাষার উদ্ধত ললাটে সৌন্দর্যের জয়টীকা পরিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন মননধর্মী আলোচনার খাতে বয়ে চললো—অবলম্বন করলো মৌখিক ভাষাকে। প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হলো।

এই আলোচনা থেকে একটা কথা বোধ হয় বুঝতে কষ্ট হবে না। প্রমথ চৌধুরী সাধু ভাষার চূড়ান্ত উন্নতির পরে, সংপৃক্তির শেষে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁর মৌখিক ভাষা সাধুভাষার আহৃত শক্তি ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের যে কলম সাধুভাষার চূড়ান্ত উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলো, সেই কলমই মৌখিক ভাষার বিচিত্র সার্থক প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করায় মৌখিক ভাষার মধ্যে শক্তি ও শ্রীর অভাব দেখা গেলো না। তাছাড়া, বীরবলী ভাষারীতি ও রচনারীতির অভিনবত্ব মৌখিক ভাষার মধ্যে এনে দিয়েছে নোতুন-তর সম্পদ। এই কারণেই বীরবলী যুগে মৌখিক ভাষাকে রূপ ও রীতিতে, শক্তি ও সৌন্দর্যে সাধুভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে দেখি। বস্তুতঃ শোষণ-শক্তি, প্রাণ-শক্তি, রূপ-সৌন্দর্য, সংশ্লেষণ

ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, গতিশীলতা, মণ্ডনকলা—ইত্যাদি কোনোদিক থেকেই বীরবলী যুগের মৌখিক ভাষা পঙ্গু নয়। কিন্তু 'আলাল' ও 'হুতোমের' প্রাণ-শক্তি থাকলেও অন্যান্য গুণগুলি ছিলো না—থাকার সম্ভাবনাও ছিলো না, কারণ তখনও সাধুভাষার চূড়ান্ত উন্নতি হয় নি। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরীর সাধনায় ও রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় মৌখিক ভাষা সাধুভাষার যোগ্য আসন পাওয়ায় মৌখিক ভাষাকেও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে হলো—ব্যাপকতর ও বিচিত্রতর ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োগ করতে হলো। শোষণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে দেখা দিলো শব্দসম্পদের প্রাচুর্য। কিন্তু 'আলাল' ও 'হুতোমের' ভাষা ছিলো সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক, সঙ্কীর্ণ এবং শব্দ-সম্পদের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের ভাষার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অত্যন্ত বেশি। এই সব কারণে টেকচাঁদ ও কালী-প্রসন্নের ভাষা বাঙলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা না পেলেও বীরবলী ভাষা তা পেয়েছে। অতএব 'আলালের' ও 'হুতোমের' ভাষা আন্দোলনের চেয়ে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব বেশি হওয়াতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

ভাষা সম্বন্ধে নিজের মত বীরবল লেখায় কতটুকু মেনে চলেছেন—আলোচনা করে দেখা যাক। /তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিলো যে, যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষায় লেখা উচিত/ আমাদের কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা সঙ্গত বলে তিনি মনে করতেন।/কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর লেখার ভাষা সাধারণ বাঙালীর মুখের ভাষার ঠিক অনুরূপ বলে মনে হয় না। তাঁর শব্দচয়ন, বচনভঙ্গি, কথার মারপ্যাঁচ ও অলঙ্করণ ইত্যাদি সব মিলে ভাষার এমন একটা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে যা সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য নয় এবং সেই ভাষাকে কোনোও

স্থানের সাধারণ কথাবার্তার ভাষা বলে গ্রহণ করতেও কুণ্ঠা হয়। আমরা যখন কথা বলি, তখন সেই কথার ভাষা সম্বন্ধে সচেতন থাকিনে, কারণ সহজ স্বাভাবিকভাবেই তার প্রকাশ হয় এবং উচ্চারণেও বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না। বীরবলের লেখা পড়বার সময় তাঁর ভাষার গঠন বারে বারে আমাদের মনোযোগ ও জিহ্বার জোর আকর্ষণ করে এবং তা সহজ ও স্বাভাবিক নয়, বরং কৃত্রিম বলেই মনে হয়। নিচের উদাহরণ দু'টির মধ্যে তার প্রমাণ আছে।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: 'সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম, লৌকিক ন্যায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোরু-তাড়ানো শ্রেয়। 'ক'-অক্ষর যে-কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত, এ-ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার-পরিচ্ছদ, গৃহ-মন্দির—সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধারকার্যটি খুব ভালো; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত তাঁরা নিজেদের উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরেজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙুলের ছাপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া তো

দূরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে-কোনো সংস্করণের আবশ্যক থাক না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।'

—তর্জমা, বীরবলের হালখাতা।

অন্যত্র লিখেছেন: 'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে আমরা লেখাপড়ার দিক দিয়েও আর ঘেঁষতে চাইনে। পাঠদ্দশায় আমরা যে সরস্বতীকে নিত্য বলি—ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী। বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করতে হয় বলেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটা নিরানন্দ। যার ভিতর আনন্দ নেই তা—আমরা নিজের মন থেকেই দূর করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। এবং যাঁদের এরূপ সাধু সঙ্কল্প আছে, তাঁরা সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করতে অক্ষম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে ইংরেজির সাহায্যে আরোহণ করি বলে বাঙ্গালায় অবরোহণ করতে পারিনে। ইংরেজি সরস্বতী আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের আগডালে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেন। ফলে আমরা কেউ আইনের কেউ বা ডাক্তারির শাখায় বসে ফল পাতা যা পাই তাই খেয়ে জীবনধারণ করি, অথচ দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার আবাদ করলে ফলতো সোনা। নবশিক্ষিত মনের যে কৃষিকাজ আসে না তার একমাত্র কারণ এই যে, সে মনকে মাতৃভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে, মনের মাতৃভূমি হল মাতৃভাষা।'

—আমাদের শিক্ষা।

উপরের উদ্ধৃতি দু'টির ভাষা সাধারণ লোকের বোধের অগম্য। তিনি চল্‌তি কথা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন, শব্দনির্বাচনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন—তথাপি তাঁর ভাষা বাঙালীর ঠিক মুখের ভাষা হয়ে ওঠে নি (এখানে ধ্বনিপ্রকৃতি বা বাক্‌ভঙ্গিমার কথা বলা হচ্ছে না, ভাষার সহজবোধ্যতার বিষয়টিই আলোচনা করা হচ্ছে)।

সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে মত পোষণ করতেন তা-ও তাঁর নিজের লেখায় সর্বত্র অনুসরণ করা হয় নি। যেখানে তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি হতো না, সেখানে তিনি অনেক সময় তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন ; যেখানে সহজ শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব, সেখানেও কঠিন শব্দ প্রয়োগ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। 'কথা যতই ছোট হোক,—খাঁটি হওয়া চাই—তাঁর উপর চকচকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিষটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে যা আর-কারও নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না।' এই সহজ সরল বাক্য দু'টির মধ্যে 'লুপ্তপ্রায়' অংশটি কি বেমানান নয়? 'লুপ্তপ্রায় হয়েছের' বদলে 'প্রায় লোপ পেয়েছে' লিখলে কি ক্ষতি হতো? 'খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই।' খেয়ালীর সে-অধিকার আছে কিনা জানি নে তবে 'কার্দানি' শব্দের পাশে যে 'তালচ্যুত' ও 'রাগভ্রষ্ট' শব্দ দু'টির বস্‌বার কোনো অধিকার নেই, তা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এই রকম উদাহরণ প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরী সাধুভাষার লেখকদের চেয়ে কম সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন নি। অন্যদিকে দিশি, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহারেও তিনি সম্পূর্ণ উত্‌রে গেছেন এমন নয়। 'রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা

হয়েছিলেন, তার প্রমাণ—তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন কি কৌপীন পর্যন্ত পেলা দিয়েছিলেন।' এই বাক্যটির তৎসম শব্দগুলির মধ্যে 'পেলা' শব্দটি খাপ খায় নি। প্রমথ চৌধুরীর বিদেশী শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও মাঝে মাঝে ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন লেখেন—'বাহুবলের এক্তিয়ার'—তখন বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না; কারণ বাঙলায় 'এক্তিয়ার' শব্দটির প্রচলন আছে। কিন্তু 'খানদানী' শব্দ প্রচলিত নয় বলে 'খানদানী সত্য' কথাটির অর্থ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য নয়। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শব্দব্যবহারেও প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব মত সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারেন নি।

অবশ্য অনেক জায়গায় নিজের মত অনুসারে শব্দব্যবহারে তাঁর বিস্ময়কর সফলতার কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

প্রমথ চৌধুরী ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহার মৌখিক ভাষার অনুরূপই করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর স্বীয় মতের বিশ্বস্ত অনুসরণই লক্ষ্য করা যায়। তবে ক্রিয়াপদের ও সর্বনামপদের বানানে সর্বত্র একই আদর্শ (uniformity) রাখতে পারেন নি।

মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্য শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের হ্রস্বতা এবং খাঁটি বাঙলা-বুলি ব্যবহারের মধ্যে নিহিত নয়—তার বাক্-ভঙ্গিমা এবং ধ্বনি-প্রকৃতিও স্বতন্ত্র ধরণের। বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাকে সাধুভাষার নয়, মৌখিক ভাষারই সগোত্র বলে মনে হয়। কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

অনেক সময়, বাঙলা সাহিত্যে এমন মৌখিক ভাষারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—ক্রিয়া ও সর্বনামপদের মৌখিক রূপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও যার মধ্যে খাঁটি মৌখিক ভাষার সুর বেজে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন ঃ 'উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল এইটে থেকেই সর্পবংশ ধ্বংসের উৎপত্তি—এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গি দিলেই কালী সিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।' অর্থাৎ উদাহরণটিতে ক্রিয়া-পদের মৌখিক রূপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এর মধ্যে খাঁটি মৌখিক ভাষার সুর সৃষ্টি হয় নি। এতেও প্রমাণ হয় যে, মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্য শুধু ক্রিয়া বা সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বিশেষ বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতির ওপরও। তাই ক্রিয়া ও সর্বনামপদের রূপ বদ্‌লে দিলেই সাধুভাষাকে মৌখিক ভাষায় কিংবা মৌখিক ভাষাকে সাধুভাষায় পরিণত করা যায় না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' আছে ঃ

রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সীতা কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা॥
আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়॥

এই উদ্ধৃতির সুর (বা ধ্বনিধর্ম) খাঁটি মৌখিক ভাষার সুর। বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদের বিশেষ সংস্থান-কৌশল ও শব্দ-অর্থের সঙ্গতি, বিশেষ ধরণের শব্দচয়ন ও উচ্চারণ-ঢঙ্—ইত্যাদির জন্যেই একটা বিশেষ সুরের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ছাড়া এই ভাষাকে (বা ভাষার সুরকে) সাধুভাষায় (বা সাধুভাষার সুরে) রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। বিশেষ ভূ-সংস্থিতিতে যেমন নদীর বিশেষ গতিচ্ছন্দের সৃষ্টি হয়, তেমনি আলোচ্য ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপকরণের বিশেষ সংস্থিতি ও অন্যান্য কারণের জন্যেই এখানে এক

বিশেষ ধরণের সুর বা ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। যদি উদ্ধৃতিটির ভাষার কোনো অঙ্গে অনাচার করা হয় (শব্দের পরিবর্তন, শব্দের অবস্থানের পরিবর্তন, উচ্চারণের পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে) তবে সংশ্লিষ্ট স্থানের ধ্বনিধর্ম পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং অনিবার্যভাবেই বাক্যগত অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহের সঙ্গে তার অসঙ্গতি ঘটবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গিয়ে বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতির (এবং বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতির) বিচার করতে গিয়ে শব্দের ব্যবহার, শব্দ-অর্থের সঙ্গতি, পদের সংস্থান, উচ্চারণের ঢঙ্ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই মানদণ্ডের সাহায্যে প্রমথ চৌধুরীর ভাষার বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতি বিচার করা যাক।

(ক) ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ধার বাড়ানো নয়। যে-কথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

—কথার কথা, বীরবলের হালখাতা।

এখানে প্রথম বাক্যে 'শানিয়ে' শব্দটির রূপ ও অবস্থান, প্রথম বাক্যাংশের সঙ্গে শেষ বাক্যাংশের সংযোজন-নৈপুণ্য এবং তারই ফলে সংক্ষিপ্ততম কথাচয়নের মধ্য দিয়ে পূর্ণতম অর্থদ্যোতনা, 'ধার বার করা'—এই খাঁটি বাঙলা বুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ এমন একটি বাক্যচ্ছন্দের সৃষ্টি করেছে—যা সাধুভাষায় সম্ভব নয়। 'বর্তমানে ভাষাকে শাণিত করে তাতে তীক্ষ্ণতা আনা আবশ্যক, তার দেহায়তন ('ভার' অর্থে

'দেহায়তন' শব্দ প্রমথ চৌধুরী নিজেও অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন) বর্ধিত কর্‌বার প্রয়োজন নেই।'—এই ধরণের কথা যদি প্রমথ চৌধুরী লিখতেন, তবে তাঁর বাক্‌-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতিকে আমরা কখনই মৌখিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলতে পারতাম না। দ্বিতীয় বাক্যে 'না হলে নয়', 'যেখান থেকে পার নিয়ে এস যদি খাপ খাওয়াতে পার'—এই অতি-সহজ খাঁটি বাঙলা বুলিগুলি কথ্যভঙ্গিমা ও কথ্যচ্ছন্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। সাধুভাষায় কিংবা সাধুভাষা থেকে জোর করে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া মৌখিক ভাষায় কথাগুলি নিশ্চয়ই এমনভাবে সাজানো হতো না, এমন স্বচ্ছন্দ মৌখিক চাল থাকতো না। তৃতীয় বাক্যটির সঙ্গে কোনো দিক থেকেই সাধুভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। চতুর্থ বাক্যে 'ভগবান পবননন্দন' এই শব্দ দু'টি লেখকের শ্লেষের ভঙ্গিটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে, তাই অপপ্রয়োগ বলবো না; 'সমূলে উৎপাটন' কথাগুলির ভার বেশি বটে, তবে বাক্যচ্ছন্দকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, রসিকতা সৃষ্টির জন্যেই এখানে সাধু সংস্কৃতধর্মী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বাক্যগুলি সঙ্গে বৈপরীত্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে এছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। রসিকতার সূত্রে অন্যান্য বাক্যের সঙ্গে এই ওজন-ভারী বাক্যের সংগ্রথন বীরবলের মানসভঙ্গির লঘুসংক্রমণের উদাহরণরূপে সার্থক হয়েছে।

আসল কথা হচ্ছে, ক্রিয়াপদগুলিকে একটু মোচড় দিলেই উদ্ধৃতিটির ভাষা কখনই সাধুভাষা হয়ে উঠবে না; এ-ভাষার গতিশক্তি ও ধ্বনিপ্রবাহ সাধুভাষা থেকে আসতেই পারে না।

(খ) আর একদল আছেন, হিঁদুয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা। এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য। এ-শ্রেণীর লোক সমাজে চিরকাল ছিল এবং থাকবে। এঁরা সকলের নিকটেই সুপরিচিত, সুতরাং এঁদের বিষয়

বেশি কিছু বলবার নেই। তবে কালের গুণে এঁদের ব্যাবসা নতুন আকার ধারণ করেছে। এঁরা হিঁদুয়ানির লিমিটেড কোম্পানী করে বাজারে ধর্মের সেয়ার বেচেন—অবশ্য গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য !

—ব্রাহ্মণ মহাসভা, নানা-কথা।

এই উদাহরণের বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতি যে মৌখিক ভাষার অনুরূপ, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। 'লিমিটেড্ কোম্পানী' ও 'সেয়ার'—এই ইংরেজী কথাগুলি এমন সুন্দরভাবে সংযোজন করা হয়েছে যাতে শব্দগুলির ধ্বনিস্বভাব বাক্যগত ধ্বনিপ্রবাহের বিরোধী তো হয়ই নি, বরং তার মধ্যে সহজ স্বাভাবিকভাবে মিশে গিয়ে তাকে আরো সচল করে তুলেছে।

(গ) তারপর ঐ কুন্‌কি জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁত্‌লা,—মেঘের মত তার রঙ, আর পাহাড়ের মত তার ধড়, আর তার দাঁত দুটো এত বড় যে, তার উপর একখানা খাটিয়া বিছিয়ে মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ঐ দাঁত্‌লাটা একেবারে মত্ত হয়েছিল, তাই সে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছগুলো শুড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপড়ে ফেলে নিজের চলার পথ পরিষ্কার করে আসছিল ; তার পর কুন্‌কিটিকে দেখে সে প্রথমে মেঘগর্জন ক'রে উঠলো। তার পর সেই হস্তিরমণীর কানে কানে ফুস্‌ফুস্ ক'রে কত কি বলতে লাগল।—নীল-লোহিত।

এ-ভাষার সুরও মৌখিক সুর—এই মৌখিক সুর সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে গল্প বলার মৌখিক ঢঙ্, অতি পরিচিত মৌখিক শব্দ ব্যবহার, বাক্যগত বিভিন্ন পদের অবস্থান-বৈচিত্র্য (মৌখিক ভাষাতে আমরা নির্দিষ্ট পদ-সংস্থান-রীতি—syntax—অনুসরণ করি নে, নিজের প্রয়োজন মতো অনেক সময় তা বদ্‌লে দিই। কিন্তু সাধু ভাষার

পদ-সংস্থান-রীতি কম-বেশি নির্দিষ্ট। এখানে 'বেরিয়ে এলোর' পর 'একটা প্রকাণ্ড দাঁত্‌লা' কথাগুলি বসে মৌখিক ভাষার ঢঙই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে)। 'হস্তিরমণী' শব্দটির ভার একটু বেশি হলেও সরস ভাবের সৃষ্টি করেছে; হস্তিরমণীকে বাদ দিয়ে 'মাদী হাতির' সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ করার আগ্রহ যেমন দাঁত্‌লার থাক্‌তে পারে না, তেমনি তা শোনার আগ্রহও পাঠকের থাকতে পারে না। একমাত্র 'মেঘগর্জন' শব্দটিকে এখানে একটু শ্রুতিকটু বলে মনে হয়, অবশ্য তাতে বাক্যটির বাক্‌-ভঙ্গিমা বা ধ্বনি-প্রকৃতির গুরুতর কোনো ক্ষতি হয়নি।

এই উদাহরণে আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। বর্ণনায় যেখানে ভাবাবেগের প্রশ্রয়ে শব্দৈশ্বর্য আমন্ত্রিত হবার কথা, সেখানেও লেখকের সরস লঘুচিত্ততা উদ্ভট কল্পনাকে অবলম্বন করেছে এবং ভাবাবেগের গভীর সুরকে হাল্‌কা কথায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে—হাতির দাঁতে খাটিয়া-বিছানোর মতো অভিজাত বংশীয় ভাব প্রাকৃত শব্দের ওপর নিজ শয্যা রচনা করেছে।

পরিশেষে এই তিনটি উদাহরণেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মৌখিক ভাষায় হসন্তের আধিক্য যে-এক বিশেষ ধরণের ধ্বনিসম্পদ সৃষ্টি করে (সাধু ভাষায় ধ্বনিসম্পদ শব্দসম্ভারের ওপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে), এই তিনটি উদ্ধৃতিতেও হসন্তের আধিক্য (যদিও লেখক অনেক স্থলেই তা ব্যবহার করেন নি) সেই ধরণের ধ্বনি সম্পদ সৃষ্টি করেছে।

সে যাই হোক, এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষার বাক্‌-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতি মৌখিক ভাষার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। তবে তার ব্যতিক্রম যে কোথাও ঘটে নি এমন নয়। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষা থেকে এমন উদাহরণও তোলা যেতে পারে—যেখানে সাধু ভাষাকে (এবং তার বাক্‌-ভঙ্গিমা ও

ধ্বনি-প্রকৃতিকে) জোর করে 'কথ্য ভাষার ভঙ্গিতে ভাঙ্গিয়ে' নেওয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সমগ্র বীরবলী সাহিত্যের ভাষা বিচার করলে মনে হয়, বাক্-ভঙ্গিমা ও ধ্বনি-প্রকৃতির দিক থেকে তা মৌখিক ভাষারই অনুরূপ। অবশ্য অতিরিক্ত কলাগুণের সাধনা করার ফলে তা সবসময়ে সহজে ধরা পড়ে না।

আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা সাহিত্যিকের লেখার গুণে সর্বজনিক হয়ে উঠতে পারে। মৌখিক ভাষাকে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে তুলতে না পারলে তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রমথ চৌধুরী কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে তাঁর সাহিত্যের ভাষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। * তবে সেই আঞ্চলিক ভাষা তাঁর লেখার গুণে সর্বজনিক

---

* প্রমথ চৌধুরী ভাগীরথীর উভয় তীরের মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভাগীরথীর উভয় তীরের মৌখিক ভাষার মধ্যে আবার কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। খাস কলকাতার মৌখিক ভাষার প্রতি তাঁর তেমন অনুরক্তি ছিলো না ('আত্মকথা' দ্রষ্টব্য)। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম-নদীয়া, পূর্ব-বর্ধমান, পূর্ব-বীরভূম, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশপরগণা ও কলকাতার মৌখিক ভাষাকে একই ভাষামণ্ডলের মধ্যে ফেল্লেও তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্যের কথা তিনি অস্বীকার করেন নি।

ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপের দিক থেকে খাস কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) মৌখিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও উচ্চারণ ও ঝোঁকের (Stress) দিক থেকে পার্থক্য আছেই। কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষা শুনলে—দ্বিতীয়টির অধিকতর সুমিষ্ট ও কর্কশতাবর্জিত উচ্চারণ, সুস্পষ্ট শ্রুতিগম্যতা, স্বচ্ছন্দ বাক্যস্পন্দন ও সরস সপ্রতিভ বাক্পটুতা শ্রোতার কাছে ধরা না পড়ে পারে না। অন্যদিকে খাস কলকাতার মৌখিক ভাষায় শব্দের বিকৃতি লক্ষণীয়—ট্যাকা, কাঁঠাল, ক্যাঙালী, সুচি, নক্ষী, সেদ্ধ, ভেতরে, আঁব, বে, দোর, সকালা, বিকালা, হুকুর, পিচাশ প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারিত শব্দের দ্বারা কলকাতার মৌখিক ভাষা জর্জরিত। কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষায় শব্দের বিকৃতি নিঃসন্দেহে অনেক কম। কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণের জড়ানো উচ্চারণও শোনা যায়। প্রমথ চৌধুরী ভাষায় কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে ও কলকাতার মৌখিক ভাষার ত্রুটিগুলি বর্জন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

লিখিত ভাষার উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য বিচারের প্রত্যক্ষ উপায় না থাকলেও প্রমথ চৌধুরীর ভাষার পরিপাট্য থেকে উচ্চারণের সৌষ্ঠব সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা অনুমান করা যায় ('ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, কৃষ্ণনগরে আসার সময় তিনি ছিলেন আধ আধ ভাষী বাঙাল ; আর কৃষ্ণনগর যখন তিনি ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্পষ্টভাষী বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন)। কলকাতার মৌখিক ভাষার মতো বিকৃত উচ্চারিত শব্দ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষার বাক্যস্পন্দ ও বাক্চাতুরীও অবশ্য স্বীকার্য। এই সব প্রমাণের ওপর নির্ভর করেই বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর ভাষার ভিত্তি কৃষ্ণনাগরিক মৌখিক ভাষা।

নয়, গোষ্ঠীগত হয়ে উঠেছিলো। এই কারণেই তাঁর সাহিত্যের ভাষা সর্বজনবোধ্য বলে বিবেচিত হয় না। বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করলেই কথাটা পরিষ্কার হবে।

আমরা দেখেছি, প্রমথ চৌধুরী বাঙলার আপামর জনসাধারণ নয়, নগরের একশ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষকে নিয়ে—তাদেরই জন্যে সাহিত্য রচনা করেছেন। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন মজলিশী রসের ভক্ত। তাঁর গল্প মজলিশী খোশগল্প, তাঁর প্রবন্ধ মজলিশী আলাপ বা তর্ক, তাঁর কবিতা মজলিশী ছড়া মাত্র। তাই প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভাষাকে একশ্রেণীর নাগরিকের—তাদের মজলিশের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। মনে রাখতে হবে, পণ্ডিতী সাধুভাষাতে মজলিশ জমে না, আপামর জনসাধারণের অমার্জিত ভাষাও সেখানে অনুপযুক্ত। প্রমথ চৌধুরী তাই কৃষ্ণনাগরিক মৌখিক ভাষাকে কলাগুণের সমাবেশে মজলিশের পক্ষে স্বাভাবিক ও সচল রূপ দিয়েছিলেন। আর ঠিক সেই কলাগুণের জন্যেই প্রমথ চৌধুরীর ভাষা মৌখিক ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সর্বজনবোধ্য হয় নি। তাঁর ইচ্ছা ছিলো—সাহিত্যের ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি করে আনা, তাই তিনি কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে নিজের ভাষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন মজলিশী রসের সাধক—তাই কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে তিনি নাগরিক মজলিশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মৌখিক ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হওয়ার এই হলো কারণ। মনে রাখতে হবে, Dr. Johnson-এর মজলিশী ভাষা ও একজন সমসাময়িক সাধারণ cockney-এর ভাষা একই উপাদানে গঠিত হলেও এই জাতীয় কারণেই এক নয়।

প্রমথ চৌধুরীর মনে ভাবের প্রাচুর্য ও জটিলতা ছিলো, শুধু তাই নয়, সচেষ্ট আবর্তনশীলতার জন্যে সেই ভাব-প্রাচুর্য জটিলতর রূপ নিতো। এই নিষ্ক্রিয় সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে প্রচলিত মতবাদের সঙ্গে নিজের আবর্তনশীল মনোভাবের পার্থক্য রাখার চেষ্টা, স্ক্রু-ড্রাইভারের মতো প্যাঁচ দিয়ে বিষয় থেকে রসের সঙ্গে কষ নিষ্কাশন করার প্রবণতা তাঁর ছিলো। এই মনোভাবগত বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে তাঁর ভাষাকে খানিকটা পরিমাণে দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

যে ভাষা খুব সহজ নয়, তা নিত্যব্যবহার্যও হতে পারে না। প্রমথনাথ বিশীর মতে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষার প্রধান গুণ 'সর্ব-জনবোধগম্যতা' ও 'নিত্যব্যবহার্যতা'। সর্বসাধারণের দিক থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য যে গ্রহণযোগ্য নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাহিত্যে যাঁরা মৌখিক ভাষা চালিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন: 'গদ্যে যাহারা চলিত ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল—সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় কৃত্রিম স্বর-ভঙ্গিতে আধো টানা-টানা উচ্চারণে যে ধরণের কথাবার্তা হয়, ইহা সেই ভাষা; ইহাতে কক্‌নি-উচ্চারণযুক্ত কক্‌নি-বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ-ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনই ইহা বাঙালী-সন্তানের মুখের বুলিও নয়।' এই মন্তব্যের শেষ বাক্যটি প্রমথ চৌধুরীর ভাষা প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

এই আলোচনা থেকে কেউ যেন অনুমান করবেন না যে, আমরা প্রমথ চৌধুরীর ভাষার পক্ষপাতী নই। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রমথ চৌধুরী ভাষা সম্বন্ধে নিজের মত লেখায় সম্পূর্ণ অনুসরণ

করতে পারেন নি, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। * তবে তাঁর সাহিত্যের ধর্ম ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর ভাষাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলেই মনে হয়। তিনি যদি সর্বসাধারণের ভাষাকে অপরিবর্তিত রূপে সাহিত্যে চালাতেন—তবে তা কিছুতেই তাঁর সাহিত্যের উপযুক্ত বলে গণ্য হ'তো না। ভাষা যাতে নিজস্ব মনোভাবের সার্থক সূচক হতে পারে সেজন্যেই তিনি কৃষ্ণনাগরিক মৌখিক ভাষাকে মণ্ডনকলার সাহায্যে নোতুনতর রূপ দিয়েছিলেন। তাতে ভাষা সর্বসাধারণের পক্ষে খানিকটা দুর্বোধ্য হয়ে পড়লেও তাঁর সাহিত্যের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত না হয়ে পারে নি।

কৃষ্ণনাগরিক মৌখিক ভাষাকে কলাগুণের সমাবেশে নোতুনতর রূপ দেওয়ার অবশ্য একটি সর্বজনিক (universal) কারণও ছিল। স্বীকার করতেই হবে—'Art' ও 'Artlessness'-এর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। মানুষের মুখের ভাষাকে যখন সাহিত্যের ভাষা করা হয়, তখন তাকে শিল্পোচিত রূপ দিতেই হয়। সেইজন্যে সবদেশেই সাহিত্যিক ভাষামাত্রই মৌখিক ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক, তা অনেকটা পরিমাণে সাহিত্যিকের বিশেষ সৃষ্টি এবং সেই অর্থে কৃত্রিমও। † প্রমথ চৌধুরীর ভাষা সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে।

---

* 'কথ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর (প্রমথ চৌধুরীর) মনে খেদ ছিল। একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যে কথ্যভাষায় লিখেছি সেটা কাদের কথ্যভাষা? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারা দেশ? সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটে নি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।'
—অন্নদাশঙ্কর রায়।

† প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: 'Art ও Artlessness-এর মধ্যে আসমান জমিন ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, Styleগত।'

—বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙ্গলা,
'নানা-কথা'।

প্রশ্ন উঠতে পারে—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদির ভাষায় আর্টের অভাব নেই, অথচ তা প্রমথ চৌধুরীর ভাষা থেকে সহজতর নয় কি ? প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যের ভাষাকে শিল্পোচিত রূপ দিয়েও কি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করতে পারতেন না ? সেই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই—কোনো লেখকই নিজের ইচ্ছানুসারে ভাষারীতি বদ্‌লাতে পারেন না ; কারণ রচনারীতির মতো ভাষারীতিও লেখকমাত্রেরই মজ্জাগত। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার অধিকতর দুর্বোধ্যতার যে-কারণগুলি আমরা ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেছি, তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাঁর ভাষারীতি তাঁর 'দেহমনের চিরসঙ্গী' সুতরাং তাঁর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেই তিনি তা পরিবর্তন করতে পারতেন, এমন নয়।

এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী তাঁর ভাষারীতি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করলেন না কেন—সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। শুধু দেখতে হবে, তাঁর ভাষা তাঁর মনোভাবের উপযুক্ত হয়েছে কিনা। তা যে হয়েছে, সেকথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর ভাষাকে তাঁর সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা বলে স্বীকার করে নিতেই হবে। ক্রোধের বশে তাঁর ভাষাকে 'কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা' (সাহিত্য-সংহিতা), 'পেত্নি ভাষা' (ভারতী), 'চণ্ডালী-ভাষা' (উপাসনা), 'ইঙ্গবঙ্গভাষা' (মানসী ও মর্মবাণী) ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করা যায় বটে, কিন্তু তাতে নিজেরই কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়, যথার্থ সমালোচনা করা হয় না।

৫

সাহিত্যাদর্শ

সাহিত্যের জন্মরহস্য সম্বন্ধে সাহিত্যরসিকের কৌতূহল চিরন্তন। আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চীর শোকে আর্ত হয়ে যে শ্লোক নিজে উচ্চারণ করেছিলেন, সেই শ্লোক সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছিলো—'কিমিদং ব্যবহৃতং ময়া।' বস্তুতঃ, যে-সাহিত্য মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তা মানুষের মনের কোন্ রহস্যলোক থেকে আবির্ভূত হয়, সে-কথা জানবার জন্যে অন্ততঃ রসিকজনের ঔৎসুক্য থাকাই স্বাভাবিক।

প্রমথ চৌধুরী কোথাও স্পষ্টভাবে ও বিস্তৃতভাবে সাহিত্যের জন্মকথা ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তাঁর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত উক্তি থেকে এ-সম্বন্ধে তাঁর মতের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। 'বীরবলের হালখাতার' অন্তর্গত 'পত্র-২' নামক প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরীর মতে, দেহ ও মন নিয়ে মানুষের সত্তা—'দেহ-মন একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ।' এই দেহের যেমন প্রাণ আছে, তেমনি মনেরও প্রাণ আছে। দেহের প্রাণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়াই করে, মনের প্রাণ 'তার দীপ্ত আলোকে সমস্ত মনটাকে উদ্দীপ্ত ও উত্তপ্ত করে তোলে'; বিশ্বের দিকে তাকে বিস্তৃত করে দিতে চায়। মানুষের দেহের কথা বাদ দিয়ে যদি মনের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায়—সাধারণ 'মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত'; আর সাধারণের উর্ধ্বে যারা তাদের মন পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত। মানুষের মনের এই পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থা থেকেই সাহিত্যের জন্ম হয়। তাই

প্রমথ চৌধুরী বলেছেনঃ 'কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।'

মানুষের মনের পরিপূর্ণতা—পরিপূর্ণ জাগৃতি থেকে সাহিত্যের উৎপত্তির রহস্য আরও একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষের দেহ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে; আর মানুষের জাগ্রত মন আত্মবিস্তৃতির পথ সন্ধান করে, বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করতে চায়। সুতরাং মানুষের মনে নিঃসন্দেহে হু'টি আকাঙ্ক্ষা আছে—একটি জীবনধারণের, অপরটি আত্মবিস্তৃতির (বা আত্মপ্রকাশের)। মানুষের মন যখন পরিপূর্ণতা বা পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থা লাভ করে, তখন বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে প্রবল হয় এবং সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি হচ্ছে সাহিত্য।* সেইজন্যেই প্রমথ চৌধুরীর মতে, কবির মনের পরিপূর্ণতা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ 'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।' বলা প্রয়োজন, এই ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মনের ব্যক্তিত্ব এবং মনের পরিপূর্ণতা বা পরিপূর্ণ জাগৃতি থেকেই এই মনের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়।

এইখানে আরেকটি বিষয়ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতো, আমাদেরও সাধারণভাবে একটা ধারণা আছে যে, মানুষের অমর হবার ইচ্ছা থেকেই সাহিত্যের উৎপত্তি। মানুষ মরণশীল, যে-জীবনকে সে অতি যত্নে অতি ভালবাসায় গড়ে তোলে তা-ও একদিন অনিবার্যভাবে মৃত্যুর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে

---

* প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

'বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। এমন কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে।'—সাহিত্যে খেলা, বীরবলের হালখাতা।

সাহিত্য অমর (অন্ততঃ খানিকটা পরিমাণে), তাই মানুষ অমর হবার ইচ্ছায় (অন্ততঃ খানিকটা পরিমাণে) অনন্যোপায় হয়ে সাহিত্যকে আশ্রয় করে। প্রমথ চৌধুরীর মতে, এই ধরণের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষের জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষার দিকটাই অমরত্বের অভিলাষী, অন্যদিকে মানুষের বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই সাহিত্যের উৎপত্তির মূল। সুতরাং মানুষের অমর হবার ইচ্ছার সঙ্গে সাহিত্যের উৎপত্তির কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ নেই। তাই প্রমথ চৌধুরীর নিজের মুখেই শুনতে পাই: 'আর যা হতেই হোক অমর হবার ইচ্ছা থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় না।'

সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: 'মানুষের নানা চাওয়া আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ মিলন চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া।...এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে।'

সাহিত্যের উৎপত্তির মূলে যেমন মানুষের একটা আত্ম-বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা আছে, তেমনি তার উপাদানেরও একটা দিক আছে।* প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উপাদান হচ্ছে মানব-জীবন ও প্রকৃতি। সাহিত্যের মানবজীবন-নিরপেক্ষ কোনো স্বয়ংসিদ্ধ অস্তিত্ব

* 'বীরবলের হালখাতার' অন্তর্গত 'কথার কথা' প্রবন্ধে এই উক্তির পরিপোষক যে সমস্ত যুক্তি প্রমথ চৌধুরী দিয়েছেন, আসলে তা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। তাই আমরা সেই সমস্ত যুক্তির উল্লেখ না করে প্রমথ চৌধুরীর অন্যান্য উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে যে যুক্তি আমাদের কাছে সঙ্গত মনে হয়েছে, তারই অবতারণা করলাম। প্রমথ চৌধুরীর নিজের মনেও যে আসলে এই ধরণের যুক্তিই ছিলো, তাঁর সাহিত্যাদর্শ বিস্তৃতভাবে অনুধাবন করার পর আমাদের মনে সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তবে মানবজীবনের নিতান্ত প্রাত্যহিক বস্তুগত রূপ নয়, তার আদর্শগত শাশ্বত রূপই যে সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়, এ-সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।* সাহিত্যের মধ্যে মানুষের এই আদর্শগত শাশ্বত রূপ ফুটিয়ে তুলতে হলে গ্রহণ-বর্জন নীতিকে আশ্রয় করতে হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন; বিশ্বাস করতেন, মানবজীবনের গ্রহণযোগ্য অংশটুকুকে মনের জগতে নোতুনভাবে আকৃতি দিয়ে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হয়। তিনি বলেছেন: 'মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।' অন্যদিকে প্রকৃতিকে সাহিত্যের উপকরণ বলে স্বীকার করে নিতে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিধা নেই; তবে প্রকৃতিরও পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনশীল রূপের চেয়ে চিরন্তন আদর্শরূপকেই যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করতে হয়, তাতেও তাঁর সন্দেহ ছিলো না। তিনি বলেছেন: 'প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি।' অর্থাৎ মানবজীবনের মতোই প্রকৃতিকে সাহিত্যের উপাদান করতে গিয়ে গ্রহণ-বর্জন নীতিকে স্বীকার করে

---

* 'শাশ্বত শব্দটি প্রমথ চৌধুরী কোথাও ব্যবহার করেন নি বটে, তবে সাহিত্যের সামগ্রীকে শাশ্বত বলেই যে তিনি মনে করতেন, তাঁর সাহিত্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করবার পর সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রমথ চৌধুরী মানুষের দৈনিক জীবনকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে স্বীকার করেন না, তার অর্থ কি এই নয় যে, মানবজীবনের শাশ্বত অংশটুকুকেই তিনি সাহিত্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে চান?'

নিতে হয়। প্রকৃতির যেটুকু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করে মনের রূপ-রস, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে নোতুন করে তার এক আদর্শগত শাশ্বত রূপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণঃ 'প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিংবা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়, কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতে হবেই, এমন কোনো নিয়মে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিক্‌লি পরানো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনো অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্যসাধারণ কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য, কিন্তু জ্যামিতি বা গণিতশাস্ত্রের শাসন নয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রমথ চৌধুরীর মতে, বিরাট মানবজীবন ও প্রকৃতি থেকে উপযুক্ত উপাদান নির্বাচন করে নিতে হয় এবং সেই নির্বাচিত উপাদানকে মানসলোকে ব্যক্তিগত রূপ-রস, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে নোতুনভাবে সৃষ্টি করে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হয়। এক কথায়, মানবজীবন ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্যকে আর্টের সত্যে পরিণত করা প্রয়োজন। কারণ, মনে রাখতে হবেঃ 'বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য-নামক সত্যটি তেমন ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলে সে-সম্বন্ধে কোনোরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না।'

এই বিষয়েও প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের কোনো পার্থক্য নেই; রবীন্দ্রনাথও বলেছেনঃ 'বাহিরের জগৎ আমাদের

মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয়বিস্ময়, আমাদের সুখদুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।' অন্যত্র তিনি বলেছেন: 'আমরা বিরাট প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে তাকে মানবীয় করে তুলি, তখনি সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।'

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী—এই নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক-কাল পর্যন্ত নানাভাবে প্রচুর আলোচনা হয়েছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোনো সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় নি। অবশ্য বিজ্ঞানের মতো সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরীও সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মত স্পষ্ট ভাবায় ব্যক্ত করে গেছেন।

তিনি বলেছেন, সাহিত্য খেলনা নয়; তাই তা কারো মনোরঞ্জন করে, একথা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মতে: 'সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল

সেটিকে ভেঙে ফেলে; সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্ত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্মানিরই হোক, দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র।......এযুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ; সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং শস্তা করবার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই করো না কেন, পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।'

সাহিত্য মানুষকে শিক্ষা দেয়, এ মতেরও পরিপন্থী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি বলেছেন: 'শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক।* প্রথমতঃ, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা, শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য

---

* এই ধরণের কথা অন্যত্রও তিনি বলেছেন: 'বেত হাতে গুরুমশাইগিরি করা এযুগের সাহিত্যে কোনো লোকের পক্ষেই শোভা পায় না। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।—একথা শুধু অবতীর্ণ ভগবানের মুখেই সাজে, সামান্য মানবের মুখে সাজে না।'

—সাহিত্যে চাবুক, বীরবলের হালখাতা।

এখানে শিক্ষা অর্থে প্রমথ চৌধুরী স্কুল-কলেজের বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সমাজের জবরদস্তিমূলক নৈতিক শিক্ষার কথাই বলেছেন বিশ্ববিধানের উপলব্ধিগত শিক্ষার কথা নিশ্চয় বলেন নি। স্কুল-কলেজের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও সমাজের জবরদস্তিমূলক শিক্ষা আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করি বটে, কিন্তু বিশ্ববিধানের উপলব্ধিগত শিক্ষা অনেকটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকি।

মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ, অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে; কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা—শিক্ষাদান করা নয়//একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনি-ঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, বড়-বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তাঁর প্রমাণ—তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমন কি, কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসেবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্ম ই এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্য নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাষ্টারির ভার নেয় নি।······সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্যসৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপর শবচ্ছেদ করা—এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে ও বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-

সাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে; একথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করা নয়, আনন্দ দান করা।

এইখানে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর আসল মতটিও পাওয়া গেলো। সাহিত্য শুধু আনন্দ দেয়, তার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই—এই হলো তাঁর ধারণা। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন: 'আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ; কেননা, তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর-কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি-পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা। ও-ব্যাপার সাহিত্যে চলে না; কেননা ধর্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মী পূজার অঙ্গ, সরস্বতী পূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়; সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না।' এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে,—শুধু তাই নয়—স্বার্থ ও পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না; কেননা, খেলা হচ্ছে জীবজগতের একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও

এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্য-সৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত; কেননা, জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।' অর্থাৎ স্বয়ং লেখক ও পাঠক উভয়কে বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ আনন্দ দেওয়াই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরীর নিজের লেখায় পাঠকের মন জাগানোর মধ্য দিয়ে তার ভুল শিক্ষা সংশোধন করার প্রয়াসই লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁর নিজের লেখা যে বিশুদ্ধ আনন্দের লীলাতিশয্যে সৃষ্ট হয় নি, এটা নিঃসন্দেহ।

সুতরাং প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের আনন্দসর্বস্বতা বা রসসর্বস্বতা নীতিরই (Art for Art's sake) সমর্থক ছিলেন। এই আনন্দসর্বস্বতা বা রসসর্বস্বতা নীতির বদলে অন্য কোনো নীতি গ্রহণ করা সাহিত্যিকের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। 'সাহিত্যের বাণী যে জজের রায় নয়, পণ্ডিতের বিচার নয়, পুরোহিতেব মন্ত্র নয়, প্রভুর আদেশ নয়, গুরুর উপদেশ নয়, বক্তার বক্তৃতা নয়, এডিটারের আপ্তবাক্য নয়—এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে লেখকের আর মুক্তি নেই।'

পরিশেষে আর একটি বিষয়ও আলোচনা করা প্রয়োজন। সাহিত্য খেলাচ্ছলে বা আনন্দচ্ছলে শিক্ষা দেয় কিংবা কান্তার মতো অম্লমধুর উপদেশ দেয়, এই মতও প্রমথ চৌধুরী সমর্থন করতেন না। তিনি বলেছেনঃ 'সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করার জন্য যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারি নি।' আশা করি, একথার আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের কিছু পার্থক্য আছে। প্রমথ চৌধুরীর মতো রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : 'সাহিত্যে মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দ-রূপকে অমৃতরূপকে ব্যক্ত করিতেছে—তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।' অন্যত্র বলেছেন : 'আমাদের দেশে পরম পুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে, তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটি হচ্ছে সব শেষের কথা—এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব, এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।' কিন্তু আনন্দ দান করা ছাড়া সাহিত্য যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন করে, একথাও তিনি স্বীকার করেছেন : 'মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।' প্রমথ চৌধুরীও সাহিত্যকে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করেছেন, বলেছেন : 'বিশ্ব মানবের মনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবিমনের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম।' অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য মানুষের মঙ্গলও সাধন করে। কিন্তু আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করেন নি, তিনি তাকে সত্য সুন্দরেরই নামান্তর মনে করেছেন। তাই তাঁর মুখে শুনতে পাই : 'কবিরা মঙ্গলকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।' প্রমথ চৌধুরী যে কোনো অর্থেই মঙ্গলকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।* এ ছাড়া সাহিত্যের আর

* বরং বিপরীত উক্তিই তাঁর মুখে শুনতে পাই : 'সাহিত্য কারও মঙ্গলের জন্য নয়।'
—সাহিত্যে চাবুক, বীরবলের হালখাতা।

কোনো উদ্দেশ্য (যেমন শিক্ষাদান, ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধন ইত্যাদি) আছে বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। এই হলো সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ও গরমিলের বিভিন্ন দিক।

সাহিত্যের দু'টি দিক আছে—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে কোনোটিকে মুখ্য আর কোনোটিকে গৌণ করে দেখেন নি প্রমথ চৌধুরী। বস্তুতঃ, সাহিত্যকে তিনি একটি 'মানুষ' বলে মনে করতেন ; আঙ্গিক তার 'দেহ', ভাব (বা বিষয়বস্তু) তার 'আত্মা'। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার যেমন আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়, আবার তেমনি আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহেরও আত্মরক্ষা অসম্ভব। আসলে একের অভাবে অপরে নিরর্থক। তাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ঃ 'যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে।' অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সমমূল্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সে যাই হোক, সাহিত্য রচনা তখনই সার্থক, যখন উপযুক্ত বিষয়বস্তু উপযুক্ত আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মনে রাখতে হবে, বিয়ের বরণডালা চিত্রশোভিত না হলে তাতে বরণের ধান-দূর্বা রাখা চলে না ; শিল্পীর ছবি আঁকবার রঙ নারকেলের মালায় রাখা অসঙ্গত। আসল কথা, সৌন্দর্যমাত্রই সামঞ্জস্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য-সৌন্দর্যও বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই সার্থক সাহিত্য রচনা করতে হলে একদিকে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের প্রসাধনের দিকে, অন্যদিকে তাদের সুন্দর সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের এই দুই দিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি ভাবের ঐশ্বর্যে ও আঙ্গিকের সৌন্দর্যে তাঁর রচনাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। অন্যদিকে বিষয়বস্তু ও

আঙ্গিকের সুসামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।/ আসলে এই দু'টি জিনিসকে পৃথক করে দেখারই তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন: 'ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনও দার্শনিকের জানা নেই।' এই উক্তির মধ্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সম্বন্ধ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মত সুপরিস্ফুট এবং সেই মতের মধ্যে সর্বাধুনিক চিন্তারই পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক ক্রোচেও এই ধরণের মতই পোষণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আঙ্গিককে তার বিষয়বস্তু থেকে পৃথক করে দেখার বিরোধী ছিলেন না, এই বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য ছিলো। তিনি বলেছেন: 'তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে—ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য, ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা।' এই উক্তির মধ্যেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে পৃথক করে দেখার ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যকে অনেকে নৈসর্গিকী প্রতিভার ফল বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস, অনুশীলনের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি কবা যায় না; তার জন্যে জন্মগত বা ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা থাকা চাই। শেলী, কীট্‌স্, প্রভৃতি কবিগণ এই মতেব সমর্থক। শেলী কাব্য-রচনার পশ্চাতে 'some invisible influence', কীট্‌স্ 'The Magic hand of chance' দেখতে পেয়েছেন। আবার আরেক দল সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে

অনুশীলন এবং চিন্তাসাপেক্ষ বলে মনে করতে দ্বিধা করেন না। তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির মূলে দৈবশক্তির প্রভাব স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এই দুই দলের অতিরিক্ত আরেকটি দল অছে। তাঁরা মধ্যপন্থী; তাঁদের মতে, সাহিত্য একদিকে যেমন নৈসর্গিকী প্রেরণার ফল, অন্যদিকে তেমনি চর্চার ওপর নির্ভরশীল। যাঁর সাহিত্য রচনার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা আছে, অথচ চেষ্টা ও যত্ন নেই, তিনি কখনও যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জন্মগত সাহিত্য-প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনও সম্ভব বলে তাঁদের ধারণা।

প্রমথ চৌধুরী এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে যেমন নৈসর্গিকী প্রেরণাকে স্বীকার করেছেন, তেমনি স্বীকার করেছেন সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তাকে। তিনি একদিকে বলেছেন: '···সাহিত্য গড়বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার স্থলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই।' অন্যদিকে বলেছেন: 'সাধনা ব্যতীত কোনো আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না।'* কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যিকই সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নিজেদের নৈসর্গিকী প্রতিভার ওপর নির্ভর করেন, কোনোরূপ চর্চার প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা স্বীকার করেন না। তাই প্রমথ চৌধুরী দুঃখ করে বলেছেন: 'লেখা আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে, কাজও নয়, খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ, খেলার ভিতর

---

* এই ধরণের কথা প্রমথ চৌধুরী অন্যত্রও বলেছেন: 'এ কালের অনেক লেখকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যিক হবার জন্যে একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারই যথেষ্ট, শিক্ষাদীক্ষার কোনোরূপ আবশ্যক নেই; কেননা, তাঁদের লেখা পড়ে বোঝা যায় না, তাঁরা তাঁদের নৈসর্গিকী প্রতিভা ব্যতীত অপর কিসের উপর নির্ভর করেন। মহর্ষি চরকের শিষ্য অগ্নিবেশ বলেছেন যে, যে সকল চিকিৎসকের গুরুর নাম কেউ জানে না, যাঁদের কোনো সতীর্থ নেই, তাঁরা দ্বিজহব বায়ু-ভক্ষকাঃ।'

—টীকা ও টিপ্পনি, বীরবলের হালখাতা।

যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, সে লেখায় তা নেই,—অপরদিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তাতে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা, যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়তে চাই বলে আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ন্তর নেই। অথচ একথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ না-ও করতে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠ্‌ছে। ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনিই হয়।'*

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যানুশীলনের দিকটাকে একবারে অস্বীকার না করলেও সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে দৈবশক্তির প্রভাবকেই বিশেষ মূল্যবান মনে করেছেন: 'শুনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব-রস-দৃশ্য-বর্ণ-ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবন সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া তুলেন। বড়ো বড়ো লোকেরা যে বড়ো বড়ো কাজ করেন সেও এই ভাবে। যেখানকার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিত হইয়া যায়, একটি সুসম্পূর্ণ কার্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়।'

---

* অন্যত্র তিনি বলেছেন: সংগীতের মত লেখা-জিনিষটেও যে আর্ট, এ জ্ঞান আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল। সকল আলঙ্কারিক এক বাক্যে বলে গেছেন যে, কাব্যরচনা করবার জন্য দু'টি জিনিষ চাই—প্রথমত, প্রাক্তন সংস্কার; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা।'—

—টীকা ও টিপ্পনি, বীরবলের হালখাতা।

এইবার প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ বিচার করে দেখা যাক। আমরা পূর্বেই বলেছি, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা অলৌকিক নয়, অনন্যসাধারণ। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ভাব, চিন্তা, ভাষা ও আঙ্গিকের নব্যতা ও স্বাতন্ত্র্য যে সুপরিস্ফুট—তা-ও এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে প্রমথ চৌধুরীর এই স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য ও নব্যতার পটভূমিকায় যদি তাঁর সাহিত্যাদর্শ বিচার করি, তবে নিরাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বস্তুতঃ, সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতামতের মধ্যে চিন্তার নব্যতা বা স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না। যাঁর ভাষাদর্শ বিপ্লবাত্মক, তাঁর সাহিত্যাদর্শ এমন গতানুগতিক হওয়া খুবই বিস্ময়কর নয় কি?

প্রমথ চৌধুরীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। কিন্তু সাহিত্যা-দর্শের দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে রবীন্দ্রপন্থী বলেই মনে হয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ও কবিগুরুর মতামতের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। তাতে প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যের স্পর্ধা নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির পূজারী, বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধী। অন্যদিকে তিনি সাহিত্যে আনন্দবাদের সমর্থক। সুতরাং তাঁর কাছে সাহিত্যের আনন্দ নিঃসন্দেহে হৃদয়ানন্দ। সেই জন্যেই তাঁর সাহিত্যালোচনায় বারবার হৃদয়ের কথা পাই। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তির পূজারী, হৃদয়বৃত্তির বিরোধী। তাই তাঁর পক্ষে সাহিত্যকে হৃদয়ানন্দসর্বস্ব মনে করা খুবই অস্বাভাবিক। তিনি যে সাহিত্যের আনন্দকে জ্ঞানানন্দ মনে করেন নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর মতে, সাহিত্যে

মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে। বলা বাহুল্য, খেলার আনন্দ জ্ঞানানন্দ নয়, হৃদয়ানন্দ (অবশ্য play of fancy or moodও হতে পারে)। তবে তিনি কোথাও হৃদয়ের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন নি, মন বা আত্মার কথাই বলেছেন। সে যাই হোক, যিনি সর্বদা হৃদয়কে বিদ্রূপ করতে ইতস্ততঃ করেন নি, যিনি কি সাহিত্যে কি জীবনে চিরকাল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন—সেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শের ক্ষেত্রে হৃদয়ের কাছে এই আত্মসমর্পণ তাঁর সাহিত্যিক ধর্মের বিরোধী বলেই আমাদের কাছে মনে হয়। আরো একটি মজার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আলোচনায় পরিশেষে ভূমায় গিয়ে পৌঁচেছেন, প্রমথ চৌধুরী ভূমার কথা না বললেও পরমাত্মার কথা টেনে আনতে বাধ্য হয়েছেন ('সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যুগধর্মের পূজারী এবং সমস্ত রকমের সবুজ ও নবীন মতবাদের উৎসাহস্থল প্রমথ চৌধুরীর মুখে কি এই ধরণের কথা আশা করা যায়?

ওস্কার ওয়াইল্ড, ওয়াল্টার পেটার, ক্রোচে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মতো সাহিত্যিকগণ 'Art for Art's sake' মতবাদে বিশ্বাসী। অন্যদিকে টলষ্টয়, বার্ণাড শ, চেষ্টারটন্ ইত্যাদি সাহিত্যিকগণ 'Art for Art's sake' মতবাদে বিশ্বাসী নন; তাঁরা সাহিত্যের নীতি-গর্ভতা (moral character of art) ও উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক হিসাবে কম-বেশি শ' ও চেষ্টারটন্‌পন্থী ('সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য); সুতরাং তাঁর পক্ষে 'Art for Art's sake' নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া অযৌক্তিক। সত্য কথা বলতে কি,—যিনি বাঙলা সাহিত্যের গণধর্ম অবলম্বন করাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি ('বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধ),

আধুনিক চুট্‌কি সাহিত্যকে সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হন নি ('চুট্‌কি' ও 'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধ), নব-সাহিত্যের গঠনের প্রশংসা করতে ইতস্ততঃ করেন নি ('বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য' প্রবন্ধ), কল্লোল-গোষ্ঠীর বিদ্রোহী সাহিত্যকে আশীর্বাদ জানাতে ভয় পান নি—সেই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত মোটেই প্রগতিশীল বলে মনে হয় না।

সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতামত যা-ই হোক না কেন, তাঁর আলোচনার ভঙ্গি সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরণের/ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য সামান্যই, কিন্তু তাঁদের মত-প্রকাশের ভাষা ও পদ্ধতির পার্থক্য অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথের' যে-কোনো প্রবন্ধের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতার' অন্তর্গত 'খেয়াল খাতা' ও 'সাহিত্যে খেলা' নামক প্রবন্ধ দুইটির তুলনা করে দেখলেই সে-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এই সমস্ত কারণেই, কোনো কোনো সমালোচকের মতে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য রচনারীতির চমকপ্রদ অভিনবত্ব, বিষয়বস্তুর নব্যতা নয়।

আর একটি কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য বুদ্ধিপ্রধান, সেখান থেকে হৃদয় প্রায় নির্বাসিত। তাই হৃদয়গত আনন্দবাদের দিক থেকে তাঁর নিজের সাহিত্যই বিশ্লেষণ করা যায় না। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের আলোকে তাঁর স্বরচিত সাহিত্যেরই দিগ্‌দর্শনী সম্ভব নয়—এমতাবস্থায় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের মূল্য নিঃসন্দেহে খর্ব হয়ে গেছে।

একদল সমালোচকের বিশ্বাস, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি উৎকৃষ্ট রচনা-সাহিত্যের (Literary Essay) উদাহরণ। এই ধরণের বিশ্বাস সমর্থনযোগ্য কিনা বিচার করে দেখা যাক।

রচনা-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঃ

রচনা-সাহিত্য দীর্ঘ হয় না; অবসর সময়েই তা পড়ে শেষ করা যায় ও সমগ্রভাবে মনেও রাখা যায়।

রচনা-সাহিত্য যুক্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলামূলক (system-wise) নয়। তাতে কতকগুলি বিষয় পাশাপাশি সমাবেশ করা হয় বটে, কিন্তু যুক্তি-পরম্পরার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়গুলি গ্রথিত করা হয় না। তার মধ্যে কোনো বক্তব্যের বিশ্লেষণই দেখা যায়, তা বিচার বা প্রমাণ করার চেষ্টা দেখা যায় না। রচনা-সাহিত্য পড়ে মনে হয়, যেন ঘটনাক্রমেই এমন কতকগুলি ভালো ভালো কথা আনন্দের সঙ্গে বলা হচ্ছে যা আমরা ঠিক সময়ে ভাবতে পারি নি।

রচনা-সাহিত্যে কোনো বিশেষ বস্তু নিয়ে গবেষণা না থাকলেও তার মধ্যে খাপছাড়া ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তাই শুধু থাকে না। আসল কথা, রচনা-সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পারম্পর্য খুব দৃঢ়পিনদ্ধ না হলেও তার একটা মোটামুটি শিল্পসম্মত সামগ্রিক চেহারা থাকা চাই। অন্যথায় শিল্প-সৃষ্টি হিসেবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রচনা-সাহিত্য গুরুগম্ভীর হয় না; তা লঘুপক্ষ পাখির মতো চল্‌তি হাওয়ার পন্থী, অথচ বুদ্ধির সঙ্গে থাকে তার বন্ধনহীন গ্রন্থি। এই ধরণের সাহিত্যে লেখক কোনো একটি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকেন না, তিনি মনের আনন্দে জীবন ও বস্তুপ্রবাহের দিকে তাকাতে তাকাতে হাল্‌কাভাবে উড়ে চলেন—কোনো সাহিত্যিকের ভাষায় যাকে বলা চলে : 'to glance at all things with running conceit than to insist on it.'

রচনা-সাহিত্যে জীবন ও পৃথিবীকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় এবং সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণে আবদ্ধ জীবন ও পৃথিবী খানিকটা নোতুনভাবেই রচনা-সাহিত্যে রূপায়িত হয়। সেই জন্যেই এই ধরণের সাহিত্যে একটা সৃষ্টির ভাব আছে।

রচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই যে, তাকে বস্তুধর্মী সাহিত্য বলা যায় না—বলা যায় ভাবধর্মী সাহিত্য। আলোচ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত লেখকের মনের চেহারাখানিই রচনা-সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায় বলা যায়ঃ 'অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন করিয়া একটি পরম মুহূর্তে নিভৃত নির্জনে অপর বন্ধুর নিকট নিজের অন্তরে সঞ্চিত সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার কথাগুলি অকপটে ব্যক্ত করিয়া দেয়, যেমন করিয়া হৃদয়ের নিভৃততম কক্ষের দুয়ারও উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, রচনাকারও তেমনি করিয়া পাঠকের নিকট আপনার হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া দেন। রচনার ভিতর দিয়া লেখক এবং পাঠকের ভিতরকার এই যে পরম অন্তরঙ্গযোগ, ইহা ব্যতীত রচনা সত্যিকারের সাহিত্যই হইয়া উঠিতে পারে না। রচনার প্রধান উপাদানই এই হৃদয়ের সংবাদ।' ডাঃ দাশগুপ্তের এই 'হৃদয়ের সংবাদকেই' হলওয়ার্ড বলেছেন 'egotistical element' এবং পেটার বলেছেন 'Montaignesque element'। তাই রচনা-সাহিত্যকেও এক ধরণের আত্মজীবনী বলা যেতে পেরে।

রচনা-সাহিত্যের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, বুদ্ধিতে নয়। বুদ্ধির প্রদীপ-শিখা নিয়ে রচনা-সাহিত্যের মাধুর্য উপভোগ করা যায় না, মূলতঃ হৃদয়ের অনুভূতি নিয়েই তা উপভোগ করা সম্ভব।

রচনা-সাহিত্যকে অনেকখানি ভাব ও ভাবনা, চেষ্টা ও যত্নের ফল বলে মনে হয় না, বরং হাল্‌কা মনের ও সরল বিষয়ের সহজ প্রকাশ বলেই মনে হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথাবার্তা যেমন বানানো নয়, তেমনি রচনা-সাহিত্যের মধ্যে কোনো বানানো ভাব বা ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। তাই মনটেইনের মুখে

শুনতে পাই: 'I speak unto paper as unto the first man.'। অবশ্য রচনা-সাহিত্যও যে লিখিত সাহিত্য, সে সম্বন্ধে মনে কোনো সন্দেহ জাগে না।

যাকে আমরা রচনা-সাহিত্য বা Literary Essay বলেছি, প্রমথ চৌধুরী তারই নাম দিয়েছিলেন 'খেয়ালী লেখা'/ তিনি যে এই খেয়ালী লেখার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাই 'বীরবলের হালখাতার' অন্তর্গত 'খেয়ালখাতা' নামক প্রবন্ধে। তাঁর মতে,— খেয়ালী লেখায় স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা, মৌলিক, অভিনব ও অকৃত্রিম ভাব এবং লঘু ও সহজ ভঙ্গি দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তার একটা সুস্পষ্ট চেহারাও থাকে। খেয়ালী লেখা সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন: 'কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই—তার উপর চক্‌চকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিসটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে যা আর কারও নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোনো ফল ধরে না, তখন বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি।' 'খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বন্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।' প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'এই খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদ্‌খেয়ালী লোকের কিছু কম্‌তি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব।' খেয়াল গানের মতোই খেয়ালী লেখা 'একটা সাধনযোগ্য উচ্চাঙ্গের শিল্প। 'খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই।'

রচনা-সাহিত্য ও খেয়ালী লেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা গেলো। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্য আলোচনা করি তবে তাকে সামগ্রিকভাবে রচনা-সাহিত্য বা খেয়ালী লেখা বলতে পারি নে। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধেই রচনা-সাহিত্য বা খেয়ালী লেখার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। 'ঘরে বাইরে' গ্রন্থের কোন্ প্রস্তাবটিকে রচনা-সাহিত্য বল্‌বো? 'নানা চর্চার' অন্তর্গত 'ভারতবর্ষ সভ্য কিনা?' প্রবন্ধটি অবশ্য খানিকটা 'রচনা-সাহিত্য' হয়ে উঠেছে, কিন্তু অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে কি এই ধরণের কথা বলা যায়? 'বীরবলের টিপ্পনীর' অন্তর্গত 'কংগ্রেসের দলাদলি', 'এত্তো বড়ো কিম্বা কিছু নয়', 'গুলিখোরের আবেদনপত্র', 'গর্জন-সরস্বতী-সংবাদ' ইত্যাদি কয়েকটি প্রবন্ধকে মোটামুটি রচনা-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে বটে, কিন্তু 'নানা-কথার' প্রায় সব প্রবন্ধই কি রচনা-সাহিত্যের ধর্ম-বিরোধী নয়? 'দু-ইয়ারকির' কোনো প্রবন্ধকেই রচনা-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বই পড়া' প্রবন্ধটিতে রচনা-সাহিত্যের আমেজ থাকলেও অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় কি? 'রায়তের কথা' নামক গ্রন্থকে রচনা-সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করার প্রশ্নই ওঠে না। 'বীরবলের হালখাতা' প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সংগ্রহ এবং তাতে সর্বসমেত ত্রিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের অন্তর্গত কয়টি প্রবন্ধ যথার্থ রচনা-সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তা একটু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করে দেখা যাক।

'বীরবলের হালখাতার' প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'হালখাতায়' যে জিনিসটি চোখে পড়ে সে হচ্ছে, প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি ও চিন্তার স্বাতন্ত্র্য। এখানে বাঙালী সমাজের নিষ্ক্রিয়তাকে একটা অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা আছে, চেষ্টা আছে স্বজাতিকে সক্রিয় জীবনধর্মে ও

কর্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবার। বস্তুতঃ, বাঙালীকে নিয়ে এমনভাবে চিন্তা করবার উদাহরণ কমই মেলে। প্রবন্ধটির সবচেয়ে উপভোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রস ও কষ। বাঙালীকে তিনি জড়-পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন, দেশে ক্ষত্রিয়ের অভাব সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছেন, অস্ত্রশস্ত্রকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমাদের আপ্রাণ প্রয়াসকে নিয়ে হেসেছেন, করেছেন স্বজাতির জীবনকে গাধাবোট ও বিজ্ঞতাকে জ্যাঠামি নাম দিয়ে উপহাস—ফলে প্রবন্ধটির ভাবের মধ্যে নব্যতা এসেছে, তথ্যবস্তুর মধ্যে রস এসেছে, সত্যাবিষ্কারের পথে বুদ্ধির চমক দেখা দিয়েছে; আসল কথা, ভাবের মধ্যে দ্যুতি ও ভাষার মধ্যে গতি আছে বলেই লেখাটি 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে। তবে তাকে ঠিক রচনা-সাহিত্য বলা যায় না। চিন্তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও রচনা-রীতির মধ্যে অনন্যতা থাকলেও বক্তব্যের বিচারে-বিশ্লেষণে যুক্তিধর্ম ও বস্তুধর্ম প্রাধান্য লাভ করাতেই প্রবন্ধটি রচনা-সাহিত্য হতে পারে নি। তাছাড়া, প্রবন্ধটির উপকরণ হৃদয়ের সংবাদ নয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির সংবাদ; তাই তার আবেদনও পাঠকের বুদ্ধির কাছে; হৃদয়ের কাছে নয়। 'কংগ্রেসের আইডিয়ালের' যে রচনা-সাহিত্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম, তা তার নামকরণ থেকে বোঝা যায়। বস্তুতঃ, বীরবল সুরাট কংগ্রেসের কীর্তিকলাপকে অবলম্বন করে একটু রসিকতা করবার চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনি সমসাময়িক রাজনীতির রূপ ও নিজের রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপও ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই প্রবন্ধটিকে লেখকের হাল্‌কা মনের সহজ প্রকাশ বলা যায় না। এখানে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তার মধ্যে বিশেষ কিছু মৌলিকতা নেই। 'কংগ্রেসের আইডিয়াল' খেয়ালখাতা নয়, রস-রসিকতার পথে দেশবাসীকে একটা রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার নিগূঢ় উদ্দেশ্য এর পেছনে নিহিত আছে। প্রবন্ধটির ব্যঙ্গরস যেমন পাঠককে খুশি করে,

তেমনি বক্তব্য পাঠককে ভাবায়, চিন্তা করায়। 'তর্জমায়' বর্তমান বাঙালীর সংস্কৃতিগত দো-টানা অবস্থা, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণের কুফল, যথার্থ তর্জমার সুফল, য়ুরোপীয় সভ্যতার তর্জমায় আমাদের অকৃতকার্যতা, দেশের শিক্ষাবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী আলোচনা করেছেন। আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট চিন্তাস্বাতন্ত্র্য আছে, উপেক্ষিত সত্যের আবিষ্কার আছে, paradoxical মন্তব্য আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে, আছে বীরবলসুলভ রচনারীতি। প্রবন্ধটি জ্ঞানধর্মী ও তথ্যধর্মী; তাতে বক্তব্যের বিশ্লেষণই নেই, বিচারও আছে; রসিকতা থাক্‌লেও গাম্ভীর্যের অভাব নেই। সুতরাং এই লেখাটিকেও রচনা-সাহিত্য বলার প্রশ্ন ওঠে না। 'শিক্ষার নব আদর্শ' আমাদের শিক্ষা-পাগলামি, সাহিত্যের মধ্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা, এদেশের অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের অভাব, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ, আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি, বাঙালীর জাতীয় আদর্শের ত্রিশঙ্কু অবস্থা, স্ত্রীজাতি-মুখী শিক্ষাদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ভাববার কথা আছে, তবে চিন্তার খোরাকের চেয়ে রসের খোরাকই যেন পাঠকের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। আমাদের দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের অভাব ও স্ত্রীজাতি-মুখী শিক্ষাদর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-প্রসঙ্গে তিনি যে রস-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তা সত্যিই উপভোগ্য। কোন সত্যই যেন তিনি এখানে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে চান না, কোন কথার ওপরই অতিরিক্ত জোর দিতে চান না, কোমর বেঁধে প্রমাণ করবার চেষ্টাও এখানে তেমন নেই। কিছুটা খেয়ালী বিচরণ-শীলতা প্রবন্ধটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তবে রচনা-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—সৃষ্টির সুর ও আত্মগত হৃদয়-সংবাদ (Montaignesque

element) শিক্ষার নব আদর্শে অনুপস্থিত। এক কথায়, রচনা-সাহিত্যের একটু আমেজ এর মধ্যে থাক্‌লেও লেখাটিকে সমগ্রভাবে রচনা-সাহিত্য বলা যায় না। 'যৌবনে দাও রাজটীকায়' সময়োপযোগী নব্য চিন্তা আছে। ব্যক্তির যৌবনের চেয়ে সমাজের যৌবনকে বড়ো করে দেখার মধ্যে দৃষ্টির মৌলিকতাও আছে। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরীর সামাজিক আদর্শের স্বরূপ এই লেখাটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এটি প্রবন্ধই ; এতে সৃষ্টির ভাব নেই, ভাবধর্মী মন্ময়তা নেই, হাল্‌কা চাল নেই, যুক্তির অভাব নেই। 'নারীর পত্র' ও 'নারীর পত্রের উত্তর' যুদ্ধসংক্রান্ত আলোচনা ; কিন্তু যুদ্ধকে অবলম্বন করে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম, আচরণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করাই লেখকের আসল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। তবে সেই মন্তব্যের মধ্যে চিরন্তন মূল্যের সত্যানুভূতির চেয়ে সংশয়বাদী মনের তির্যক দৃষ্টি ও লঘু বিদ্রূপ-পরায়ণতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। রচনারীতির দিক থেকে এই দুটি লেখা খাঁটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধের (critical essay) মতো নয়, ভাবের দিক থেকে ঠিক তথ্যধর্মী না হলেও আবার ঠিক ভাবধর্মীও নয়। আসলে এদের মধ্যে যুক্তিপ্রাণতা (reasoning) ও বুদ্ধিগামী মেজাজই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এদের রচনা-সাহিত্য বলবো না।

'কথার কথা', 'খেয়ালখাতা', 'মলাট-সমালোচনা', সাহিত্যে চাবুক', 'বইয়ের ব্যবসা', 'বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ', 'বীরবলের চিঠি', 'ইতিমধ্যে', 'পত্র', 'কৈফিয়ৎ', 'চুট্‌কি', 'সাহিত্যে খেলা', 'পত্র-১', 'প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস', 'টীকা ও টিপ্পনি', 'শিশু-সাহিত্য', .'সুরের কথা', 'রূপের কথা'—এই লেখাগুলিতে ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীত-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে রচনা-সাহিত্যের

কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও নানাকারণে তাদেরও রচনা-সাহিত্য নামে অভিহিত করা যায় না। 'কথার কথায়' মৌখিক ভাষার সপক্ষে ওকালতি আছে। প্রবন্ধটিতে একদিকে ভাষার উজ্জ্বলতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা, অন্যদিকে যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশ লক্ষণীয়। ভাষাগত সমস্যা নিয়ে লেখা প্রবন্ধের রচনা-সাহিত্য হয়ে ওঠার অসুবিধা আছে, এখানে তা হয়ও নি। 'খেয়ালখাতা' একটি আশ্চর্য উজ্জ্বল গদ্যরচনা। সংক্ষিপ্ত অর্থপূর্ণ কথাচয়ন, বিষয়ের অসাধারণ স্পষ্টতা, চিন্তার তীক্ষ্ণ ঋজুতা, বুদ্ধির স্নিগ্ধ প্রলেপ ও সকলের চেয়ে বড়ো কথা, অন্তরঙ্গ সাহিত্য-বোধ এই ক্ষুদ্রপরিসর লেখাটির বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে বাঙালী জাতির করুণরসপ্রিয়তা সম্পর্কে লেখকের কটাক্ষও উপভোগ্য। বস্তুতঃ, সাহিত্য-কথাকে যে এমন সুন্দর করে বলা যায়, তা ধারণা করাও সহজ নয়। কিন্তু এই ধরণের বিষয়বস্তুকে হৃদয়ের সংবাদ বলা যায় না, বলা যায় জ্ঞানের সংবাদ; এতে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলার সুযোগ থাকলেও Montaignesque element প্রকাশের উপায় কোথায়? তাছাড়া 'খেয়ালখাতার' মতো জমাট (condensed), নিটোল, শৃঙ্খলামূলক (system-wise) ও সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধকে সযত্ন সাধনার ফল বলেই মনে হয়, অনেকখানি ভাব ও ভাবনা যেন তার পেছনে কাজ করেছে। 'মলাট-সমালোচনায়' অতিবিজ্ঞাপিত বইয়ের মূল্যহীনতা, বাঙলাদেশে সমালোচনার নামে নিন্দা-প্রশংসার আতিশয্য, নবপ্রকাশিত পুস্তকের প্রচ্ছদপটের বর্ণবৈচিত্র্য, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে ত্রুটি, বাঙলা বইয়ের নামকরণে উদ্ভটতা ইত্যাদি সাহিত্যসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা দেখতে পাই। অবান্তর প্রসঙ্গ, বিদ্রূপাত্মক উক্তি, paradoxical মন্তব্য ও নানাবিধ অলঙ্কারচর্চার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটিতে বীরবলসুলভ নানা বৈশিষ্ট্যের

প্রকাশ হয়েছে। বাঙলা বইয়ের মলাট নিয়ে রচনা-সাহিত্য লেখার সুযোগ থাকলেও প্রমথ চৌধুরী এখানে অনেকটা গুরুগম্ভীর কথা বলারই চেষ্টা করেছেন। 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধে 'আনন্দবিদায়' নামক প্যারডির অভিনয়-সংক্রান্ত গোলযোগের ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের নীতিগত বিদ্রোহের আলোচনা আছে। সাহিত্যে নীতির প্রশ্নটা দীর্ঘকালের ; এই প্রবন্ধে বীরবল সে-সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। শেষদিকে বাঙালী জাতির নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে কটাক্ষ উল্লেখযোগ্য। সে যাই হোক—বিষয়গত, সুরগত ও রচনারীতিগত কারণেই লেখাটি রচনা-সাহিত্য নাম পেতে পারে না। 'বইয়ের ব্যবসার' বিষয়বস্তু তার নামেই প্রকাশ। এই প্রবন্ধটির সুর হাল্‌কা, চাল লঘু, অথচ বক্তব্য ঠিক তুচ্ছ নয়। বাঙলা বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা যদি না বাড়ে তবে বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে না—একথাটার মধ্যে একটা উপেক্ষিত সত্যের দ্যোতনা আছে। অবশ্য লেখকের প্রত্যেকটি কথা যে যুক্তিসম্মত এমন নয়, তবু মনে হয়, বইয়ের ব্যবসা-সংক্রান্ত কতকগুলি কথা যেন আনন্দ ও সরসতার সঙ্গে বলা হয়েছে। মোটকথা, লেখাটি রচনা-সাহিত্যের কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। 'বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ' সাহিত্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা। প্রমথ চৌধুরীর মতে, এযুগের নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম গ্রহণ করেছে। সাহিত্যের এই নবধর্ম সম্পূর্ণভাবে যুগোপযোগী বলেই তাঁর বিশ্বাস। এই প্রবন্ধটিও জ্ঞানসমৃদ্ধ, যুক্তিমূলক (নবসাহিত্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি যে চিত্র-শিল্পের কথা আলোচনা করেছেন, তাতেও যুক্তিপ্রবণতার পরিচয় আছে) ও বিশ্লেষণাত্মক। সবচেয়ে বড়ো কথা, এখানে লেখকের সাংঘটিক দৃষ্টিভঙ্গি (synthetic outlook) নয়, বিচারধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিই (critical outlook) আত্মপ্রকাশ

করেছে ; বীরবলের সাহিত্যানুভূতির নয়, সাহিত্য-বিচারেরই পরিচয় আছে। যে লেখায় উপভোগের চেয়ে বিচারের প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠেছে—সেখানে রচনা-সাহিত্যের উদ্ভবের সম্ভাবনা কোথায় ? 'ইতিমধ্যে' নামক প্রবন্ধটি ইতিমধ্যে কিছু লিখে দেওয়ার জন্যে পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধ নিয়ে লেখা। সামান্য একটি কথাকে অবলম্বন করে যে চিন্তাগুলি লেখকের মনের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে তা-ই সহজ, সরল ও সরসভাবে তিনি এখানে বলে গেছেন। প্রবন্ধটিতে লেখকের মেজাজ সম্পূর্ণরূপে রচনা-সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী। উপযুক্ত স্থানে রস-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অলঙ্কারের ছিটেফোঁটা, চিন্তার চল্‌তি হাওয়ায় সহজভাবে উড়ে চলা, প্রমাণসিদ্ধ কথা নয়—প্রত্যয়সিদ্ধ কথা বলার প্রয়াস সমস্ত লেখাটির মধ্যে কম-বেশি রচনা-সাহিত্যের আমেজ ফুটিয়ে তুলেছে। 'পত্র-১', 'পত্র-২', 'কৈফিয়ৎ', 'বীরবলের চিঠি' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে 'সবুজ-পত্র' সম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসা ও আলোচনার সমালোচনা স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যেও দরকারী ভাব ও সরকারী মেজাজের পরিচয় আছে বলে তাদের রচনা-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলার প্রশ্নই জাগে না। 'চুটকি' এবং 'টীকা ও টিপ্পনিতে', সাহিত্য বিষয়ক ইতস্ততঃ মন্তব্য আছে। সেই সব মন্তব্যে প্রমথ চৌধুরীর নব্যচিন্তা, বিদ্যাবুদ্ধি ও তির্যক মনোভাবের পরিচয় আছে, আছে 'বিজাতীয়' সাহিত্যিকদের মতামত নিয়ে 'লক্‌ড়ি' খেলার চেষ্টা। প্রবন্ধ দুটি মন্ময় সাহিত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। 'প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস', 'সাহিত্যে খেলা' ও 'শিশু-সাহিত্য' সাহিত্য-বিষয়ে সুন্দর আলোচনা। লেখক শুধু সাহিত্যিক নন, তিনি যে সাহিত্য-জিজ্ঞাসু—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই প্রবন্ধগুলি। ঋজু চিন্তা, গাঢ় ভাবুকতা, স্পষ্ট ধারণা ও প্রাঞ্জল রচনারীতি থাকলে জ্ঞানগর্ভ, তথ্যাশ্রয়ী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধও যে

কতটা সুখপাঠ্য ও সাহিত্যস্বাদবিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ-স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি রচনা-সাহিত্যের কোঠায় না পড়লেও সাহিত্যের কোঠায় নিশ্চয়ই পড়ে। 'সুরের কথাতে' সঙ্গীতপ্রিয় প্রমথ চৌধুরী সুরজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বিলিতি সঙ্গীত ও হিন্দু-সঙ্গীতের পার্থক্য নির্ণয়ে তাঁর আশ্চর্য সফলতা এই বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'সুরের কথা' লেখকের অনেকখানি ভাবনার ফলে রচিত। এই প্রবন্ধটিকেও রচনার সম্মান দেওয়া যায় না। 'রূপের কথাতে' রূপজ্ঞান বা sensuousness-এর সপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। এই ধরণের নিটোল সর্বাঙ্গসুন্দর প্রবন্ধ বাঙলা-সাহিত্যে সুলভ নয়। তবে এতেও রচনা-সাহিত্যের অধিকাংশ উপাদান নেই।

পরিশেষে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্যসংক্রান্ত বীরবলী প্রবন্ধগুলির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাঁর প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ হলেও তথ্যভারাক্রান্ত নয়। তাই তথ্যভারাক্রান্ত প্রবন্ধের স্বাদের সঙ্গে পরিচিত পাঠক ও সমালোচকেরা প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ পড়ে খুশি হন না। অন্যদিকে বীক্ষণ-স্বাতন্ত্র্য, চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য ও লিপি-স্বাতন্ত্র্য প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের তথ্যের মধ্যে এমন স্বাতন্ত্র্য এনে ফেলেছে যে, পাঠক বা সমালোচকের কাছে তা অতথ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু বীরবলী প্রবন্ধের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরা অতথ্যের অপবাদ (paradox-এর কথা মনে রেখেও) দিতে নিঃসন্দেহে লজ্জিত হবেন।

'আমরা ও তোমরা', 'নোবেল প্রাইজ', 'সবুজ-পত্র', 'বর্ষার কথা' ও 'ফাল্গুন' প্রমথ চৌধুরীর মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টি। 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধে antitheis-এর চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য, অভিনব

সত্যাবিষ্কারের বিস্ময়, সংক্ষিপ্ত বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণের তীক্ষ্ণাগ্রতা, প্রচ্ছন্ন পরিহাসের প্রসন্নতা পাঠকের মনকে তৃপ্ত করে। বস্তুতঃ, ভাবকল্পনার অনন্যতা ও রূপকর্মের অভিনবতা এই লেখাটিকে রচনা-সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 'আমরা ও তোমরার' হীরকদ্যুতি উপভোগ করতে হলে শুধু সজাগ বুদ্ধি থাকলেই চলে না, একখানি রসপিপাসু অনুভূতিশীল মন থাকাও প্রয়োজন। 'নোবেল প্রাইজ' নিঃসন্দেহে রচনা-সাহিত্য আখ্যা পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রমথ চৌধুরীর মনে যে লঘু কল্পনা ও সরস পরিহাসবোধ ঘনিয়ে এসেছে—তারই রূপায়ণ দেখতে পাই এই প্রবন্ধটিতে। স্বল্পপরিসরের মধ্যে গুরুতর চিন্তার নামে নোবেল প্রাইজের রাজটীকা লাভের সার্বিক সম্ভাবনার কৌতুকপ্রদ উল্লেখ, প্রতি পদে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলার হাস্যাস্পদ ভয়, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পরবর্তী কালে আত্যন্তিক সম্মাননার সম্ভাব্য ব্যঙ্গ-চিত্র যেমন উজ্জ্বল, তেমনি রসাল হয়ে উঠেছে। ভারসর্বস্ব যুক্তির অনুপস্থিতি, জটিল ও গভীর চিন্তার অভাব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্করণের প্রয়াসবর্জিত সরল রচনারীতির সহজ সৌন্দর্য, হাস্যস্মিত মন্ময় সুর লেখাটিকে 'বাজে কথার ফুলের চাষে' পরিণত করেছে। 'সবুজ-পত্রে' জীবন, সমাজ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপ্রিয়তার স্বীকৃতি আছে। এখানে নিরেট ভাবকল্পনার গাঢ়তা, স্পষ্ট ভাষণের প্রত্যক্ষতা, বিশ্বাসের অন্তরঙ্গতা ও অলঙ্করণের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ স্বীকার্য। লেখাটির পেছনে 'সবুজ-পত্র' নামক পত্রিকার আদর্শ ঘোষণার উদ্দেশ্য থাকলেও উপরোক্ত কারণেই লেখাটি কম-বেশি রচনা-সাহিত্যের ধর্ম লাভ করেছে। 'বর্ষার কথা' নিঃসন্দেহে রচনা-সাহিত্যের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। বর্ষা সম্বন্ধে একটা paradoxical মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক এখানে যে অনবদ্য রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তার

উপাদেয়তা অনস্বীকার্য। এখানে রস আছে, অপ-রস নেই; হাল্‌কা সুরের হাওয়া আছে, গভীর ভাবের মেঘাচ্ছন্নতা নেই; অন্তরঙ্গ অনুভূতির স্নিগ্ধতা আছে, বুদ্ধির প্রাখর্য নেই; অনায়াস রচনার সহজ সৌষ্ঠব আছে, আপ্রাণ সাধনার কষ্টার্জিত সৌন্দর্য নেই। আসল কথা, ভাবে ইঙ্গিতে রূপে রসে 'বর্ষার কথা' সমগ্রভাবে রচনা-সাহিত্য হয়ে উঠেছে। 'ফাল্গুন' প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটু কম করে এই ধরণের কথাই বলা যায়। পৃথিবীতে বসন্তের কোন কালেই অস্তিত্ব ছিলো না—এই paradoxical মনোভাবই প্রবন্ধটির মধ্যে কাজ করেছে। এতেও যেন একটা স্মিত হাসির রেশ ও স্নিগ্ধ প্রসন্নতার সুর সর্বতোভাবে ছড়িয়ে আছে। বক্তব্যকে যুক্তিধর্মী করার হাস্যকর প্রয়াসের ফলে কোন কোন অনুচ্ছেদ বেশ রসাল হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধেও লেখকের সরস অনুভূতি প্রকাশমান। মোট কথা, 'ফাল্গুনকে' রস-সাহিত্য ও রচনা-সাহিত্য বল্‌তে ইতস্ততঃ করার কিছু নেই।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে রচনা-সাহিত্য বলা যায় না। তবে তিনি যে সার্থক রচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন।

৬

গল্প-সাহিত্য

মহাকাব্য (Epic of Art) মধুসূদনের পরে আর রচিত হলো না ; তার কারণ জাতীয় জীবনের যে জাগরণ ও উন্মাদনার মধ্যে, যে প্রসার ও উন্মুক্ততার মধ্যে, যে অফুরন্ত আলো-হাওয়ার মধ্যে মহাকাব্য জন্ম নেয়—মধুসূদনের সময়ে তা আত্মপ্রকাশ করেই মিলিয়ে গেলো—মিলিয়ে গেলো স্বাদেশিকতার সঙ্কোচনমুখী 'গাধার চামড়ার' মধ্যে, জটিল হলো শতসমস্যার লতাতন্তুজালে। জাতীয় জীবনের বিপুল বিস্তার হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেলো মহাকাব্য। কিন্তু ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হলো, দেখা দিলো মধ্যবিত্ত সমাজ—তারা যোগালো নোতুন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা, আর যোগালো গল্পের খোরাক। তাই বাঙলা ছোটগল্পের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে মধ্যবিত্তের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষার স্বাক্ষর।

কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ বড়ো বেশি সঙ্কীর্ণ, তা গল্পের উপকরণ কতকাল যোগাবে, তার বিষয়-বৈচিত্র্যই বা কতখানি আনবে, এই নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয়—আমাদের জীবনের মধ্যে এত বৈচিত্র্যও আছে! সঙ্গে সঙ্গে আরও মনে হয়, লেখকের দৃষ্টির প্রসারের কথা, তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীলতার কথা। বিষয় যেখানে সামান্য সঙ্কীর্ণ সেখানে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তাকে বিস্তার দেওয়া যায়, ভাবালুতার বাষ্পে তাকে বেলুনের মতো বড়ো করে তোলা যায়—

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কাছে ভাবালুতা ছিলো বিষের মতো পরিত্যাজ্য, তাই ভাবালুতার সহযোগে বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পাদন তিনি করেন নি, তা করতে তিনি পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়ের সম্বল যেখানে কম, সেখানে পুনরাবৃত্তি করে সৃষ্টিপ্রাচুর্য দেখানো যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, বীরবল গতানুগতিকতার, একঘেয়েমির ঘোর শত্রু—নোতুনের, অভিনবের পরম মিত্র। ফলে পুনরাবৃত্তির পথে বিষয়ের বিচিত্র সম্প্রসারণ তাঁর অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে প্রতি গল্পে এমন বস্তুস্বাতন্ত্র্য তিনি কোথা থেকে আনলেন, আনলেন কেমন করে ?

তার উত্তরে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিলো অনন্য-সাধারণ, মেধা ছিলো ক্ষুরধার, বুদ্ধি ছিলো অন্তর্ভেদী, দৃষ্টি ছিলো সুদূরপ্রসারী। তা নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্কীর্ণ সমাজের সর্বত্র প্রদক্ষিণ করেছেন ; তার আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে, আড়ালে আবডালে, উপরে-নীচে, ভেতরে-বাইরে ঘুরেছেন, দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। কখনও কখনও মধ্যবিত্ত জীবনের সূত্র ধরে বা সূত্র টেনে পাড়ি দিয়েছেন অভিজাত সমাজে। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন—'চার-ইয়ারী কথার প্রত্যেক ইয়ারের কাহিনী, আহুতি ও অণুকথার প্রত্যেক গল্প, নীল-লোহিতের হরেক কিস্‌সা একটি অন্যটি থেকে পৃথক। ঘটনার ক্ষেত্র কখনও বড় কখনও ছোট ; সহরে গ্রামে, মাঠে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, বাঙলা দেশে, প্রবাসে, বিদেশে ; চরিত্র ভূত-পেত্নী, আসামী, নেশা-খোর, ভবঘুরে, পানওয়ালী, বাইজী থেকে আমীন-আমলা, কেরাণী, মধ্যবিত্ত, অধ্যাপক, প্রজা, লাঠিয়াল, বিলেত-ফেরতা, ইংরেজ গোরা, জমিদার পর্যন্ত ; রসও বহু প্রকারের—হাসি, ভয়, ঠাট্টা, করুণা, সাহস, হিংসা, নিষ্ঠা ও আভিজাত্যবোধের। এমন বিস্তারিত পটভূমিতে তাঁর লেখনী অনায়াসে বিচরণ করে। কল্‌কেতে তামাক ভরা,

ডালকুত্তাকে খাওয়ান, বাইজী বাড়ির হালচাল, লাঠিয়ালের বাবরী চুলের প্রসাধন, এই সব প্রক্রিয়া যেমন তার করায়ত্ত, তেমনি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের রীতি-নীতি, কালীবাড়ীর ধূমধাম, শিকার খেলা প্রভৃতি বড়মানুষী খেয়ালের বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আদৎ কথা এই যে প্রমথবাবু গল্পের বিষয়বোধে প্রবুদ্ধ।' এই বিষয়বোধ ও বিস্তৃতক্ষেত্রে অনায়াস মানস-বিচরণ-শক্তি সকলের থাকে না—দ্বিতীয়টি থাকলেও প্রথমটির অভাব সুস্পষ্ট, আর প্রথমটির অনস্তিত্বে দ্বিতীয়টি যে মূল্যহীন কল্পনার ফানুষই সৃষ্টি করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়-চেতনা প্রমথ চৌধুরীর প্রখর ছিলো বলেই তাঁর কোনো গল্পই ব্যর্থ নয়, বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও আমেজে পরিপূর্ণ। এটা নিঃসন্দেহে বড়ো রকমের সার্থকতার পরিচায়ক।

এখন কথা হচ্ছে, বাঙলার জীবন নিয়ে এই যে কথাকাহিনী রচনা, তাতে সমগ্রভাবে বাঙলা ও বাঙালীর কোন্ রূপ ফুটে উঠেছে? উত্তরে বলা যেতে পারে—শক্ত শাক্ত রূপ। 'বাঙালী মনের ক্ষুব্ধ বিপ্লবান্বিত কল্পনাপ্রবণতা এবং বাঙালী জীবনের নানা ডিগ্রি অনশন অপমানের দৈনিক ইতিবৃত্ত জেনেও তিনি বাঙলার প্রাণকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর গল্পে খাঁটি বাঙলা মরে নি, নূতন শক্তিতে লড়ছে পুরোনো ডাঙায়, পুরোনো কলেজার আভিজাত্য বজায় রেখে। সেখানে আজও ঈশ্বর পাটনির দু-হাত লাঠিখেলা, লাঠি লকড়ি শকড়ি ধরার জোর দ্রষ্টব্য। অনুকথা সপ্তক বইখানিতে বাঙালীর মর্যাদা আছে এবং রয়েছে শক্ত হাড়ের পরিচয়, যা দেখতে পাই তাঁর অন্য ছোট গল্পে, আহুতি জাতীয় সংগ্রহে। মাছের ঝোল, মিহি গান, বেতারের লড়াইয়ের বাজি নিয়ে মত্ত বাঙালী বাবুই সবখানি বাঙলা নয়। ক-জন সাহিত্যিক দেখিয়েছেন সাবলীল,

সংগ্রামী, সাত-আগুনে পোড়া মেজাজী বাঙলার মনকে? পল্লীর ঝিল্লিগান, করুণ খোড়ো ঘরে অভিমানিনী, কলাগাছের বেড়া, পচা পুকুর, সাংঘাতিক গ্রাম্য চক্রান্ত এবং দিবান্তে শেয়ালের কোরাস নিয়ে চিত্রিত হয়েছে বিশেষ একটি দৃষ্টির সংস্কার।' অর্থাৎ নানা সমস্যার আঘাতে আঘাতে যে বাঙলা মরণদশার মানস নিয়ে ভুগছে—সেই বাঙলাকে অন্যান্য সাহিত্যসাধকদের মতো তিনি গল্পসাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেন নি—তিনি তাতে বাঙলার সজীব প্রাণের ধারা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

তার অনেক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। 'আহুতি'তে দেখি —'সেই দিন দুপুর রাত্তিরে—যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে।…ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।…রত্নময়ীর আদেশে তারা (পাঠানপাড়ার প্রজা) ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির মারে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভেতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চেপে গেল, তারা ধনঞ্জয়ের চাকর-দাসী, আমলা-ফয়লা, দ্বারবান বরকন্দাজ যাকে সমুখে পেলে, তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায়বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল।' এখানে শাক্ত সামন্ততান্ত্রিক বাঙলার শক্ত হাড়ের পরিচয় বারেকের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, যেমন উঠেছে 'পূজার বলিতে'। সেখানে শক্তি-রূপিণী মায়ের কণ্ঠে শুনি—'আমার পেটে হয়েছে শুধু শেয়াল-কুকুর—যদি মানুষের গর্ভধারিণী হতুম, তা হলে আর তোমার চৌদ্দ পুরুষের পূজো বন্ধ হতো না।' মায়ের এই হুঙ্কার ব্যর্থ হয় নি—বঙ্কু এক কোপেই সাবাড় করেছে শত্রু এবং বন্ধু বঙ্কুকে বাঁচাতে

গিয়ে আন্দামান বরণ করেছে মায়ের যোগ্যপুত্র। আর সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুর ('সহযাত্রী')? 'যেমন লম্বা, তেমনিই চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, তাঁর বুকের বেড় অন্ততঃ ৪৮ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থূল নন। এ শরীর যে কুস্তিগীর পালোয়ানের, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না।...তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া পাগড়ী ও পায়ে পেশোয়ারী চাপলি। তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেলুম, কারণ পাঠান যে সাধু হয়, তা আমি জানতুম না; আর আমি ধরে নিয়েছিলুম যে, এ ব্যক্তি পাঠান না হয়ে যায় না। এঁর মুখে-চোখে একটা নির্ভীক বেপরোয়া ভাব ছিল—যা এ দেশের কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কারও মুখে সচরাচর দেখা যায় না।' কিন্তু আসলে তিনি বাঙালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পেশায় জমিদার। হতে পারে, এ যুগের গণতন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের কাছে এরা আর আদর্শ মানুষ নন, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিতে এরা আদর্শ মানুষ না হতে পারেন, কিন্তু শক্ত মানুয—শাক্ত মানুষ; আর ভূতে-পাওয়া কান্নায় নেতিয়ে-পড়া নির্জীব বাঙালীর চোখের সামনে এদের তুলে ধরার দরকার আছে।

'পথের পাঁচালী' অপূর্ব বই—কিন্তু এতে বাঙলার যে মূর্তি দেখি তা একটু করুণ, স্যাঁতসেঁতে, একটু বা morbid; এই কারুণিক প্যাটার্নের বদলে প্রমথ চৌধুরী আঁকলেন ঈশ্বর পাটনিকে (মন্ত্রশক্তি) —প্রয়োজনবোধে যার চোখে আগুন জ্বলেছে আর শরীরটা হয়েছে ইস্পাতের মতো। বীরবল দেখিয়ে দিলেন বাঙলার সজীব প্রাণের ধারা এখনও শুকিয়ে যায় নি—নোতুন সমাজ গঠনে এদের বাদ দিলে সমাজের হবে অনেক ক্ষতি, আর সাহিত্য যদি এদের বাদ দেয় তবে তা হয়ে পড়বে নির্জীব।

তবে অন্য দিকটাকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি, তাকে মিথ্যা বলেন নি—কিন্তু সেটাই যে সব নয়, সেটাই যে সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নয়, এই হলো প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য। আমরা তাঁর গল্পে দেখেছি—সামাজিক গোঁড়ামির যূপকাষ্ঠে বলি-দেওয়া শ্রীমতীর নিশ্চল নিষ্প্রাণ নির্বিকার মুখ—শ্বেতপাথরের দেবীমূর্তি—আর কোথাও নয়, বিয়ের বাসরে, আর তা বিয়ে তো নয় যেন দুটি Statue-র বিয়ের অভিনয় ('একটি সাদা গল্প')। আর দেখেছি ঈর্ষাপরায়ণা রঙ্গিণীর রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ দেওয়ার ভূতুড়ে ছবি ('আহুতি'), ঘোড়ার আস্তাবলে অস্থিচর্মসার মুমূর্ষু ঝোট্টন ও লোট্টনের করুণ মূর্তি ('ঝোট্টন ও লোট্টন'), যখ-দেখতে-পাওয়া রমা ঠাকুরের অন্ধ বিশ্বাসের রূপ ('যখ'), কোন্দলপরায়ণ বাঙালীর কলহের চিত্র ('নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা')—এক কথায় রোগে জীর্ণ, লোভ আর ভয়ে জর্জরিত, বিভেদ বিচ্ছেদে দুর্বল বাঙালীর মূর্তি আর পল্লী বাঙলার জঙ্গলাকীর্ণ শেওলাধরা ধ্বংসোন্মুখ ছবি তিনি ফুটিয়েছেন নিপুণ রেখায়। সুতরাং সত্যসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর ছিলো, তবে তা পরিচিত সত্যকে স্বীকার করে তৃপ্ত হয় নি, উপেক্ষিত সত্যকে আবিষ্কার করতেও চেয়েছে—চেয়েছে বাঙালীর অনির্বাণ প্রাণের আগুন খুঁজে বের করতে। এখানেই তো দেশের পুনরুজ্জীবনের পথ তিনি দেখিয়ে গেলেন।

আর এই প্রসঙ্গে তাঁর নির্বাচন-শক্তির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রেম তাঁর ছোটগল্পের উপজীব্য নয়; সাধারণ মানুষ ও তাদের প্রচলিত সুখদুঃখের কাহিনী সেখানে শুনতে পাইনে। আমরা জানি, ভূত পেত্নী নায়ক নায়িকা হয় ভূতের গল্পে, কিন্তু বাস্তব সংসারের গল্পে তাদের অবতারণা করে প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত সংস্কার ভেঙ্গে দিয়েছেন ('ফার্ষ্ট ক্লাস ভূত', 'ভূতের গল্প', 'ফরমায়েসি গল্প', 'চার

ইয়ারী কথার' শেষ কাহিনী); কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তা হাস্যকর হয়ে ওঠে নি, বরং বিশেষ আবহাওয়া ও রস সৃষ্টি করতে পেরেছে। বিশেষ করে 'ফরমায়েসি গল্পে' তর্কে বিতর্কে ধাক্কা খেতে খেতে দেব-মন্দিরে 'দুর্গেশনন্দিনীর' তিলোত্তমা গড়ে উঠলো — তাকে নিয়ে পাঠকের মন বিভোর হতে না হতেই তা আবার তর্কে বিতর্কে ধাক্কা খেতে খেতে দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়ার খুলে ভূত হয়ে মিলিয়ে গেলো; — দেখে শুনে মনে হয়, মানুষের গল্প ও ভূতের গল্পের মধ্যে বিশেষ কোনো সীমারেখা নেই, সব একাকার হয়ে গিয়ে, মধুর রস ও অদ্ভুত রস মিলে গিয়ে গল্পটি বিশেষভাবে স্বাদু ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পে নেশাখোরের সাক্ষাৎ ঘটে। রুদ্রপুরের পথে পাল্কীর বেহারারা জিরিয়ে নিতে গিয়ে এক মহা জটলা পাকিয়ে তুললো—কারণ কি, না 'বড় তামাকু সেবন', সঙ্গে গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দের আবির্ভাব ('আহুতি')। নেশাখোরের অভিনয় দেখা যায় বড়বাবুর চরিত্রে—ভদ্র মহিলাকে বে-ইজ্জত করার চার্জে জেলে যাওয়া নিশ্চিত বলে জানলেন যখন, তখন হঠাৎ তার মনে হলো—এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতলামির ভান করা। 'মদ না খেয়ে মাতলামির অভিনয় করা, যখন দেহের কলকব্জাগুলো সব ঠিক ভাবে গাঁথা থাকে, তখন দেহকে বাঁকানো চোরানো দোমড়ানো কোঁকড়ানো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলোকে এক মুহূর্তে ছড়িয়ে দেওয়া অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু হাজার কষ্টকর হলেও আত্মরক্ষার্থে, যতক্ষণ না তিনি পাহারাওয়ালা কর্তৃক ধৃত হন, ততক্ষণ বড়বাবুকে এই কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল ('বড়বাবুর বড়দিন')।' এই তো গেলো দিশি মাতালের কথা; সাহেব মাতালও বাদ যায় নি। 'গাড়ীতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্যন্ত অর্থাৎ

যতক্ষণ হোঁস ছিল, ততক্ষণ মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্যন্ত ঠিক বোতলের মত। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মত হয়েছে, কিম্বা শরীরটা বোতলের মত বলে সে মদ খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি করতে পারলুম না। ······সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাসছিল ও কাঁদছিল। হাসছিল—বিড় বিড় করে কি বকে, আর কাঁদছিল—পরলোকগতা সহধর্মিণীর গুণকীর্তন করে। সে যাত্রা গাড়ীতে প্রথমেই মানব-জীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম ('ছোটগল্প')।'

জমিদার চরিত্রও প্রমথ চৌধুরী টেনে এনেছেন তাঁর গল্পে। সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুর—বাঙলার জমিদার ছেলেদের মধ্যে বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ('সহযাত্রী'); রুদ্রপুরের রায়বাবুরা, বিশেষ করে উগ্রনারায়ণ—তার মতো সাহসী পুরুষ রায়বংশে কখনও জন্মগ্রহণ করে নি ('আহুতি'); মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয়—তার বৈঠকখানায় তাকে ঘিরে থাকতো ইয়ারবক্সীর দল ('ফরমায়েসি গল্প'); দেনার দায়ে বিক্রী-হয়ে-যাওয়া জমিদারির অধিকারিণী—তার দর্প আপন সন্তানকে আন্দামান পাঠাতে দ্বিধা করে নি ('পূজার বলি') ইত্যাদি কত জমিদার চরিত্রই না আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও শক্তিমাহাত্ম্য প্রমথ চৌধুরীকে আকর্ষণ করেছিলো, সন্দেহ নেই।

আর আছে আসামী ও চোর। কুলদাবাবু ও ছন্নুর বাবার মর্মস্পর্শী চিত্র পেয়েছি 'জুড়িদৃশ্যে'—তারা দুইজনেই আন্দামান-ফেরত; খুন যে করে নি, খুনের দায়ে তার আন্দামান বাসের কাহিনী শুনেছি 'পূজোর বলিতে'। এদেরই পিঠ পিঠ আসে প্রবঞ্চকের কথা। এদলের পাণ্ডা ধনঞ্জয় সরকার—ইংরেজের

আইনের সাহায্যে এবং সেই আইন বাঁচিয়ে, কি করে অর্থোপার্জন করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তার নখদর্পণে ছিলো—রায়বাবুদের মুহুরী থেকে সে হলো মোক্তার, তারপর রুদ্রপুরের জমিদার ('আহুতি')। প্রমথ চৌধুরীর চরিত্র-নির্বাচনের তালিকা থেকে বাইজীও বাদ পড়ে নি—আমরা নির্জন নীরব নিঝুম রাত্রির পটভূমিতে ঝাড়লণ্ঠনের আলোতে দেখেছি সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্ত সার-বাইজীকে ('নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা'), 'অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধিতে' দেখেছি বারবনিতাকে। বিলেত-ফেরত চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ চার-ইয়ার—তাদের চতুরঙ্গ প্রেমের কাহিনীতে দিশি আল-বোলার গন্ধ ছড়িয়ে নেই, ছড়িয়ে আছে বিলিতি চুরুটের গন্ধ—এরা যেন, অনেক সমালোচকের মতানুসারে, বিলেত-ফেরত প্রমথ চৌধুরীরই প্রতিচ্ছায়া। ভবঘুরে সীতাপতি রায়কে দেখেছি বীরবলের মৃত্যুর চার বছর আগে লেখা একটি গল্পে ('সীতাপতি রায়'), দেখেছি মন্দ-ভাগ্য কেরাণী প্রাণবন্ধু দাসকে ('অদৃষ্ট'), মুন্সেফ শ্যামলালকে ('একটি সাদা গল্প'), মজলিশী ঘোষাল আর নীললোহিতকে, উজ্জ্বল-নীলমণির ভক্ত নীলমণি গোস্বামীকে ('ফরমায়েসি গল্প'), সেটেলমেণ্ট অফিসার দে সাহেব ও অধ্যাপক কিশোরীরঞ্জনকে ('ছোটগল্প'), বন্দুকপ্রিয় অভিজাত পল্টনী সাহেবকে ('সহযাত্রী'), পত্রিকা-সম্পাদক শ্যাম ও রাজনীতিজ্ঞ রামকে ('রাম ও শ্যাম')। সুতরাং চরিত্র-নির্বাচনে প্রমথ চৌধুরী নিঃসন্দেহে মৌলিকতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু মধুর রস নয়—বিচিত্র রকমের রস; তাই কেবল রোমান্টিক চরিত্র নির্বাচন করেন নি তিনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব চরিত্র কতখানি জীবন্ত। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত, একথা অনেকেই মনে করেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের

প্রমথ চৌধুরী

জীবনালেখ্যের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের জীবনালেখ্যের তুলনামূলক বিচার করলে একটা পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। শরৎ-সাহিত্যে হৃদয়াবেগ সুস্পষ্ট ও প্রচুর—সেই হৃদয়রসই যেন চরিত্রগুলির জীবনের আলবালে, তাদের মর্মমূলে অমৃত সিঞ্চন করেছে। যে নির্মল স্নেহস্নিগ্ধ আলোকপাত প্রতি প্রভাতে সূর্যমুখীর শিরায় শিরায় শিহরণ আনে, পুলক জাগায়, প্রাণচেতনা যোগায়, প্রকাশের মন্ত্র ছড়ায়—শরৎচন্দ্রের চরিত্রে সেই আলোকপাতই দেখতে পাই। বুদ্ধিবাদীর প্রত্যাশা তাতে সম্পূর্ণ মেটে না বটে, তবু সাধারণ বাঙালী পাঠক বলেন—এইতো জীবন। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরীর গল্পসাহিত্য পড়ে তারা বলেন,—কী যেন পেলাম না, ঠিক যেন জীবনকে দেখলাম না। কেন এই অভাব বোধ? কোন্ জিনিষের অনস্তিত্ব এই ধরণের মন্তব্যের কারণ? এর উত্তরে সাধারণ বাঙালী পাঠক নিজেই বলেন—যে হৃদয় আমাদের জীবনের অনেকখানি, সেই হৃদয়ের কোনো প্রকাশ নেই বীরবলী গল্পে। তাই আমাদের মতো জীবন তাতে নেই। এই বহুপ্রচলিত কথাগুলিকে একটু যাচাই করে দেখা দরকার।

লেখকমাত্রই গল্পের কথাবস্তু ও জীবন-উপাদান দু'ভাবে সংগ্রহ করেন—হয় জীবনের বই পড়ে, নয় কাগজের বই পড়ে। টমাস হার্ডি জীবনকে জেনেছিলেন জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মোকাবিলা করে—তাঁর জীবনানুভূতি বাস্তব ও অব্যবহিত—ওয়েসেক্সের (ডরসেটসায়ার) মাটি ও সেই মাটির মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ থেকে উদ্ভুত। আর এই জীবনকে তিনি পেয়েছিলেন প্রাথমিক চিত্তবৃত্তিতে (elementary passions), মস্তিষ্কের মধ্যে নয়। এইতো গেলো গ্রামের জীবনের কথা। মার্কিন সাহিত্যিক ও. হেনরী নিজের বিচিত্র জীবনে বহু নাগরিক মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাদের

জেনেছেন। তাই তো বলা হয়ঃ 'the amazing keenness of his observation provided for his stories backgrounds taken straight from life.' আর সে-জানার কাজে তাঁর বুদ্ধি-ধর্মই কাজ করে নি, কাজ করেছে হৃদয়ধর্মও। 'The Romance of a Busy Broker' গল্পে নিউইয়র্ক সহরের ব্যস্তবাগীশ দালাল প্রেমলীলার উপসংহারে যখন নিজের বিয়ের কথাই ভুলে গেলো তখন তার স্ত্রীর চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো;—এই চোখের জলের মধ্যে কি লেখক নিজের চোখের জলও মিশিয়ে দেন নি?

আর কাগজের বই পড়ে জীবনকে পাওয়ার চেষ্টার উদাহরণও দুষ্প্রাপ্য নয়। ওয়েলসের উপন্যাসে বা শ'এর নাটকে যে চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই, তা কি সোজাসুজি জীবন থেকে নেওয়া? তাঁরা সংসারে নর-নারী দেখেছেন নিশ্চয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দেখেছেন পুঁথির জগতে। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরীর পরিবেশে তাঁরা জীবন অধ্যয়ন করেছেন, তাকে নিয়ে চিন্তা করেছেন—সেই অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে জীবনের যে abstraction লাভ করেছেন তারই ভিত্তিতে করেছেন নোতুন জীবন-নির্মাণ। আর তাঁদের চরিত্রসৃষ্টিতে হৃদয়ানু-ভূতির ছাপ কতখানি আছে? বার্ণাড শ' সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ Bernard Shaw's characters bear the mark of the conscious will which has given them birth; few among them stir us with human sympathy······Their very feelings when brought into play, seem dry and merely cerebral. সুতরাং শরৎচন্দ্র-হার্ডি-ও. হেনরীর ক্ষেত্রে যেমন এক ধরনের চরিত্রসৃষ্টি দেখলাম, তেমনি আরেক ধরনের চরিত্র-সৃষ্টি দেখলাম শ-ওয়েলসের ক্ষেত্রে।

প্রমথ চৌধুরী এ সমস্তই জানতেন। তবে তাঁর ধারণা ঃ 'জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেননা, এ গ্রন্থ সকলের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। এ গ্রন্থ পড়বার জন্য কারও পক্ষে কোনও রূপ ব্যাকরণ কি অভিধান মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, কোনও রূপ শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর এক হিসেবে, এ বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ পুস্তকের শুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে মলাট আমরা খুলতে ভয় পাই—কেননা, আমরা জানিনে যে জীবনের সামাজিক আবরণ উদ্ঘাটিত করলে তার ভিতর থেকে সাপ ব্যাঙ কি বেরিয়ে পড়বে। অপর পক্ষে কাগজের বই থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এক হিসেবে মামুলি। বড় বড় লেখকদেরই উদাহরণ দেওয়া যাক। তাঁরা অনেকেই ও-বস্তু বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কালিদাস শকুন্তলার কথা-বস্তু নিয়েছেন —মহাভারত থেকে, ভবভূতি উত্তররাম-চরিতের কথা-বস্তু নিয়েছেন রামায়ণ থেকে।' এই কারণে কাগজের বই থেকে জীবন উপাদান সংগ্রহ করতে প্রমথ চৌধুরী দ্বিধা করেন নি। লেখাপড়া যাঁর পেশা নেশা কাজ আর খেলা তাঁর পক্ষে এটাই সুবিধাজনক পন্থা। অবশ্য সংসারের জীবনও ছায়া ফেলেছে তাঁর মনের মধ্যে। এই যে মালমশলা সংগৃহীত হলো তাকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন নিজের প্রতিভা দিয়ে, পরের জিনিষ নিজের মনের উত্তাপ দিয়ে গালিয়ে নিয়ে আপন করে নিয়েছেন। তারপর গল্পসাহিত্যে যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি হলো, তা প্রমথ চৌধুরীর স্বকৃত বলেই গণ্য।

কিন্তু যে পরিমাণ হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতি হার্ডি-ও. হেনরী-শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে লক্ষণীয়, তা বীরবলের চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, তাতে লেখকের প্রাথমিক সহানু-

ভূতিটুকু পর্যন্ত নেই। আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যে যে হৃদয়বোধের প্রকাশ তাতে ভাবালুতার আবিলতা থাকে প্রচুর এবং হৃদয়বোধের প্রয়োগেও অসংযম ও মাত্রাতিরেক দেখা যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহানুভূতি আছে, আছে হৃদয়-বোধের প্রকাশ—কিন্তু তার প্রয়োগ সর্বত্রই শুদ্ধ ও সংযত—বুদ্ধির দ্বারা তাকে শোধন করে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করাই তাঁর ধর্ম।

অরক্ষণীয়া মেয়েকে নিয়ে শরৎচন্দ্র হৃদয়াবেগ উজাড় করে দিয়েছেন—সমান আবেগ নিয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীও রচনা করেছেন অরক্ষ-ণীয়া মেয়ের উপাখ্যান। শ্যামলালের শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়ের ('একটি সাদা গল্প') বিয়ের নামে যখন স্ট্যাচুর বিয়ের অভিনয় হলো, তখন লেখক চোখের জলে বক্ষ ভাসান নি, উজাড় করে দেন নি হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য। 'বর কনেতে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কাণে ঢোকে নি, তারপর হঠাৎ কাণে এল, ক্ষেত্রপতি (বৃদ্ধ বর) বলছেন, 'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' এ-কথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম।' কেন? —তা যার কিছুমাত্র বোধশক্তি আছে তিনিই বুঝবেন। শেষ বাক্যটি যেন সোজা পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে বেঁধে। অথচ গল্পটি কি না 'একটি সাদা গল্প'! এর মধ্যে নাকি কোনো নীতিকথা বা ধর্মকথা নেই, নেই কোনো সামাজিক সমস্যা! শরৎচন্দ্র একদা বীরবলকে লিখেছিলেন—'এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারও দুঃখটা গল্প করে যাচ্ছে। এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোনো সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেমনি করে। ইনিয়ে বিনিয়ে

কাতরোক্তি কোথাও নেই—অথচ কত বড় না একটা ট্রাজেডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে।' অথচ এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড ভঙ্গীটার জন্যেই প্রমথ চৌধুরীর গল্পে প্রাথমিক সহানুভূতিও অলক্ষ্য বলে সাধারণ পাঠকের মনে হয়।

'সহযাত্রী' গল্পে সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুর লেখকের সমবেদনা বা সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি—তবে সেই সমবেদনা অতি প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম, পাঠকের অনুভূতির কাছে প্রায় অনধিগম্য। তার সাধুবেশ, বন্দুকপ্রীতি ও ট্রেনে ট্রেনে খেয়ালী ভ্রমণের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করায় তার বিড়ম্বিত জীবনের বেদনা (স্ত্রীর গৃহত্যাগঘটিত) প্রায় চাপা পড়ে গেছে। সুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাগজে অতুলানন্দের কবিতা বাজে জেনেও ছেপেছেন, তার কারণ তা না করলে অতুলের মা লতিকার illusion ভেঙ্গে যাবে। আর এই লতিকা কে?—যার সঙ্গে একদিন সুরনাথের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিলো এবং যে আজও সুরনাথের আদর্শে নিজের ছেলেকে অতিমানুষ করতে চায়। গল্পটিতে 'psychology-র একটি বাঁকা রেখার' বর্ণনা পড়তে পড়তে পাঠকের হৃদয়ে একটা সূক্ষ্ম অনুরণন কি জাগে না ('সম্পাদক ও বন্ধু')? 'ট্রাজেডির সূত্রপাতে' প্রৌঢ় অধ্যাপকের কুমারী ছাত্রীর প্রতি অনুরাগের কাহিনী পরিহাসমূলক হয়েও হয় নি—গল্পস্রষ্টার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিই আড়াল দিয়ে অধ্যাপকের মোহাবেশকে বিদ্রূপের পঙ্ককুণ্ডে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। গল্প-বলিয়ে ঘোষাল। গল্প বলতে বলতে ডিগবাজি খেতে সে ওস্তাদ; তার মুরুব্বি জমিদার রায় মশায় ধমকে ওঠেন: 'ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর্, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি, তার আর আদি অন্ত নেই।' আজ তোর ঘাড়ে

রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।' তবু শেষ পর্যন্ত তার ভূত ঝাড়বার জন্যে ঝাঁটা পড়লো না (শুধু উজ্জ্বলনীলমণির একটু দাঁত-খিঁচুনি দেখা গেলো)—যদিও ঘোষালের হাতে পড়ে প্রেমের গল্প ততক্ষণে ভূতের গল্পে পরিণত হয়েছে। এতেই মনে হয়, ঘোষাল যতই মিথ্যে-বলিয়ে হোক—তার স্রষ্টার সহানুভূতি সে আদায় করেছে, তা না হলে ঝাঁটা এড়ানো তার পক্ষে সাধ্য ছিলো না ('ফরমায়েসি গল্প')। আর নীললোহিত? মিথ্যা কথনের আর্টে আর জুড়ি মেলা ভার, একমাত্র ঘোষাল ছাড়া। সত্য-মিথ্যার ভেদজ্ঞান তার লোপ পেয়ে যেতো গল্প বলার সময়ে। তবে কি সে comic figure, গোপাল ভাঁড়? লেখকের মতে তা নয়, যদি তা হতো তবে নীললোহিতের গল্প বন্ধ করার পরবর্তী জীবনের বর্ণনায় তিনি লিখতেন না—'লোকে বলে যে তিনি সত্যবাদী হয়েছেন—কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম হারিয়ে, যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন—সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা এই ভেবেই খুসি যে, তিনি এতদিনে—মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে—যা টিকে রয়েছে তা হচ্ছে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটী রক্তমাংসের যন্ত্র মাত্র।' এই মন্তব্যের মধ্যে নীললোহিত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বেদনাবোধ কি ধ্বনিত হয় নি?

প্রমথ চৌধুরী গল্পের চরিত্র সম্বন্ধে যেখানে স্নেহদৃষ্টি দেখিয়েছেন—সেখানেও সাধারণ বাঙালী পাঠক খুশি হয় নি। কারণ 'আমরা বাঙালীরা স্নেহ বলতে তেল ঘি-ই বুঝি, তাই প্রমথবাবুর সংযত প্রয়োগকে নিছক বুদ্ধির না হয় আভিজাত্যের চিহ্ন

ভাবি।' ততুপরি অনেক ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তর্ক-বিতর্ক ও অবান্তর প্রসঙ্গের তলায় চাপা পড়ে গিয়ে হৃদয়বোধের সংযত প্রয়োগও অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন প্রয়োগে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'ছোট গল্প' ও 'চার-ইয়ারী কথার' শেষ গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ছোটগল্পের' মুখবন্ধে আছে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা, উপসংহারে আছে কথামুখের আলোচনার পুনরাবর্তন—ফলে মাঝখানে প্রফেসর কিশোরীরঞ্জনের জীবনে পরস্ত্রী কিশোরীকে নিয়ে যে ট্র্যাজি-কমেডির আত্মপ্রকাশ, তার অন্তর্নিহিত কারুণ্য প্রায় চাপা পড়ে গেছে। 'চার-ইয়ারী কথার' শেষ গল্পে দাসীর গোপন প্রেমের আজীবন সাধনা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে; কিন্তু তার পরেই পরলোক-বাসিনীর টেলিফোন যোগে প্রণয়-নিবেদনের প্রয়াস সেই উৎসারিত হৃদয়াবেগকেই যেন বিদ্রূপ করতে থাকে। গল্প রচনার এই অভিনব কৌশল ও হৃদয়রসের সঙ্গে খানিকটা অম্ল-কষায় রস যুক্ত করার চেষ্টাই বীরবলী সাহিত্যকে হৃদয়ধর্মবর্জিত বলে মনে করতে বাধ্য করে। আবার কোনো কোনো গল্পে হৃদয়বোধের সংযত প্রয়োগও নেই—সেগুলি নিতান্তই বিদ্রূপাত্মক, তাতে বুদ্ধি ও ব্যঙ্গের যে ছুরি খেলা আছে, তাতে হৃদয়ের পক্ষ নেওয়াও নিরাপদ নয়—যেমন 'বড়বাবুর বড়দিনে'। একটা চরিত্রকে কেমন করে বাঁদর করে তোলা যায়—তারই একটা ভাল আদর্শ পাই গল্পটিতে। এই সব গল্পে লেখকের হৃদয়ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ যেন মারমুখী হয়ে উঠেছে। তবে প্রমথ চৌধুরীর হাতে বুদ্ধির খেলা 'পাকা খেলোয়াড়ের ছুরি খেলা' হয়েছে, 'গুণ্ডার হাতের ছোরা খেলায়' পরিণত হয় নি। কারণ তিনি ছিলেন নিপুণ আর্টিষ্ট।

অনেকে বলেন, প্রমথ চৌধুরীর গল্পে কোনো নিটোল কাহিনী নেই—অন্ততঃ শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের গল্পে

যে ধরনের কাহিনী মেলে তার অসদ্ভাব দেখতে পাওয়া যায় বীরবলের গল্পে। কিন্তু কথা হচ্ছে, গল্পের যথার্থ সংজ্ঞা কি? গল্পের অর্থ যদি হয় 'সুনির্বাচিত ঘটনাশ্রিত জীবনচিত্র' তবে প্রমথ চৌধুরীর সব গল্পই তা নয়; আর গল্প বলতে যদি 'আলাপ-আলোচনাগত খণ্ড জীবনভাষ্যও' বোঝায়—তবে প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র কথাসাহিত্যকেই গল্প বলা যায়। বস্তুতঃ, গল্পের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন—কারণ মোপাসাঁর রচনাকে যেমন গল্প বলা হয়, তেমনি এইচ. জি. ওয়েলসের রচনাকেও গল্প বলা হয়, অথচ দুইয়ের আকৃতি প্রকৃতি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'তোমার ছোট গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হালকা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এরকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভূরিভোজন ভালোবাসে—তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ—কিম্বা ভাববে ঠাট্টা।' অর্থাৎ ঘটনাশ্রিত কাহিনীর ভূরিভোজনের ব্যবস্থা বীরবলের গল্পে নেই, যেমন অধিকাংশ লেখকের গল্পে থাকে। তাই প্রচলিত অর্থে, বীরবলের অনেক গল্পকে গল্প বলা যায় কি না সন্দেহ আছে, এবং সেই সন্দেহ প্রমথ চৌধুরীর নিজেরও ছিলো। 'নীললোহিতের আদিপ্রেমের' উৎসর্গ-পত্রে তিনি নিজেই লিখেছেন—'পড়ে ফেলো, হয়ত মন্দ লাগবে না; যদিচ গল্প ক'টি পাঁচমিশালী, আর সব ক'টিকে গল্প বলা যায় কিনা, সেই বিষয়েও সন্দেহ আছে।' তবে বীরবলের নিজের সংজ্ঞানুযায়ী তা ছোট অর্থাৎ পরিমিত পরিসরের এবং তা পড়তে এডগার এলেন পো'র নির্দিষ্ট একঘণ্টা থেকে দু' ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। 'ছোটগল্প হওয়া উচিত একটি ফুলের মতো, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই'—প্রমথ চৌধুরীর গল্পের একটি চরিত্র স্বয়ং এই মত

পোষণ করে। অথচ প্রমথ চৌধুরীর অনেক ছোটগল্পে অবান্তর কথা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অন্ত নেই। এর একাধিক কারণ স্থানান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে; আর একটি কারণ এখানে বিশ্লেষণ করা যাক। আমরা জানি, গল্প রচনার দুইটি ষ্টাইল আছে—এক, পূর্ব পরিকল্পনানুযায়া রচনা—দুই, খেয়াল অনুসারে রচনা। প্রথম ক্ষেত্রে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র কাহিনী আগে ভেবে নিয়ে তারপর গল্প লিখতে বসতে হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাহিনী আগে থেকে ভেবে না নিয়ে গল্পকে আপন খেয়ালে চলতে দিতে হয়। প্রথম রীতিতে গল্পের ঘটনা ও কাহিনীর রূপরেখা স্থির থাকে বলে অবান্তর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া যায়। দ্বিতীয় রীতিতে কাহিনী ও ঘটনার ছক আগে থেকে ঠিক থাকে না বলে গল্প সেখানে এগোয় পাত্র-পাত্রীদের তর্ক-বিতর্কে ধাক্কা খেতে খেতে, নানা বিচিত্র খাতে বাঁক নিতে নিতে—তারপর সেই খেয়ালী চলন সমাপ্ত হয় একটা পরিণতির আবর্তে। গল্পের এই অভিযাত্রায় স্বাধীনতা থাকে, অতর্কিত পরিবর্তন থাকে, থাকে আপন ইচ্ছায় চলার স্বাচ্ছন্দ্য—আর তারই আশে পাশে জমে ওঠে কত অবান্তর কথা, অনাবশ্যক বিষয়। অনেকে যেমন পথে চলতে চলতে এদিক সেদিক তাকায়, থমকে দাঁড়ায়, ঝগড়া বাধায়,—যেন সময়ের তাগিদ নেই, তেমনি চলে এই ধরণের গল্প —শেষ পর্যন্ত যদি ঘাটের বদলে আঘাটায় পৌঁছোয় তবু যেন কুছ পরোয়া নেই। প্রমথ চৌধুরী এই দ্বিতীয় রীতিতে অনেক গল্প লিখেছেন—গল্পের মুক্ত স্বচ্ছন্দ বিহার আছে 'ফরমায়েসি গল্পে,' 'নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলায়', 'নীললোহিতের স্বয়ম্বরে', 'ঘোষালের হেঁয়ালীতে'। ধূর্জটিপ্রসাদের মতে, এই সব ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতা ও গতির মোড় ফেরাবার বুদ্ধিটাই মুখ্য এবং এই বুদ্ধি প্রমথ চৌধুরীর ছিলো বলেই তিনি এই ধরনের গল্প লিখতে বেশি ভালোবাসতেন।

নির্বাচন শক্তির ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার সমাবেশ ও অসাধারণ ঘটনার সৃষ্টি অসম্ভব। পাকা ওস্তাদ রাগ-ভ্রষ্টের আশঙ্কা জাগিয়ে রাগরূপ কেবল বজায় রাখেন না, ফুটিয়ে তোলেন। আর্টিষ্ট আত্ম-সমাহিত বলেই ক্ষণিক বিচ্যুতি তাঁর হস্তামলকবৎ।' সুতরাং এই ধরনের গল্পে কেন অবান্তর প্রসঙ্গ আছে এবং সেগুলি রচনায় প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্ব কতখানি তা জানা গেল।

তবে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী লিখিত গল্পেও অবান্তর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত নয়। 'প্রমথবাবুর অনেক গল্পে দেখি যিনি বলবেন (অর্থাৎ গল্পের কথক) তাঁকে নিয়ে স্বতন্ত্র গল্পের সূচনা, সেইখানে আবহাওয়ার সৃষ্টি এবং অনেক সময়ে ঘটনারও গ্রন্থি বাঁধা।' যেমন 'আহুতিতে', 'ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূতে'। 'বড়বাবুর বড়দিন', 'একটি সাদা গল্প', 'সহযাত্রী', 'পূজার বলি', 'মন্ত্রশক্তি', 'মেরি ক্রিসমাস', 'চার-ইয়ারী কথা', আগে-ভাবা পরে-লেখা গল্প, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৬

ষ্টাইল

ব্যক্তি-মানুষ গোষ্ঠী-মানুষের প্রবাহ থেকে একদিকে যেমন অবিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে তেমনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। ব্যক্তি যখন গোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তখন সে স্বাতন্ত্র্যহীন; তখন বহুর সঙ্গে তার আর পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গো ব্যক্তিকে যখন পৃথক বলে মনে হয় তখন সে আপন স্বাতন্ত্র্যে আপনি সমুজ্জ্বল। এরই নাম ব্যক্তিত্ব এবং এই ব্যক্তিত্বকে আমরা ব্যবহারিক জীবনের ষ্টাইল বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু।' এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য বা ষ্টাইল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি।

সাহিত্যের জগতে সাধকের সংখ্যা গণনাতীত। সেখানে ছোট বড় অক্ষম সক্ষম বহু মানুষের সমাগম হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের সকলেই সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পান না। যাঁর প্রতিভা নেই, প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য নেই—তিনি লেখক হিসেবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ

করতে পারেন না। প্রতিভার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যাঁর সাহিত্য-জগতে আবির্ভাব—তিনি তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব দিয়ে পাঠককে কম-বেশি বিমোহিত করতে পারেন। Mathew Prior সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন ঃ 'ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে Mathew Priorকে কোনদিন কেহ প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার করিয়াছে। তাঁহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্য-সাধারণ অমায়িক সরল হাস্যপরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা Prior-এর অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না। পাঠে তোমার রসানুভব-শক্তি চরিতার্থ হইবে এবং যখনই সেই রসের কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে Prior-কেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও Prior-এর মর্যাদা আছে।' এই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বা মর্যাদাকে ষ্টাইল বলা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ব্যবহারিক জীবনের ষ্টাইল থাকার জন্যেই বুধ-মণ্ডলীর মধ্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন,—তেমনি Mathew Prior সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। তাই সাহিত্যিক খ্যাতির অন্যতম ভিত্তি যে ষ্টাইল তার মূল কথা হচ্ছে স্বাতন্ত্র্য; Middleton Murryও বলেছেন ঃ '···idiosyncrasy is essential to style।'

স্বাতন্ত্র্য ষ্টাইলের মূলধর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য কৃত্রিম বা মিথ্যা হলে চলে না, খাঁটি হওয়া চাই। যদি কোনো ধার-করা স্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় নেওয়া হয়, তবে ষ্টাইলের মধ্যেও কৃত্রিমতা দেখা দেয়। আসলে খাঁটি সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য শুধু সাধনাসাপেক্ষ নয়, প্রকৃতিদত্তও বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যথার্থ সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য বোঝার উপায় কি? এর উত্তরে বলা যায়, যদি কোনো সাহিত্যিক

স্বাতন্ত্র্যকে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তবেই তাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে পাঠককে তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে।

ষ্টাইল একান্তভাবে ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে নৈর্ব্যক্তিক না হলে চলে না। লেখকের রচনা যদি পাঠকের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার করতে না পারে, তবে তা ব্যর্থ। মনে রাখতে হবে, নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি লেখার গুণে সার্বিকতার অনুকূল না হয়ে ওঠে, তবে তাকে পাঠক অস্বীকার করে। আর্টের সার্বিকতার (universality) গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য। অবশ্য 'সার্বিকতা' কথাটিকে 'রসবেত্তা-অধিগম্যতা' অর্থে গ্রহণ করতে হবে; কারণ রোলাঁর ভাষায়—'Art is not ren-dez-vous for all।' সে যাই হোক, শিল্পীর আত্মগত অনুভূতির চর্বণা যতক্ষণ চলে অন্তরলোকে, ততক্ষণ তার সঙ্গে সার্বিকতার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বাইরের জগতে তাকে রূপাশ্রয়ী করতে গেলেই কম-বেশি সার্বিকতার প্রয়োজন এসে পড়ে। বস্তুতঃ, অন্যের মধ্যে শিল্পী-মন যখন প্রকাশের পথ খোঁজে, তখন তাকে নির্বিশেষ ভাবব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দিতেই হয়। তাই ষ্টাইল একান্তভাবে ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ হয়েও কম-বেশি নৈর্ব্যক্তিক বা সার্বিক। Murry বলেছেন: '...highest style is that wherein the two current meanings of the word blend ; it is a combination of the maximum of personality with the maximum of impersonality. On the one hand, it is a concentration of peculiar and personal emotion, on the other it is a complete projection of this personal emotion into the created thing.'

এইবার ষ্টাইলের স্বরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। L. B. Burrows বলেছেন : 'The idea of style is essentially and immutably manner, the whole manner in which ideas are conceived and brought into the world as written words, manner of thinking, manner of feeling and manner of expression।' অর্থাৎ ষ্টাইলের তিনটি দিক আছে—বিষয়, চিন্তানুভূতি ও প্রকাশভঙ্গী। লেখককে প্রথমে কোনো বিষয় অবলম্বন করতে হয়, তারপর তাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার রসে রসায়িত করে নিজস্ব ভাবকল্পনায় পরিণত করতে হয় ও সর্বশেষে উপযুক্ত আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিষয়ের রূপ ও প্রকৃতির ওপর রচনার বৈশিষ্ট্য তথা ষ্টাইল অনেকখানি নির্ভর করে। তবে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার—এক কথায় তাঁর অন্তঃসত্তার—গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই 'Style is the man।' প্রত্যেক লেখকের অন্তর্জগতে একটা পক্ষপাতমূলক ভাবাবেগ (emotional bias) এবং বিশেষ ধরনের সংস্কার (mode of experience) থাকে—তারই প্রভাবে বিষয়বস্তু সেখানে একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। তাই 'As a quality of style, at all events, soul is a fact.' অন্যদিকে বিষয়বস্তু যেভাবে লেখকের মনে এসে জমা হয়, ঠিক সেইভাবে সেইক্রমে তিনি শব্দ চয়ন ও ব্যবহার করে থাকেন, রচনার আঙ্গিকের সঙ্গে তাই লেখকের অন্তরঙ্গ স্বভাবের একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ না থেকে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যথার্থ ষ্টাইলে উপযুক্ত আঙ্গিক—Pater-এর ভাষায়—'language faithful to the colouring of spirit'—লক্ষ্য করা যাবেই।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান আকর্ষণ তাঁর ষ্টাইল। তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয়, সেখানে আর কিছু না থাক, মৌলিকতা আছে। তাঁর যেমন নোতুন কিছু বলবার আছে, তেমনি নোতুন ঢঙে বলবার চেষ্টাও আছে। তাঁর প্রতিভাকে অলৌকিক বলতে পারি নে বটে, কিন্তু অনায়াসে অনন্যসাধারণ বলতে পারি। এই স্বাতন্ত্র্যই প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান সৌন্দর্য এবং তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদার ভিত্তি। তিনি জানতেন, 'যে-লেখার ভিতর অহং নেই সে-লেখা আর যাই হোক, সাহিত্য নয়।' অন্যত্র বলেছেন: 'সমাজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সামাজিক লোকের মতে দোষ হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোজগতে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতেই হয়। আমরা কাব্যই লিখি আর অলঙ্কারই লিখি তার ভিতর কোনই মূল্য থাকে না যদি একটি ব্যক্তিবিশেষের মনের পরিচায়ক না হয়। এই মনের বিশেষত্ব যদি এক পয়সাও হয়, তার দাম ষোল আনা।' তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে তাঁর 'অহং' প্রকাশ করতে চেষ্টার ক্রুটি করেন নি এবং প্রকৃতপক্ষে তা প্রকাশ পেয়েছেও। প্রমথ চৌধুরী নিজেই একসময়ে বলেছেন: 'আমার প্রথম লেখার ভিতরে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভিতরেও সেই গুণ অথবা দোষ আছে আর সে বস্তুর নাম হচ্ছে individuality।'

প্রমথ চৌধুরীর লেখায় স্বাতন্ত্র্য আছে, সুতরাং ষ্টাইলও আছে। সে ষ্টাইল সকলের মনোরঞ্জন করতে পারে নি এবং একসময়ে তা নিয়ে বাক-বিতণ্ডারও অন্ত ছিলো না। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে, রসবেত্তাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ * তাঁকে প্রতিভাশালী

---

* রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীকে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে ('৫ম খণ্ড) ছড়িয়ে আছে। শরৎচন্দ্রও এক চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ভক্ত বলে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নি—'আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ, একটু বেশিরকম পক্ষপাতী।'—শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।'

সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর যাঁরা স্বীকার করেন নি, তাঁরাও প্রমথ চৌধুরীকে তাচ্ছিল্য করার সাহস পান নি। এতেই প্রমাণ হয়,—ভাবে যে দ্যুতি, ভাষায় যে গতি থাকলে রচনা সাহিত্যের মর্যাদা পায় † প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তার অভাব ছিলো না। অতএব প্রমথ চৌধুরীর লেখার স্বাতন্ত্র্যকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাহিত্যিক খ্যাতির অনুকূল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। সেই অর্থে তা কম-বেশি সার্বিকও।

প্রমথ চৌধুরীর ষ্টাইলকে কেউ কেউ কৃত্রিম বলেছেন। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে ষ্টাইল পরিচিত বা গতানুগতিক নয়, তাকে স্বীকার করার কুণ্ঠা সাধারণ পাঠকের হওয়া স্বাভাবিক। প্রমথ চৌধুরীর মনের ধাত ও সাহিত্যিক মেজাজের মধ্যে একটা অনন্যতা আছে, অনন্যতা আছে চিন্তানুভূতির প্রণালীর মধ্যে। তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তুও নোতুন ধরনের। এই সমস্ত কারণে তাঁর ষ্টাইলের মধ্যে এমন একটা রূপ ফুটে উঠেছে—যা সাধারণ পাঠকের কাছে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের প্রকৃতিকে একটু সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলকে অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করে নিতেই হয়।

মনোজীবনের আলোচনায় আমরা প্রমথ চৌধুরীর 'মনের চরিত্র' ব্যাখ্যা করেছি। সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গেও তাঁর সাহিত্যিক মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তা থেকে সংক্ষেপে এইটুকু পুনরাবৃত্তি করা যায় যে, প্রমথ চৌধুরীর একটি বিশেষ মানসিক দৃষ্টি ছিলো। গতানুগতিক পদ্ধতিতে তিনি কোনো কিছুকে বিচার

---

† উল্লেখ যোগ্য :
'আমি পারি না পারি সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি।'—প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র—বৈশাখ সংখ্যা, ১৩২৬।

করতে প্রস্তুত বা অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর মন চল্‌তি মতের সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে পারতো না। * মনোদৃষ্টিকে তিনি অনন্যসাধারণভাবে পরিচালিত কবতেন। ফলে বিচারে বিশ্লেষণে উপভোগে সৃষ্টিতে তাঁর 'নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ', নিজের চিন্তা ও অনুভূতিসম্পন্ন অন্তঃসত্ত্বার বা soul-এর বিশেষ অভিব্যক্তি উপলব্ধি করা যায়। সেইজন্যেই তাঁর মতামতেরও একটা মূল্য দেখা দিয়েছে—'কারণ মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পেছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।' সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরীর এই বিশেষ মনটিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং তা অনুধাবন করতে পারলেই তাঁর ষ্টাইলের স্বরূপ বোঝা সহজ হবে।

প্রমথ চৌধুরীর মনের প্রবণতা ছিলো বিচিত্রমুখী। বহুজ্ঞান-সাধনা ও জ্ঞানের অন্তর্ভেদী রূপ বিশ্লেষণই তাঁর জীবনের প্রধান নেশা ছিলো। তাই বিচিত্র ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। দেশ, সমাজ, যুগ, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি কোনোদিকেই তাঁর আগ্রহের অভাব ছিলো না। তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু প্রেম নয়; মানুষের অন্যান্য বৃত্তিও, এমন কি অদৃষ্টকে নিয়েও তিনি গল্প লিখেছেন। তাঁর কাব্যের চারণ-ক্ষেত্র দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে, বহুকালব্যাপী বহুদেশবিস্তৃত বহুবিষয় অবলম্বনে তিনি

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য—

'আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হচ্ছে প্রচলিত মতগুলোকে আমল না দেওয়া। অর্থাৎ সচরাচর enlightened নামধারী লোকদের সঙ্গে মতে যাতে না মেলে তার জন্য আমার একটু চেষ্টা আছে কারণ তার ভিতর একটু distinction আছে।'

—ইন্দিরা দেবীকে লিখিত প্রমথ চৌধুরীর পত্র।

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

কবিতা রচনা করেছেন। বীরবলী সাহিত্যের এই বিষয়বৈচিত্র্যকে উজ্জ্বল, অভিনব ও উপাদেয় করেছে লেখকের বিশেষ মানস-রস। বস্তুতঃ, লঘু বিষয় অনেক সময় তাঁর মনের সংস্পর্শে এসে গুরু হয়ে গেছে, গুরু বিষয় হয়ে গেছে লঘু। গভীর চিন্তায় হাসির আলো মিশিয়ে, সহজ চিন্তায় গাঢ়তার মেঘ ছড়িয়ে, অতীত বিষয়ে বর্তমানের আলো ফেলে ও আধুনিক বিষয়ে অতীতের রূপ সন্ধান করে তিনি প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর মধ্যেই নোতুনত্ব এনে ফেলতেন। সে সব দেখে শুনে রবীন্দ্রনাথের মতো পাঠকের মনেও চমক না লেগে পারে না; মনে হয়, এর জাতই আলাদা।//প্রমথ চৌধুরীর চিন্তানুভূতির প্রণালী ছিলো সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনের, তাই পরিচিত বিষয়কেও তিনি এমন যুক্তি-শৃঙ্খলার (logical sequence) মধ্য দিয়ে পরিবেশন করতেন যাতে পাঠকের কাছে তা নোতুন বলে মনে হয়। প্রমথ চৌধুরীর রচনার ষ্টাইলের অন্যতম রহস্য এইখানেই।

তারপর আসে প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রকাশভঙ্গির কথা। তাঁর 'আদিম মানব' নামক প্রবন্ধ সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু বীরবলী সাহিত্যের নিজস্ব ঢঙটি তাতে অক্ষুণ্ণ আছে। তাই প্রমথ চৌধুরী প্রথম বয়সে লেখা এই প্রবন্ধটি 'সবুজ-পত্রে' পুনরায় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন নি। বস্তুতঃ, বীরবলী সাহিত্যের ষ্টাইল অনুধাবন করতে হলে তার প্রকাশভঙ্গি বিশ্লেষণ না করলে চলে না। প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: 'লোকে যাকে বীরবলী ঢঙ্ বলে, সে ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। ও হচ্ছে রচনার একটা বিশেষ ভঙ্গি।'

বীরবলী ঢঙটি কি? আগেই বলেছি, কোনো রচনার ঢঙ শুধু লিপি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর নির্ভর করে না, বিশেষভাবে নির্ভর করে চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের ওপর। লেখক যেভাবে কোনো বিষয় চিন্তা করেন,

অনুভব করেন, অনুধাবন করেন—ঠিক সেইভাবেই তা প্রকাশ করতে প্রয়াস পান। প্রমথ চৌধুরী নিজের ভাববস্তু প্রকাশ করতে গিয়ে শব্দ নির্বাচনে ও সংগ্রথনে, ভাষার কারিগরিতে, প্রসাদগুণের সাধনায় প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন—ফলে সব মিলে তাঁর রচনার এমন একটা বিশেষ ভঙ্গি দাঁড়িয়ে গেছে, যা সকলেরই চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর লেখার ভঙ্গি লেখার বিষয়কে ছাড়িয়ে উঠেছে। তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য একদিকে যেমন নিজস্ব চিন্তানুভূতির প্রণালীর সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে তেমনি শব্দযোজনা, অলঙ্কার-চর্চা, ছন্দোরচনা, গঠন-প্রণালী ইত্যাদির মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ, প্রমথ চৌধুরীর লেখা পড়লেই মনে হয়—তাঁর বলবার ভঙ্গিটি ঠিক অন্যের মতো নয়; কথাগুলি এমনভাবে আর কেউ বলেন নি কিংবা বলতে পারতেন না। এইখানেই তাঁর লিপিকুশলতা। প্রমথ চৌধুরীর প্রকাশভঙ্গি সকলের পছন্দ না হতে পারে, কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য কারো স্বীকার না করে উপায় নেই। আসল কথা, চেষ্টা করলেও তিনি তাঁর রচনার প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারতেন বলে মনে হয় না। এই জন্যে দিনের পর দিন তাঁকে সমালোচনার কশাঘাত সহ্য করতে হয়েছে, তবু তাঁর সাহিত্য-রচনার মজ্জাগত রীতির কোনো হের-ফের দেখা যায় নি। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই: 'লেখক মাত্রেরই একটি বিশেষ ধরণ আছে, সেই নিজস্ব ধরণে রচনা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্তব্য। পরের ঢঙের নকল করে শুধু সং। যা লিখতে আমি আনন্দ লাভ করিনে, তা পড়তে যে পাঠক আনন্দ লাভ করবেন, যে লেখায় আমার শিক্ষা নেই, সে লেখায় যে পাঠকের শিক্ষা হবে, এতবড় মিথ্যা কথাতে আমি বিশ্বাস করিনে। আমার দেহমনের ভঙ্গিটি আমার চিরসঙ্গী, সেটিকে ত্যাগ করা অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচকের তাড়নায় লেখার ভঙ্গিটি

ছাড়ার চাইতে লেখা ছাড়া ঢের সহজ, অথচ সমালোচকদের মনোরঞ্জন করতে হলে হয়ত আমার লেখার ঢঙ বদলাতে হবে।'

প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রকাশভঙ্গির বিভিন্ন দিক আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষার কথা আসে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ধর্ম ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর ভাষাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলেই মনে হয়। আরেকটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার ভঙ্গির মধ্যে যে ধার ও উজ্জ্বলতা থাকতো তা অনেক সময়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করে দিতো। বক্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে ভাষাব গঠনের দিকে পাঠক আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এথ্‌নলজিষ্টদের তিরস্কার করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন: 'Ethnologistদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন, তাঁদের মস্তিষ্কেব পরিমাণ যে স্বল্প ছিলো, এ-সত্য Ethnologistরাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েছে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয়, ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় কবতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা রক্ষিত হয় নি।' এখানে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এথ্‌নলজিষ্টদের বুকে বিদ্রূপেব যে তীক্ষ্ণ বাণ হানা হয়েছে, তার চেয়ে ভাষার কারিগরিই পাঠকের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করতে পারে। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকাও প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের দিকে নজর না দিয়ে তাঁর ভাষার দিকে লক্ষ্য রেখেই মন্তব্য করেছিলেন: 'এখানে ওষ্ঠাগত কথাটির দুটি অর্থ পরিস্ফুট করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া লেখক আপন বক্তব্যটিকে দীর্ঘ

ও অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায় লেখক শব্দনির্বাচনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন…।' অন্যদিকে উদ্ধৃত উদাহরণের ভাষার ধার ও ঔজ্জ্বল্যের প্রশংসা করেছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্ট যে, বক্তব্য নয়, ভাষাভঙ্গির আলোচনাই—তা নিন্দামূলকই হোক আর প্রশংসামূলকই হোক—বেশি হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার ষ্টাইলের প্রসঙ্গে একথাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার গঠন-পারিপাট্য অনবদ্য। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে তিনি ভাবের দিব্যমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন নি, কারণ সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। তাঁর গদ্যের ও পদ্যের গঠনে মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে, তাতে বক্তব্যও অসামান্য উজ্জ্বলতা পেয়েছে। বস্তুতঃ, কারুকার্যহীন শিথিল-বদ্ধ ভাষার প্রতি তাঁর একটা অপরিসীম বিতৃষ্ণা ছিলো। তিনি বলেছেন ঃ 'আমাদের রচনায় পদ, বাক্য কিছুই সুবিন্যস্ত নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে-দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে। সেই সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।' শুধু গদ্য নয়, প্রমথ চৌধুরীর পদ্য-রচনাতেও তাই ঝকঝকে ভাষাশিল্পের, ক্ষুরধার লিপিনৈপুণ্যের ও নিরেট গঠনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক) 'ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা, তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম, তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এদেশের মেঘলা দিনে এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর এক পৃথিবীর

আর এক আকাশ ;—দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথায়ও ঘনঘটা করে নেই, আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই ; মনে হ'ল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে ; এবং সে রং কালোও নয়, ঘনও নয় ; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাচের ঢাকনির ভিতর থেকে যেরকম আলো দেখা যায়, সেইরকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখি নি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়ে-ছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি,—গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর-দোর, সব যেন কোনও আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মতো দাঁড়িয়ে আছে ; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে। মরার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যে রকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সেই রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক, দুই এক সঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল! আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক, বৃষ্টি নামুক, বিদ্যুৎ চমকাক, বজ্র পড়ুক, নয় আরও ঘোর করে' আসুক—সব অন্ধকারে ডুবে যাক। কেননা প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্তের পর মুহূর্তে অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলুম না ;—অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা, এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।'—চার-ইয়ারী-কথা।

এই গদ্যে কল্পনার লীলা আছে, অথচ অসংযম নেই ; শব্দের সুষমা আছে, অথচ দৌর্বল্য নেই ; মণ্ডনকলার সমাবেশ আছে, অথচ অস্বচ্ছতা নেই ; বাক্য-বিস্তার আছে, অথচ বাক্য-বাহুল্য

নেই ; ভাষায় ওস্তাদি আছে, অথচ পাণ্ডিত্য নেই ; ভঙ্গির অভিনবত্ব আছে, অথচ অসঙ্গতি নেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনুকরণে বলা যায়—এ যেন কল্পনার কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের মূর্তি। এর গঠন যেমন শিল্পোচিত, তেমনি পুরুষোচিত। গদ্যশিল্পের এমন উদাহবণ বাঙলা সাহিত্যে খুবই দুর্লভ।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—'তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি—কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়। আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে—গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্য সমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে, পাঠকেরও তাই—তাড়া থাকলে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই, তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নন। গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখি নি।' —চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড)।

(খ) আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই!
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,
পূজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব—
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই ॥
রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গ স্পর্শন ॥
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-স্বুর ॥

—অন্বেষণ, সনেট-পঞ্চাশৎ।

গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্য, সন্দেহ নেই। তাই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের বৈশিষ্ট্য এখানে বর্তমান। এতে কঠিন কারুকার্য আছে, শৈথিল্য নেই ; Rhyme আছে, Reason-এরও অভাব নেই ; ভাবের গাঢ়তা আছে, ভাষায় জটিলতা নেই। বস্তুতঃ, শক্তি ও সৌন্দর্যের সমবায়ে কবিতাটি রূপরসবিশিষ্টতা লাভ করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা একই সঙ্গে পেঁচালো ও জোরালো। সোজাভাবে না বললেও যে ভাষার জোর কমে যায় না—তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যে আছে। তিনি রসিকতাচ্ছলে সত্যকথা বলতে চেষ্টা করেছেন, লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়াই তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো। তাই তাঁর লেখার মধ্যে 'রস ও কষ' উভয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। এই রস ও কষ সোজা ভাষার চেয়ে বাঁকা ভাষার মধ্য দিয়েই ভালোভাবে স্ফূর্তি লাভ করে। তাছাড়া, ভাষার মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে Wit-এর লীলাখেলা দেখাবার প্রচুর সুযোগ থাকে। এই কারণেই প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য-রচনায় বাঁকা

ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাতে বক্তব্যের জোর কমে নি, বরং বেড়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তিনি লিখেছেন : 'আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু-পা পেছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।' বাঙলার নব-সভ্যতাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এখানে পেঁচালো ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাতে তাঁর উদ্দেশ্য সার্থকতরভাবে সাধিত হয়েছে। বস্তুতঃ, তাঁর সাহিত্যে পূর্বাপর অসংলগ্নভাবের অপ্রত্যাশিত একত্র সমাবেশ, ভাষার দ্ব্যর্থবোধকতা, আপাতবিরোধী বর্ণনা, পরস্পরসংলগ্ন একাধিক বাক্যের ইতি ও নেতিবাচকতা, হালকা চালের মধ্য দিয়ে গভীর ভাবের পরিবেশন, অল্পকথায় অনেক কিছু বলার চেষ্টা, শব্দ নিয়ে লোফালুফি ইত্যাদি খুবই লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই বলেছেন : 'আমার কলমের মুখে অক্ষরগুলো সহজেই একটু বাঁকা হয়ে বেরোয়। আমি সেগুলো সিধে করতে চেষ্টা না করে যেদিকে তাদের সহজ গতি সেই-দিকেই ঝোঁক দিই।' প্রমথ চৌধুরীর মননধর্ম ও কৃষ্ণনাগরিক প্রভাব এর পেছনে কাজ করেছে বলে মনে হয়।

এই পেঁচালো ও জোরালো ভাষার প্রসঙ্গেই অলঙ্কারের কথা আসে। ভাষা সহজ সরল না হয়ে (অবশ্য তাতেও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হতে পারে!) যদি একটু ঘোরানো বাঁকানো হয়, তবে কোনো না কোনো অলঙ্কার এসে পড়ে। আসলে ভাষার কারুকার্যের অর্থ প্রায় অলঙ্কারের কারুকার্য। প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তার অভাব নেই।

অলঙ্কার সৌন্দর্য-বাচক। নিরলঙ্কার বাক্যও সুন্দর হতে পারে, হতে পারে মনোহারী। কিন্তু যেখানে অলঙ্কার থাকে, সেখানে

তা রচনা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেই।* অবশ্য অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে একথা খাটে না। প্রমথ চৌধুরীর রচনায়ও অলঙ্কার দেখা যায়—রচনার রূপগত, অর্থগত ও ধ্বনিগত সৌন্দর্যবৃদ্ধিই নিঃসন্দেহে তার উদ্দেশ্য। মনে রাখতে হবে, বক্তব্যের ওপর আলঙ্কারিকতা অনেকখানি নির্ভর করে। কোনো রচনার বিষয়বস্তু যদি সরস ও ভাবাবেগপূর্ণ হয়, তবে অলঙ্কারের প্রয়োগও সহজ ও সুন্দর হয়; বিষয়বস্তু নীরস ও আবেগহীন হলে অলঙ্করণের চমৎকারিত্ব দেখানো কষ্টসাধ্য হয়। একথা ঠিক, বিশেষত্বহীন ও রসস্পর্শবর্জিত বক্তব্যকে সরস ও সুন্দর করতে হলে অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, অলঙ্কারের সৌন্দর্য রসহীন বিষয়বস্তুকে পাঠকের রসগ্রাহী মনের দ্বারে পৌঁছে দেয়। বীরবল তা জানতেন, জানতেন পাঠকের রসবোধ বিচলিত হলে রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই তিনি তাঁর বক্তব্য যে ধরনেরই হোক না কেন, তাকে অলঙ্করণের মধ্যে দিয়ে অন্ততঃ খানিকটা পরিমাণে উপভোগ্য করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আলোচনায় বীরবলী আলঙ্কারিকতার উদাহরণ ঃ

(ক) 'ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সেদেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সেদেশে শরৎ তার শেষ উইল—পাণ্ডুলিপিতে নয়—রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়; কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার পিণ্ড নয়—রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভবার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখতে মনে হয়, অদৃশ্য শত্রুর নির্মম

---

* রূপকাদিঃ অলঙ্কারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্॥
—ভামহের এই উক্তিটি এখানে স্মরণযোগ্য।

আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রকৃতি-সুন্দরী যেন রাজপুত রমণীর মত স্বহস্তে চিতা রচনা করে সোল্লাসে অগ্নিপ্রবেশ করছেন।'

—ফাল্গুন, বীরবলের হালখাতা।

(খ) 'আমরা তাই দেশী কি বিলেতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘট স্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ-পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোন গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়; বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডুর হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালঙ্কার স্বরূপে সবুজ-পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকত-দ্যুতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।'

—সবুজ-পত্র, বীরবলের হালখাতা।

(গ) 'আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপূর্ব সৃষ্টি ন্যাশনেল কন্‌গ্রেস, অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না শুরু করে দিলেন। আর যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বৎসরের তিন শ বাষট্টি দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তারপর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে কোকিয়ে কান্না সমানে চলছে। যদি কেউ বলে, ছি, অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না।—তাহলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে।'

—খেয়াল খাতা, 'বীরবলের হালখাতা।

(ঘ) 'আমরা বাঙালীমাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথায় শুধু টিকি, যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট হয়েছে, তিনি সেইটেই স্বাধীনতার ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন।'

—তেল, নুন, লক্‌ড়ি।

(ঙ) 'ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা বাংলার মাটিতে বসাতে হবে; নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে' আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে' হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই 'মেঘনাদবধকাব্য' পরগাছার ফুল। অর্কিড-এর মত তার আকারের অপূর্বতা ও বর্ণের গৌরব থাকলেও তার সৌরভ নেই।'

—সবুজ-পত্রের মুখপত্র, নানা-কথা।

(চ) 'আমাদের দেশে যা-দেদার জমি পড়ে রয়েছে, সে হচ্ছে মানব-জমিন, আর আমরা যদি স্বদেশে সোণা ফলাতে চাই, তা হ'লে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানব-জমিনের আবাদ-করা এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত এই দুই-ই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব তার সাহায্য নিতে হবে।'

—রায়তের কথা।

(ছ) হে সুন্দর, হে চঞ্চল তরল সাগর!
তুমি মোর প্রাণের নাগর।
তব সনে আজি জলকেলি,
পরাও আমার অঙ্গে নীলাম্বরী চেলি।

তোমার বুকেতে শুয়ে হেরিব আকাশ,
ক্রমে ধীরে নিভে যাবে আলো ও বাতাস।
—কবির সাগর-সম্ভাষণ, পদ-চারণ।

(জ) কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
—রক্তিম-কপোল উষা জাগে যবে হেসে,—
রূপোর ঢে'য়ের পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণ পবন সনে আসে তরী বেয়ে॥
কারো প্রিয়া মেঘ সম চতুর্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশি বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচণ্ড ঝড়ের মত আসে বেগে ধেয়ে॥
তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর॥
—প্রিয়া, সনেট-পঞ্চাশৎ।

অলঙ্কারের মধ্যে যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস ইত্যাদি রচনায় প্রমথ চৌধুরীর নিপুণতা বিশেষ লক্ষণীয়। শব্দালঙ্কারের চেয়ে অর্থালঙ্কার তিনি বেশি পছন্দ করতেন। বিশেষ করে epigram স্বষ্টিতে তাঁর আনন্দ ছিলো বলে মনে হয়। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'তাঁহার লেখায় epigram বা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের ছড়াছড়ি—ইহারা কোথায়ও বা সুপ্রযুক্ত, কোথায়ও বা নিতান্ত অনধিকারপ্রবিষ্ট কল্পনা।

epigram রচনাই তাঁহার আসল সাধনা—গল্পাংশ কেবল এই epigram পরম্পরাকে একটা যেমন তেমন যোগসূত্রে গাঁথিবার অনাদৃত উপায় মাত্র। গল্পের মোড়কে epigram-এর চানাচুর তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন।' প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ, এমন কি কোথাও কোথাও কবিতা সম্বন্ধেও অনেকটা এই ধরনের কথা বলা যায়। 'রাম ও শ্যাম' নামক গল্প অনেকটা এপিগ্রামীয় পদ্ধতিতে লিখিত। 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধে Antithesis-এর প্রকাশ হলেও epigram-এর উপাদানও তাতে আছে। সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরী রচনায় গতানুগতিকভাবে অলঙ্কার সমাবেশ করতেন না, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করতেন না। নিচের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে বীরবলী ধরণের অলঙ্করণের নিদর্শন আছে :

(ক) ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় জ্ঞান করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের আছে একটা মহৎ জিনিষ। —হালখাতা, বীরবলের হালখাতা।

(খ) যেখানে ফোঁস করা উচিত, সেখানে ফোঁস ফোঁস করলেই আমরা বলিহারি যাই। —খেয়ালখাতা, বীরবলের হালখাতা।

(গ) দ্বিজেন্দ্র বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হতে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক হাস্যকর বটে। 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'—কথাটা ভারতবাসীর পক্ষে যে অপ্রীতিকর, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য ; কেননা যামিনী গেলেও আমরা জাগবার বিপক্ষে। আমরা শুধু রাতে নয়, অষ্ট প্রহর ঘুমুতে চাই।

—সাহিত্যে চাবুক, বীরবলের হালখাতা।

(ঘ) আমরা সমুদ্র পার হতে যে সকল বিদ্যার আমদানী করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার মধ্যে পড়ে না।

—বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ, বীরবলের হালখাতা।

(ঙ) সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বঙ্গ-সরস্বতী আর গোবিন্দ অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।

—পত্র ১, বীরবলের হালখাতা।

(চ) আমি 'তাহার' পরিবর্তে 'তার' লিখি, অর্থাৎ সাধু সর্বনামের হৃদয়ের হা বাদ দিই। 'হায় হায়' বাদ দিলে বাংলায় যে পদ্য হয় না, তা জানি, কিন্তু 'হা হা' বাদ দিলে যে গদ্য হয় না, এ ধারণা আমার ছিল না।

—কৈফিয়ৎ, বীরবলের হালখাতা।

(ছ) কন্‌গ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তার বোল ফিরেছে। —কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল, বীরবলের হালখাতা।

(জ) গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কিনা জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই।

—গল্প লেখা (গল্প)।

(ঝ) 'পুরুষ জাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁর কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তাঁদের নয়ন-মন তাঁর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হত।'

—গল্প লেখা (গল্প)।

(ঞ) এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত।

—ফরমায়েসি গল্প (গল্প)।

(ট) যুগধর্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকে চাইনে; —অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হতে চেষ্টা করো না।

—কন্‌গ্রেসের দলাদলি। (প্রবন্ধ)

(ঠ) বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!

—বিশ্বকোষ (কবিতা)।

(ড) যাহাতে মিটাই তীব্র রোগীর পিপাসা,—
সে সুধার লাগি করি রোগের স্বীকার॥

—রোগ-শয্যা (কবিতা)।

হাস্যরস উৎসারিত করতে গিয়েও প্রমথ চৌধুরী অনেক সময় অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। উদাহরণঃ

(ক) 'একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরী! তার উপর আবার এই দুর্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না। —ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বাল-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবক সিধে ভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবা মাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খ'সে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে' পড়ে' শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুল্‌কিটি সেখানে পড়বামাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল, সে সব গলে' একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হ'তে সুরু হ'ল। তার মনে হ'ল, যেন তার পাঁজরা সব ধ্বসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে' কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। এক কথায়, ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয়, তার ঠিক

সেই অবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে, তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।'

—ফরমায়েসি গল্প (গল্প)।

(খ) বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়ে এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা প্রেম-মধু।
গৌরী দানে লভে কবি কচিখুকি বধূ,
কবিহস্তে কিন্তু ত্রাণ পায় না কালিকা।
কুঁড়ি ছিঁড়ি ভরে তারা কাব্যের ডালিকা,—
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে যাচে সীধু!
পবিত্র কবিত্বপূর্ণ প্রেমে হয় ভোর,
বালিকার বিদ্যালয়ে ঢোকে কবি চোর!
বলিহারি কবি-ভর্তা M.A. আর B.A.
বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু!
মানুষ মরুক্ সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গরু!

—বালিকা বধূ (সনেট-পঞ্চাশৎ)।

এই উদ্ধৃতি দুইটিতে যে হাস্যরস আছে, তা একান্তভাবেই অলঙ্কারাশ্রিত।

ইংরেজীতে যাকে 'paradox' বলে প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তার প্রাচুর্য দেখা যায়। তাঁর অধিকাংশ গল্পের গঠনভঙ্গি, ভাব, চরিত্র ও কথোপকথন যে paradoxical—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তা 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'ফরমায়েসি গল্প', 'ছোটগল্প', 'রাম ও শ্যাম (গল্প)' ইত্যাদির তর্কসঙ্কুল

ও ভাববিমুখ গঠনের মধ্যে গল্পের প্রচলিত রূপের প্রতি একটা বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। বড়বাবুর ('বড়বাবুর বড়দিন') ও অবনীভূষণের মতো চরিত্র paradox-এর সুন্দর উদাহরণ। তাদের চরিত্রের অসঙ্গতি পাঠকের প্রত্যাশাকে রূঢ় আঘাত হানে।* প্রেমের paradox-এর উজ্জ্বল উদাহরণ 'চার-ইয়ারী-কথার' † চারটি প্রেম কাহিনী। 'উন্মাদের অট্টহাস্য, ছদ্মবেশিনী প্রেমিকার হেয় চৌর্যবৃত্তি, অস্থিরমতি প্রণয়িনীর অতর্কিতভাবে নিষ্ঠুর প্রত্যাখান, পরলোকবাসিনীর লৌকিক উপায়ে প্রণয়াস্পদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়াস—এই সমস্তই প্রেমের আদর্শভাবমূলক আবেশের বিরুদ্ধে হাস্যরসের

---

* 'বড়বাবুর বড়দিন' নামক গল্পের নায়কের paradoxical প্রকৃতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন :—'আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমজদারদের সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই টের পাচ্ছেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেছেন একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোলবার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমিও যে তা বলিনে তা নয়। বিদ্রূপে ব্যঙ্গের খোঁচায়, মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস ক'রে তুলতে আপনি ভারি পারেন কিন্তু, আমি দেখি মানুষকে মানুষ করে দেখাবার ক্ষমতা এর চেয়ে আপনার বেশি।...বোধকরি এই জন্যেই 'বড়বাবুর বড়দিন' আমার ভাল লাগেনি। ওর মর্ম্মস্থানের ভাষাটা ধরতে পারলুম না।'

—শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।

† 'চার-ইয়ারী-কথা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য :

'এখন মনে হচ্ছে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সবচেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টানত—তারপরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি—একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গে ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়—এইজন্যে তারা চটে ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কিনা 'ঘ্রাণেন অৰ্দ্ধভোজনং'—কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়—বস্তুত, ঘ্রাণে দ্বিগুণ উপবাস।· মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে একথা বলতে পারে না যে, ঠকেছি বটে কিন্তু চমৎকার।'

—চিঠিপত্র (৫ম খণ্ড)।

অভিযান, প্রেমের অমৃতকুণ্ডে বিদ্রূপের অম্লরস নিক্ষেপ। Paradoxical প্রবন্ধের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে 'বর্ষার কথা'। প্রবন্ধটিতে বর্ষা সম্বন্ধে আমাদের, বিশেষতঃ কবিদের মনোভাবকে তিনি উপহাস করেছেন। এই ধরনের কবিতার উদাহরণ—'ধুতুরার ফুল'—অবজ্ঞাত উপেক্ষিত অনাদৃত ধুতুরা ফুলকে তিনি এখানে ভালবাসা জানিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় paradoxical উক্তিরও অন্ত নেই। উদাহরণ ঃ

(ক) পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়;—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার। —বড়বাবুর বড়দিন (গল্প)।

(খ) তার inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে।

—গল্প লেখা (গল্প)।

(গ) নূতন-পুরাতনে যদি কোনোও বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে —সমাজে নয়।

—নূতন ও পুরাতন।

(ঘ) বই লিখলেই যে ছাপাতে হবে, এইটি হচ্ছে লেখকদের ভুল; আর বই কিনলেই যে পড়তে হবে, একটি হচ্ছে পাঠকদের ভুল।

—বইয়ের ব্যবসা।

(ঙ) একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে' আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে, তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ।

(চ) জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে তাম্বুল,—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল!

—তাজমহল (কবিতা)।

প্রমথ চৌধুরীর এই Paradox-প্রিয়তার কারণ দু'টি—একটি সামাজিক অপরটি সাহিত্যিক। সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি

বাঙালী জাতির জড়তা ও ভাবালুতার পরিপন্থী ছিলেন—তাই 'paradox'-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা-সঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য।' আর সাহিত্যিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন হাস্যরসের পূজারী। Paradox হাস্যরস (wit) সৃষ্টির একটা প্রকৃত উপায়—তাই paradox রচনায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিলো।

কিন্তু আলঙ্কারিকতা বীরবলের গদ্যকে সর্বত্র সুন্দর করে নি। মনে রাখা চাই, রচনার প্রধান গুণ স্পষ্টতা। তাই বাক্যকে অলঙ্কৃত না করে নিরলঙ্কার রাখলেই স্থানবিশেষে অর্থ ভালো বোঝা যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সর্বদা সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর গদ্য রচনায়, এমন কি কবিতায়ও দেখি, যেখানে বক্তব্য প্রাঞ্জল হওয়া দরকার, সেখানে অলঙ্করণ তাকে অনেক সময় অস্পষ্ট করে তুলেছে। নিচের উদ্ধৃতি কয়টির মধ্যে অলঙ্কার আছে, কিন্তু সেই অলঙ্কারকে সুপ্রযুক্ত বলে আমরা মনে করি নে ; তাতে বাক্যগুলির অর্থগৌরব পরিস্ফুট না হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অনেক সময় প্রমথ চৌধুরী সহজ জিনিস বোঝাতে গিয়ে জটিল জিনিসের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। তাতে ফল হয়েছে উল্টো, বক্তব্য অধিকতর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এই সব দেখে শুনে মনে হয়, স্থান কাল বিবেচনা না করে বাক্যকে অলঙ্কৃত করা বীরবলের অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো, যেমন বাক্-চাতুরী দেখানো মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিলো জি. কে. চেষ্টারটনের। প্রমথ চৌধুরীর লেখা একটু সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলেই এ-সত্যটা ধরা পড়ে।

(ক) ব্রহ্ম যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ, এ-সত্য বোঝাতে

হলে যেমন সংস্কৃত ভাষার সাহায্য চাই—তেমনি রাজনীতি যে একাধারে রাজমন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র হতে পারে, এ-সত্য বোঝাতে হলে ইংরেজীর সাহায্য চাই।

—কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল, বীরবলের হালখাতা।

(খ)……ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্তমান, অপর পক্ষে আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মা মাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হলে বহুসাধনার আবশ্যক। তাছাড়া, প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হলে অপর একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণের মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজে প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হলে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতালসিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে, কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণতঃ লোকে তারই অনুকরণ করে।

—তর্জমা, বীরবলের হালখাতা।

(গ) ঠিক করে' হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল!

*　　*　　*　　*

সর্ব ধর্মসমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম হারিয়ে হ'লে সর্বজাতি-বার!

—কাঁঠালী চাঁপা, সনেট-পঞ্চাশৎ।

সে যাই হোক, প্রমথ চৌধুরীর রচনাভঙ্গির ক্রম আলঙ্কারিক (rhetorical sequence) বলে যে কোনো কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন, তা কম-বেশি স্বীকার্য।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়; তাঁর ছিলো গানের কান। সে কান নিশ্চয়ই সাহিত্যের মধ্যে ধ্বনি খুঁজতো। তাঁর গদ্যে তাই একটা ধ্বনি-সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। সে-ধ্বনি কেবল ভাবগত নয়, রূপগতও। মনে রাখতে হবে, ছন্দ সকল সুকুমার শিল্পেরই পরম সম্পদ। ছন্দ-স্পন্দন গদ্য রচনায় সৌন্দর্য আনে; বিদ্যাসাগরের গদ্যের সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীদের গদ্যের তুলনা করলেই এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। প্রমথ চৌধুরী তা জানতেন—জানতেন 'ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা'। তাই গদ্যরচনাকে ধ্বনিময়—ছন্দোময় করে তুলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

গদ্য-ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রমথ চৌধুরীর অজানা ছিলো বলে মনে হয় না। বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্বের অর্থগত সংহতি, সংখ্যাগত বৈচিত্র্য ও দৈর্ঘ্যগত সঙ্গতির মধ্য দিয়েই গদ্য-ছন্দের স্ফূর্তি ঘটে, এ-জ্ঞান তাঁর ছিলো। তাছাড়া, তিনি মনে করতেন, শব্দের উপযুক্ত চয়ন ও অলঙ্কারের সুন্দর সমাবেশের মধ্য দিয়ে গদ্যের ছন্দোময়তা বাড়ানো যায়। ছন্দোবিজ্ঞানীরা হয়তো বলবেন, এগুলি গদ্য-ছন্দের সহায়ক নয়। তাঁদের সম্ভাব্য বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলতে চাই,—শব্দ-লালিত্য ও অলঙ্কার-সৌন্দর্য গদ্য-ছন্দ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ নয় জানি; কিন্তু অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে এগুলি থাকলে যে গদ্যের ছন্দোময়তা বাড়েই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিচের উদ্ধৃতি কয়টির মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। আর একটি কথা। পর্ব-সমতা পদ্য-ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলেও প্রমথ চৌধুরীর গদ্যকে কোথাও কোথাও ছন্দোময় করে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে বীরবলের 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশের প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর ছন্দোময় গদ্যের উদাহরণ ঃ

(ক) দর্শনের কতুবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে; কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করা চলে না,—কেননা, অত সৌন্দর্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্মের পর্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ান যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াইলেই যে কোন অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য, এ বিশ্বাসও আমাদের চলে' গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে' গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আল্‌গা করা, দুচারজনকে বহুলোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা, কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হ'লে যে কোনও জিনিষ মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই, সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে ; আকাশ আক্রমণ না করে', মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। ··· এক কথায় বহুশক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্প শক্তিশালী বহুসংখ্যাক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে' অন্ততঃ ষষ্ঠী সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও ; লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই ;···

—বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ, বীরবলের হালখাতা।

মন্তব্য ঃ এখানে গদ্য-ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্বের দৈর্ঘ্যসঙ্গতি

ও বাক্যগুলির ভারসাম্যকে আশ্রয় করে। বিভিন্ন ভাবের পরস্পর-সাপেক্ষতার সুষমাও এই ছন্দোমাধুর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

(খ) বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তারপরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তারপরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁরপর তার নিঃশ্বাস পড়ে, তারপর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এসকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ ক'রে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুঙ্কার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?—পবননন্দন নন, কিন্তু তার বাবা। ইনি একলম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছোঁড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপ্‌ড়ান, আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে' দেন, এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন। আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে' ফেলা। এঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তাছাড়া বর্ষা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন;—ইনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট!

—বর্ষার কথা, বীরবলের খাতা।

মন্তব্য: বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দৈর্ঘ্যগত সঙ্গতি ও তাদের সংখ্যাগত বৈচিত্র্য, ভাবের অলঙ্করণ ও চিত্রসমাবেশকৌশল উদাহরণটিকে ছন্দের সুস্পষ্ট সূত্রে গ্রথিত করেছে।

(গ) তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছট্‌ফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় কর্‌বার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষকথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

—আমরা ও তোমরা, বীরবলের হালখাতা।

মন্তব্য: প্রতি চরণের মোটামুটি পর্ব-সমতা ও antithesis এই অনুচ্ছেদটিকে ছন্দোময় করে তুলেছে। বিভিন্ন বাক্যের দৈর্ঘ্যগত সমতাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এইবার প্রমথ চৌধুরীর কবিতার রূপকর্ম একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

প্রমথ চৌধুরী মূলতঃ গদ্যলেখক। কাব্যের বাঁশি বাজাতে নয়, গদ্যের অসি চালাতেই তিনি ছিলেন বেশি নিপুণ। কবি-মন বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি বীরবলের তা ছিলো না—ছিলো তাঁর পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন। তাই কাব্যের কুঞ্জবন নয়, গদ্যের রণক্ষেত্রকেই তিনি তাঁর প্রতিভার চারণভূমিরূপে নির্বাচন করেছিলেন। কাব্যচর্চা ছিলো তাঁর দ্বিতীয় সাধনা, দ্বিতীয় যৌবনের সাধনা। মনে রাখতে হবে, প্রমথ চৌধুরী প্রথম যৌবনে—যখন রক্তে জোয়ার, বুকে ভালোবাসা, চোখে স্বপ্ন, দৃষ্টিতে রঙ থাকে আর হাতে থাকে লুণ্ঠনশক্তি তখন কবিতা রচনা করেন নি। তাইতো তাঁর কাব্যজীবনে উচ্ছ্বাসের বেগ আসেনি—দান্তের বিয়াত্রিচ, আলেষ্টরের মানসী রমণী, ডন জুয়ানের অন্বেষিতা, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী তাঁর জীবনে কোনো দিন দেখা দেয়নি।

দ্বিতীয় যৌবন, যাকে বলতে পারি দেহের নয়—মনের যৌবন, তাকেই তিনি করেছিলেন তাঁর কাব্যের জন্মভূমি। এই কারণেই কবি-পরিচয় প্রমথ চৌধুরীর দ্বিতীয় পরিচয়।

আবার কাব্যের ক্ষেত্রেও তিনি প্রধানতঃ সনেটকার। সনেটকার প্রমথ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশের পশ্চাতে ছিলো পি. আর. দাশের প্রেরণা। বীরবলের মনের ধাতকে সনেট রচনার অনুকূল মনে করেই হয়তো এ-অনুরোধ তিনি জানিয়েছিলেন। কবি নিজেও সনেটের উজ্জ্বল কঠিন গঠনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন আপন শিল্পী-মনের মুক্তির পথ ঃ

> ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
> শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।
>
> —সনেট, সনেট-পঞ্চাশৎ।

তাছাড়া, আর একটি বিশেষ কারণেও প্রমথ চৌধুরী সনেট লেখার সিদ্ধান্ত করেন। রবীন্দ্রযুগের ছায়াকবিরা (shadow poets) কবিগুরুর কবিতার তরলায়িত সংস্করণ সৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়ায়, রবীন্দ্র-কাব্যের অক্ষম অনুকরণের প্রাচুর্য দেখা দেওয়ায় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। সেই অক্ষম অনুকারকদের চোখে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার বেগটাই চোখে পড়েছিলো, কিন্তু তার তলায় সংযমের যে কঠিন মাটি ছিলো তা তাঁরা ধরতে পারেন নি। ফলে সংযমবিহীন আবেগধর্ম ও চিন্তার শৈথিল্য বাঙলা কাব্যের মধ্যে একটা ঢিলে-ঢালা ভাব সৃষ্টি করতে শুরু করে। কিন্তু কোনো দেশের কাব্যের পক্ষেই এই ধরণের অসংযম স্বাস্থ্যকর নয়। এই সাহিত্যিক অপচয় রোধ করবার মনোভাব নিয়েই প্রমথ চৌধুরী ভাস্কর্যধর্মী (sculptural) সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

এতো গেলো সনেট রচনার পারিপার্শ্বিক কারণ। কিন্তু বাইরের কারণে কবিতা রচনা করলে তা পুরোপুরি উত্‌রে যেতে পারে না, যদি না তার পেছনে অন্তরের প্রেরণা থাকে। কোনো কিছুকে রোধ করবার নেতিবাচক মনোভাব (negative attitude) থেকে নয়, কোনো কিছুকে সৃষ্টি করবার ইতিবাচক মনোভাব (positive attitude) থেকেই সার্থক সাহিত্য জন্ম নেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে সেই সৃষ্টিমুখী মনোভাবটি কি? আগেই বলেছি, নিজের মনের কাঠামোটি সনেটের সংযত-সংহত রূপাবয়ব রচনায় সম্পূর্ণ সমর্থ—এই সৃষ্টিক্ষম আত্মবিশ্বাস প্রমথ চৌধুরীর ছিলো এবং সেই আত্মবিশ্বাসই নিঃসন্দেহে তাঁর সনেটের প্রাণ-প্রেরণা ('আমি সনেটগুলি নির্ভয়ে লিখি।'—প্র. চৌ.)। খেলতে জানলে যেমন কানাকড়ি দিয়েও খেলা যায়, তেমনি লিখতে জানলে সনেটও কবিতা হিসেবে উত্‌রে যায়—এই প্রত্যয় হয়তো তাঁর ছিলো ; হয়তো তিনি Boileau-এর মতো মনে করতেন—'Un sonnet sans defaut vaut seul un long poeme.'—A sonnet without defect is worth alone a long poem. সব না-হোক তাঁর বেশ কয়েকটি সনেটের কবিতা হিসেবে সার্থকতা লাভের একটি কারণ হচ্ছে এই। অন্যদিকে সনেটের নিরেট প্রতিমায় শিল্পের তুলি বুলোবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে—অর্থাৎ আর্টের গুণ সনেটের প্রধান গুণ, এই কারণেও আর্টের ভক্ত প্রমথ চৌধুরী সরস্বতীর বীণায় সনেটের ইস্পাতী তার চড়িয়েছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন।

সনেট ছাড়া দেশী ও বিদেশী ছন্দে আরো কিছু কবিতা প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—কিন্তু সেখানেই শেষ। রবীন্দ্রযুগে কবি-খ্যাতি লাভের সাধনা দুরূহ, নিজের কাব্যরচনার ক্ষমতাও সীমায়িত—

একথা তিনি জানতেন। তাই তাঁর কবিকৃতির কৃশতা, তাঁর কবি-খ্যাতির স্বল্পতা।

'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদ-চারণ' কবির দু'টি কাব্যগ্রন্থ। 'সনেট-পঞ্চাশতে' কবি প্রথমেই গুরু-প্রণাম জানিয়েছেন ইতালীয় কবি পেত্রার্কাকে।

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার ;
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !

—সনেট, স, প।

অর্থাৎ সনেটের সঙ্গে যাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাঁরই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেছেন প্রমথ চৌধুরী।

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।

—সনেট, স, প।

এখানে সনেটের রূপকর্মে ইতালীয় সনেটের প্রভাবের স্বীকৃতি পাই। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সনেট বিশ্লেষণ করলে ছাঁচ বা রূপকর্মের দিক থেকে ইতালীয় সনেটের বিশ্বস্ত অনুসরণ সর্বত্র চোখে পড়ে না। যেমন—

ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে। ক
বর্ণে গন্ধে মাখামাখি, বসন্তে অনঙ্গে। খ
নূপুর-ঝঙ্কারে আর গীতের তরঙ্গে, খ
ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥ ক

উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে, ক
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে। খ
রণ-ক্ষত চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে, খ
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥ ক

পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন। গ
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥ গ
আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার। চ
ডাকো কল্কি, ম্লেচ্ছ আসে, করে করবাল, ছ
ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল, ছ
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার! চ

—জয়দেব, স, প।'

এখানে ষটককে (sestet) দু'ভাগে ভাগ করে তার অগ্রভাগে মিত্রাক্ষর পয়ার (rhymed couplet) সৃষ্টির যে চেষ্টা আছে, তার আদর্শ ইতালীয় সনেটে নেই। তাছাড়া, দশম চরণের শেষে ভাবের পূর্ণ সমাপ্তি পেত্রার্কীয় সনেটে অনুপস্থিত। তবে কি পেত্রার্কাকে গুরুবরণ একটা কথার কথা মাত্র?

প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: 'পেত্রার্কা ও সনেট এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক (correlative) শব্দ হয়ে উঠেছে বল্লে অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণেই আমি যদিচ তাঁর পদানুসরণ করিনি, তবুও পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি।···আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি ফরাসী সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি।' অর্থাৎ পেত্রার্কা-স্মরণ ইতালীয় প্রভাবের স্বীকৃতি নয়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি 'সনেট-পঞ্চাশৎ' সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হলেও 'পদ-চারণ' সম্পর্কে খাটে না।

যেমন—

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি ক
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার খ
চুরি করে' ফিকে রঙ্ গোলাপী উষার, খ
লাজমুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি! ক

পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি, ক
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুসুম আসার। খ
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার, খ
বসন্তের ঘোষণার তুমি রত্নভেরী ! ক
মর্মর-কঠিন-শুভ্র তুষারের গায়ে চ
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক, ছ
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে, জ
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে। চ
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক ছ
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে। জ

—চেরি-পুষ্প, পদ-চারণ।

উদাহরণটিতে রূপকর্মের দিক থেকে ইতালীয় সনেটই কবির আদর্শ। এর মিল-বিন্যাস যেমন আদি সনেটের আদর্শসম্মত, তেমনি অষ্টক ও ষটকের ভাবগত আবর্তন-নিবর্তন (ebb and flow) আদি সনেটকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে 'ওঁ' (প্রথম সনেট) ছাড়া 'পদ-চারণের' অন্যান্য সব সনেটই ইতালীয় সনেটের অনুরূপ—প্রমথ চৌধুরীর এ-মন্তব্যও পুরোপুরি সত্য-ভিত্তিক নয়। 'বর্ষা', 'আমার সমালোচক,' 'বন্ধুর প্রতি,' 'সনেট-সপ্তক,' 'খর্স্যাং' ইত্যাদি অনেক সনেটই তার প্রমাণ।

অন্যদিকে বীরবলের 'সনেট-পঞ্চাশতে' ও 'পদ-চারণের' অনেক কবিতায় ফরাসী সনেটের প্রভাব সুস্পষ্ট।

যেমন—

তুমি নহ রক্তজবা অথবা পলাশ ক
আগুন জ্বালিয়ে বন আলো করে যাবা, খ
—যে দিব্য অনলে পুড়ে কাম অঙ্গহারা, খ

যে আলো ধরায় করে নকল-কৈলাস। ক

তুমি নহ মানবের নয়ন-বিলাস, ক
রতি-ভর তনু তব হিম-বিন্দু পারা,— খ
গন্ধ তব ভেদ করি শ্যামপত্র কারা, খ
মুক্ত হয়ে ব্যক্ত করে মন-অভিলাষ॥ ক

গুপ্ত হয়ে থাক তুমি বন-অন্তঃপুরে। গ
মায়া তব গন্ধরূপে ছড়াও সুদূরে॥ গ

আকাশ দেখনি কভু সুনীল বিপুল, চ
ঘনচ্ছায় বনে আছ, নেত্র নত করি। ছ
খুঁজিনি তোমায় আমি গন্ধসূত্র ধরি, ছ
তাই তুমি মোর চির আকাশের ফুল! চ

—কাঠমল্লিকা, স, প।

এই উদাহরণে মিলের পদ্ধতি হচ্ছে—কখখক, কখখক, গগ, চছছচ। এই ধরনের মিল ফরাসী সনেটেই দেখা যায়।

Quand vous serez bien vieille, all soil à la chandelle, ক
Assise allprès du fell, dévidant et filant, খ
Direz chantant mes vers, en vous e'merveillant : খ
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. ক
Lors vous n'aurez serrante oyant telle nonvelle ; ক
Déjà sous le labeur à demi sommeillant, খ
Qui au'bruit de mon nom ne s'enaille réveillant, খ
Bénissant votre nom de louange immortelle. ক
Je serai sous la terre, et fântome sans or গ
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos গ
Vous serez sous all foyer une vieille accroupie, চ
Regrettant mon amour et votre fier dédain ছ
Vivez, si m'em croyez, n'attendez à demain ছ
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. চ

—Pour Hélène, Pirre de Ronsard.

[এই ফরাসী কবিতার A. Watson Bain কৃত ইংরেজী অনুবাদ আছে 'French poetry for students' গ্রন্থে; আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত বাঙলা অনুবাদ আছে 'কাব্য-সঞ্চয়ন' নামক গ্রন্থের 'প্রাচীন প্রেম' কবিতায়।]

মিলের দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর কবিতাটির সঙ্গে রঁস্যার্দ্-এর কবিতাটির সামঞ্জস্য আছে পুরোপুরি। লক্ষ্য করতে হবে, 'কাঠমল্লিকায়' দশম চরণে ভাবের সমাপ্তি ঘটেছে; কিন্তু ফরাসী সনেটটিতে ঘটে নি। এতেই প্রমাণ হয়, বীরবলী সনেটে নবম ও দশম চরণদ্বয়ের মিত্রাক্ষর পয়ার রূপে ফরাসী প্রভাব থাকলেও দশম চরণের শেষে ভাবের সমাপ্তি ঘটানো একান্তভাবেই প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব রীতি। এর ফলে শুধু মিলের দিক থেকেই নয়, ভাবের প্রবাহের দিক থেকেও সনেট ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রিয়নাথ সেন বলেছেন, তাতে ভাবের প্রখরতা ও গভীরতা অক্ষুণ্ণ থাকে নি। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরীর মুখে শুনতে পাই: 'আমি অস্বীকার করিনে যে কতকগুলি সনেটে আমি মনোভাবকে নবম ও দশম চরণে গুটিয়ে নিয়ে আবার নূতন করে ছড়িয়ে দিয়েছি। এতে যে কোনরূপ রসভঙ্গ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়। বংশীধারীর পক্ষে ত্রিভঙ্গ রূপ ধারণ করাটা অন্ততঃ এদেশে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।' শেষবাক্যে যুক্তির নামে যা আছে আসলে তা রসিকতা; আর যদি রসিকতা না হয়, তবে সনেট, বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর সনেট বংশীধারী কিনা সন্দেহ। প্রমথ-ভক্ত রবীন্দ্রনাথই বলেছেন: 'সনেটে প্রমথ বীণাপাণিকে খড়্গপাণি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন।'

সুতরাং নিজের সনেটের ত্রিধাবিভাগ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তি (?) খাটে না। তবে এই ধরনের সনেট রচনায় প্রমথ চৌধুরীর আগ্রহের কারণ সন্ধান করা কঠিন নয়। ফরাসী সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ সনেটকার Joachim du Bellay ত্রিধাবিভক্ত সনেট রচনা করেছিলেন irony ও satire প্রকাশ করার জন্যে। বস্তুতঃ, সনেটের মধ্যস্থলে পেত্রার্কীয় রীতি লঙ্ঘন প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাবেরই পরোক্ষ প্রকাশ। পরস্পর পয়ার-মিলের পর (ষটকে) আবার শেষ চারটি চরণে আদি সনেট-রীতির অনুসরণ anticlimax রূপে আমাদের প্রত্যাশাকে আঘাত হানে। আর নবম দশম চরণের আঁটসাঁট পয়ার-মিল সনেটের খড়্গপাণি মূর্তির মধ্যভাগে একটা ঔজ্জ্বল্য (epigrammatic brightness) এনেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনতে পাই: এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—"মধ্যে ক্ষামা", দুই লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে "চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।"

এই যে সনেটের অভিনব রূপমূর্তি—তাতে সেক্সপীরীয় সনেটের প্রোজ্জ্বল পয়ারপুচ্ছ নেই, নেই পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধাসুন্দর দেহডৌল—কিন্তু যা আছে সেই কটিদেশের খড়্গাবন্ধ আর চৌদ্দচরণের ত্রিভঙ্গঠাম পাঠকের রসবোধকে কি তৃপ্ত করে না?

সনেটে নির্দিষ্ট মিলের পরিকল্পনার পশ্চাতে একটি যুক্তি আছে। ছন্দধ্বনি যাতে ভাবের গভীর ও গম্ভীর ধ্বনিকে ছাপিয়ে না ওঠে, এককেন্দ্রিক ভাবকল্পনাকে বিক্ষিপ্ত করে তার সুঠাম সুন্দর অবয়ব নষ্ট করে না দেয়, সেজন্যেই একটি সুনিয়মিত মিলের পদ্ধতি সনেটে অনুসরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, বহুবিচিত্র মিল বা একই ধরনের মিলও পূর্বোক্ত কারণেই সনেটে বর্জনীয়। অন্যদিকে মিলের অসামঞ্জস্য বা নামমাত্র মিল ভাবকে ঘনীভূত করতে সাহায্য করে না বলেই সনেটের পক্ষে অনুপযুক্ত। প্রমথ চৌধুরীর সনেটে যেমন সার্থক মিল দেখা যায়, তেমনি অসার্থক মিলও অনুপস্থিত নয়।

'বার্ণাড শ' কবিতায় প্রথম ও চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম চরণে মিল নেই (স্বরধ্বনির মিল উপেক্ষণীয়), যদিও থাকা উচিত ছিলো। 'ভুলের' শেষ চার চরণে একই ধরণের মিলের পুনরাবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ভাবকে তরল করেছে, চরণধ্বনি ব্যাহত করেছে ভাবধ্বনিকে। 'প্রতিমায়' শেষ ছয় চরণে একই মিল দেখতে পাই—'নয়ন-শ্রবণ-স্তন-চরণ-অচেতন-বিসর্জন।' 'বিশ্বরূপে' গণংকারের সঙ্গে সনংকারের মিল কষ্টকল্পনামাত্র (এই কয়েকটি সনেট আছে 'সনেট-পঞ্চাশতে')। 'ওঁ' ('পদ-চারণ') কবিতার প্রথম চৌপদীর (quatrain) মিল দ্বিতীয় চৌপদীতে রক্ষিত হয় নি। 'ওর form ঠিক হয় নি'—প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন।

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি! ক
গোলাপের রঙ্ ছিল অনন্ত আকাশে, খ
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে, খ
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি ক

—অপরাহ্ণ, স. প.

এখানে দুই জাতীয় মিলের পার্থক্য শুধু স্বরধ্বনিগত বলে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে (শি=শ্+ই, শে=শ্+এ)। প্রমথ চৌধুরীর সনেটের মিলে আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল (feminine rhyme) নির্বাচন করেছেন। 'সনেট', 'জয়দেব', 'রজনীগন্ধা', 'স্বপ্নলঙ্কা', ('সনেট-পঞ্চাশৎ') ইত্যাদি সনেটই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণের ক্ষেত্র। আচার্য-শিরোধার্য-আর্য-উচ্চার্য ('ভাষ'), ধন্য-পণ্য-নগণ্য-সৈন্য ('ধুতুরার ফুল'), বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-প্রাণান্ত-একান্ত ('বিশ্ব-ব্যাকরণ'), সজ্জা-শয্যা-লজ্জা ('রোগ-শয্যা'), কুরঙ্গ-নারঙ্গ-তরঙ্গ-সারঙ্গ ('পাষাণী'), পাত্র-মিত্র-গাত্র-ছাত্র ('বন্ধুর প্রতি'—পদ-চারণ), ক্ষুদ্র-রৌদ্র-সমুদ্র-রুদ্র

('সনেট-সুন্দরী'-ঐ), স্বতন্তর-অবান্তর-অন্তর-যন্তর ('কাব্যকথা'-ঐ)—জাতীয় মিল কবিতায় অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখে পাঠকের বিস্ময় জাগা স্বাভাবিক। অনেকের মতে, feminine rhyme কবির অক্ষমতারই পরিচায়ক, প্রতিভার নয়—কবিতায় যে ছন্দসঙ্গীত ও ভাবমাধুর্য প্রত্যাশিত তা এই ধরণের মিলের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করে না ('চরণের আভরণে নাহিক নিক্কণ'—পদ-চারণ)। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে মিলের বিচারটা ভিন্নভাবে হওয়া উচিত। তিনি মনে করতেন ঃ 'সরস্বতীকে সনেটের খাটুলিতে আসন দিলে তাঁকে জাগ্রত থাকতেই হবে। যদি মুহূর্তের জন্যও তন্দ্রা আসে ত তাঁর পতন অনিবার্য।' শব্দের ধ্বনিমাধুর্য যাতে তন্দ্রাচ্ছন্নতার আবহাওয়া সৃষ্টি না করে, সনেটের সজাগ ভাবটা যাতে বজায় থাকে—সেজন্যেই প্রমথ চৌধুরী যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল সন্ধান করেছেন বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, সরস্বতীর আঁটসাঁট, সবল, সতেজ মূর্তির পক্ষে এই ধরণের ভারী মিলের উপযোগিতা সম্বন্ধেও হয়তো তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাছাড়া, যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিলের ধ্বনি অনেকটা আঘাতের ধ্বনির মতো শোনায় এবং সেই আঘাতসঞ্জাত ধ্বনি প্রমথ চৌধুরীর সনেটে একটা চমক, একটা সপ্রতিভ ভঙ্গি নিঃসন্দেহে সৃষ্টি করেছে।

ফরাসী আদর্শসম্মত মিলের সার্থক উদাহরণ আছে নিচের কবিতায় ঃ

ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত মানব-সমাজ। ক
মাটির প্রদীপ জ্বেলে সারানিশি জাগে, খ
ছোট ঘরে দোর দিয়ে ছোট সুখ মাগে, খ
সাধ করে' গায়ে পরে পুতুলের সাজ॥ ক

কেনা আর চেনা, আর যত নিত্য কাজ, ক
চিরদিন প্রতিদিন ভাল নাহি লাগে। খ
আর কিছু আছে কিনা, পরে কিম্বা আগে, খ
জানিতে বাসনা মোর মনে জাগে আজ। ক
বাহিরের দিকে মন যাহার প্রবণ,— গ
সে জানে প্রাণের চেয়ে অধিক জীবন॥ গ
মন তার যায় তাই সীমানা ছাড়িয়ে, চ
করিতে অজানা দেশ খুঁজে আবিষ্কার। ছ
দিয়ে কিন্তু মানবের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে, চ
সমাজের তিরস্কার পায় পুরস্কার। ছ

—মানব-সমাজ, স. প.

কবিতা সাধারণতঃ অনুভূতির জগৎ থেকে জন্ম নেয়, তার জীবন-মূলে থাকে ভাবের অনুপ্রাণনা; তার মধ্যে শোনা যায় হৃদয়ের অনুরণন। রসিকতাচ্ছলে হলেও প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন:

কবিতার আছে কিছু রকম সকম।
গদ্যে লেখা এক কথা, পদ্যে স্বতন্তর,—
বাজে যাতে কাজে লাগে, আর অবান্তর,
ভাব ভাষা দুই চলে ধরিয়া পেখম।
ভাব ছোটে, যদি হয় হৃদয় জখম,
মনোরাগে ফাগ্ খেলে কবির অন্তর
অগ্নি দেয় সুরু করে মনের যন্তর
পায়রার মত বকা বক্‌ম্ বক্‌ম্।
অথবা হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে।
ভাব ভাষা দুই গলে' নিজ হ'তে ঘোরে।

—কাব্যকলা, প. চা.

কিন্তু কবির নিজের কাব্য সম্পর্কেই একথা খাটে না। তাঁর কবিতায় অনুভূতির লীলা নেই, ভাবের স্পন্দন নেই, নেই হৃদয়ের ছাপ। তা আবেগাত্মক (impassioned) নয়, চিন্তাত্মক (brained)। তীক্ষ্ণ ও মুক্ত ভাবনার ফল যে বিজ্ঞতা, বীরবলী সনেটে তা-ই চতুর ও উজ্জ্বল ভাষায় বিধৃত। অন্য ভাষায় বলা যায়, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা ভাববিমুখ আবেগহীন কল্পনামোহবর্জিত মনের, প্রজ্ঞাবিজড়িত মননাশ্রিত প্রৌঢ় জীবনের সুব্যক্ত ভাষ্য। অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে, ভাব ও রূপ বিভিন্ন প্রযত্নে নয়, এক প্রযত্নে আত্মপ্রকাশ করে—বীজ যেমন আপনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বৃক্ষের সৃষ্টি করে, তেমনি ভাব আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সৃষ্টি করে রূপের। প্রমথ চৌধুরীর সনেটেও ভাব ও রূপের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে—তার মধ্যে যেমন নেই পরিচিত 'কবি-মনোভাব', তেমনি নেই প্রচলিত 'কবি-ভাষা'। অন্যভাবে বলা যায়, তাতে চিন্তার চাতুরীর সঙ্গে মিলেছে বচনের বৈদগ্ধ্য, চোখা মননের সঙ্গে চোস্ত কথন।

উদাহরণ ঃ

(ক) ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল !

—গোলাপ, স. প.।

(খ) ফুলের আগুন, কিম্বা আগুনের ফুল ॥

—শিখা ও ফুল, স. প.।

(গ) দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর !

—অন্বেষণ, স. প.।

(ঘ) নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা !
তব ধর্ম মনোরাজ্যে বহুরূপী সাজা ॥

—ভর্তৃহরি, স. প.।

(ঙ) ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।

—বন্ধুর প্রতি, প. চা।

(চ) আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী ?

—আমার সনেট, প. চা.।

(ছ) অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটী
সাহিত্যের জাব।

—পত্র, প. চা.।

(জ) নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর।

—আত্মকথা, স. প.।

এইভাবে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা যায়, বীরবলী সনেটে ভাব ও ভাষার চতুরালি আছে, আছে বুদ্ধির চমকের সঙ্গে ভাষার ঠমক। পদ্যে যে বাগ্‌ভঙ্গি অচল, যে শব্দের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ—তাকেও তিনি অবলীলাক্রমে প্রশ্রয় দিয়েছেন সনেটে।

নিজের অজ্ঞাতসারে নয়, নিতান্ত সচেতনভাবেই তিনি তা করেছেন, তাই লিখেছেন :

মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে 'ও ত শুধু মিলনান্ত গদ্য'।

—কবিতা, প. চা.।

এই 'মিলনান্ত গদ্য' কথাটি লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার ভাষায় গদ্যাত্মক ভঙ্গি ও কাঠিন্য আছে বলেই এই জাতীয় মন্তব্য শুনা গিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী নিজেও তাঁর কবিতার জন্যে 'পদ্যের গুণ rhyme' ও 'গদ্যের গুণ reason'-এর অতিরিক্ত আর কিছু দাবি করেন নি ('পদ-চারণের' উৎসর্গ-পত্র দ্রষ্টব্য)। এই কারণেই বীরবলী কাব্যকে 'মিলনান্ত গদ্য' বললে সত্যের একেবারে অপলাপ করা হয় না, যদিও তার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে প্রচুর।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম যৌবনের শেষে দ্বিতীয় যৌবনে কবিতা লেখার অসুবিধা আছে। কল্পনা শক্তি তখন থাকে না, প্রেমের স্বপ্ন মুছে যায়। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে, প্রেমের উত্তাপে, ভাবের প্রেরণায় কবিরা গলা ছেড়ে গান গাইতে পারেন, উঁচু পর্দায় হৃদয়ের তান তুলতে ভয় পান না; তখন কাব্যের সুরে সুরে জীবন-যৌবনের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু প্রথম যৌবনের শেষে বয়সের প্রকোপে কল্পনা-চরণে বেড়ি পড়ে, মনের মধ্যে প্রেমের উজান বান ডাকে না, সত্য-মিথ্যার দ্বিধা-দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে ওঠে; তখন—

কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে' করে গৃহিণী-ব্রত।

—কবিতা লেখা, পদ-চারণ।

এই কারণেও তাঁর কাব্যের ভাষা একটু গদ্যাত্মক হয়েছে।

তবে গদ্য-ঘেঁষা ভাষা ব্যবহারের অপরাধে প্রমথ চৌধুরীর কবিতাকে অস্বীকার করা উচিত কি না ভেবে দেখা দরকার। ইংরেজী সাহিত্যে গদ্যাত্মক কাব্য লিখেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবিরা, তবু কবি হিসেবে তাঁদের একেবারে অস্বীকার করা হয়েছে কি? মোহিতলালের মতো প্রমথ-বিরোধী কঠোর সমালোচকও স্বীকার করেছেন: 'কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দভঙ্গীতে এই রচনা ('কাঁঠালী-চাঁপা'—স. প.) আদৌ সনেটপদবাচ্য নয়···তথাপি মূল সনেটের বিকৃতি হইলেও, ইহারও একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে; অতএব সনেট না হইলেও, ইহা এক শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী বটে।' অর্থাৎ সনেট হিসেবে না হলেও উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশতের' কবিতাকে স্বীকার করেছেন মোহিতলাল।

জানি, নামে কি আসে যায়,—কবিতার মর্যাদা যে রচনা পেয়েছে. সনেটের মর্যাদা না পেলে তার ক্ষতি কি? তবু প্রশ্ন জাগে, তাকে সনেটই বা বলা হবে না কেন? আদি ইতালীয় সনেটের সকল নিয়ম লঙ্ঘন করেও সেক্সপীরীয় সনেট কি স্বীকৃতি পায় নি? ফরাসী ভাষাতেও সনেটের রূপান্তর ঘটেছে অনেক, বিশেষতঃ ষটকে—তৎসত্ত্বেও তার নাম তো সনেটই। বীরবলী সনেট ভাব ও ভাষার দিক থেকে ফরাসী সনেটের অনুরূপ হয়েও কেন তার প্রাপ্য নাম-মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হবে?

'পদ-চারণে' নানা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে; শুধু সনেটই নয়, Terza Rima ও Triolet এবং দেশী ছন্দের কবিতাও (পয়ার, ত্রিপদী ও ছড়া) তাতে দেখতে পাই। 'সনেট-পঞ্চাশতে' কাব্যরূপের পূজোয় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, কিন্তু 'পদ-চারণে' তিনি বহুর ভক্ত। তিনি যে ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অক্ষম ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে এইখানে। কাব্যচর্চায় তিনি যদি আরও সময় ও মন দিতে পারতেন, তবে উৎকৃষ্টতর ছন্দের কবিতা রচনা করতে পারতেন বলে মনে হয়। বস্তুতঃ, তাঁর কাব্যরচনার ইতিহাসে একটিমাত্র যুগ দেখতে পাই এবং সেটি হচ্ছে পরীক্ষার যুগ ('সনেট যে লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসেবে'; 'এই দুই—Terza Rima ও Triolet—হচ্ছে experiment',—প্রমথ চৌধুরী।) সে পরীক্ষায় তিনি পাস করলেন, কিন্তু ঐ পাস করা পর্যন্তই, তার বেশি আর এগোলেন না। তাই বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী হয়ে রইলেন অপ্রধান কবি (minor poet)।

সনেট লেখা কঠিন—কিন্তু তেরজা রিমা লেখা কঠিনতর। সনেটের—বিশেষ করে আদি সনেটের মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করা দুঃসাধ্য;—তাই নানা দেশের সনেটে রূপকর্মের নানা রূপান্তর

দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তেরজা রিমায় প্রতি ত্রিপদীর (Tercet) অমিল চরণটিকে পরবর্তী ত্রিপদীর সমিল চরণদ্বয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অশেষ গতিতে (unending continuity) লিখে যাওয়া দুঃসাধ্যতর। প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন: 'একটি Terza Rima লিখতেই মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

এখন তেরজা রিমার রূপটি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা যাক। এই ছন্দ ত্রিপদীর মালা বিশেষ; এক ত্রিপদীর সঙ্গে অন্য ত্রিপদীর সংযোগ ভাব ও অর্থের দিকে থেকে ততটা নয়, যতটা মিলের দিক থেকে। প্রথম ত্রিপদীর প্রথম ও তৃতীয় চরণ হয় সমিল—আর দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্যে অপেক্ষা করে পরবর্তী ত্রিপদীর প্রথম ও তৃতীয় চরণের। সুতরাং দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম ও তৃতীয় চরণও সমিল এবং তার অমিল দ্বিতীয় চরণটির সঙ্গে তৃতীয় ত্রিপদীর প্রথম ও তৃতীয় চরণের হয় অন্ত্যানুপ্রাস। প্রতিটি ত্রিপদীর মধ্যে ছন্দের দিক থেকে এই যে স্ক্রুর পাকের ন্যায় মিল—এটাই হচ্ছে তেরজা রিমা ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এবং সমস্ত কবিতার মধ্যে এই যোগ অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে হয়। এই জাতীয় কবিতায় প্রথম ও শেষ চরণের মিল দুবার পুনরাবৃত্ত হয় এবং অন্যান্য মিল তিনবার দেখা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

Notre jour leur paraît plus sombre que la nuit; ক
Leur œil cherche toujours le ciel bleu de la fresque, খ
Et le tableau quitté les tourmente et les suit. ক
Comme Buonarotti, le peintre gigantesque, খ
Ils ne peuvent plus voir que les choses d'en haut গ
Et que le ciel de marbre oú leur front touche presque. খ

Sublime aveuglarment ! magnifique de'faut ! গ
—Terza Rima, Theophile Gautier.

প্রমথ চৌধুরীর তেরজা রিমার শেষ ছ'টি চরণ ঃ

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙ্গিয়া গারদ, ক
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেওয়াল, খ
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ। ক
জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল খ
নেশায় বাদশা হাঁকে—'বাহবা বাহবা'। গ
ধ্রুপদীরা কহে রেগে 'ডাকিছে শেয়াল !' খ

—খেয়ালের জন্ম, প. চা.।

গতিয়ের তেরজা রিমায় ইতালীয় আদর্শের পুরোপুরি অনুসরণ আছে। ফরাসী কবিতাটির উদ্ধৃত চরণগুলির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কবিতাটির উদ্ধৃত চরণগুলির একটা পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। গতিয়ের কবিতা ত্রিপদীর দ্বারা সমাপ্ত হয় নি, সমাপ্ত হয়েছে একটি একক চরণের দ্বারা এবং সেই একক চরণের সঙ্গে শেষ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণটির মিল দেখিয়ে ইতালীয় আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আছে। অন্যদিকে বীরবলের তেরজা রিমায় এই অত্যাবশ্যক শেষ চরণটি নেই, তারই ফলে শেষ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণটি মিলের দিক থেকে রয়ে গেছে একক নিঃসঙ্গ। এইটুকু পরিবর্তন দোষাবহ বলে মনে হয় না ; যদি দোষাবহ বলে ধরা হয়, তবে তেরজা রিমা ছন্দে লেখা শেলীর 'Ode to the west wind' কবিতাও দোষদুষ্ট। কারণ ঃ

The winge'd seeds, where they lie cold and low, ক
Each like a corpse within its grave, until খ
Thine azure sister of the spring shall blow ক
Her clarion o'er the dreaming earth, and fill খ

(driving sweet buds like flocks to feed in air) গ
With living hues and odours plain and hill : খ
Wild spirit, which art moving every where ; গ
Destroyer and Preserver ; hear, oh hear ! গ

প্রমথ চৌধুরীর তেরজা রিমায় শেষ একক চরণটি নেই, কিন্তু শেলীর তেরজা রিমায় শেষ একক চরণের বদলে দু'টি চরণ আছে এবং তার ফলে শেষ চরণের মিলটিও দুবার নয়—তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এতে ইতালীয় আদর্শের পরিবর্তন হয় নি কি ?

সে যা-ই হোক, প্রমথ চৌধুরীর তেরজা রিমায় একটি চরণ যে কম আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই (ইতালীয় আদর্শানুযায়ী 'খেয়ালের জন্মে' পঁচাশী চরণ থাকা উচিত ছিলো—প্রথম চরণের মিল দু'বার=২ চরণ, শেষ চরণের মিল দু'বার=২ চরণ, অন্যান্য সাতাশ রকমের মিল তিনবার ২৭×৩=৮১ চরণ। মোট পঁচাশী চরণ। অথচ আছে চুরাশী চরণ)। তবে একটা অশেষ গতির সৌন্দর্য তাঁর 'কৈফিয়ৎ' ও 'খেয়ালের জন্মে' বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী মধ্যযুগের ফরাসী দেশে প্রবর্তিত তেপাটিও (Triolet) লিখেছেন—যদিও 'Triolet লেখা কঠিন তার পুনরুক্তির জন্য।' তেপাটি দ্বিবিধ মিলের কবিতা এবং তাতে দশ অক্ষরের আটটি চরণ থাকে। তার মিলের পদ্ধতি—ক খ ক ক ক খ ক খ। শুধু তা-ই নয়, চতুর্থ ও সপ্তম চরণে প্রথম চরণের পুনরাবৃত্তি (ধুয়া হিসেবে) করা হয় এবং অষ্টম চরণও দ্বিতীয় চরণের পুনরুল্লেখমাত্র। ধুয়া চরণগুলির পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয় এবং পুনরাবৃত্তির সময় একটু-আধটু পরিবর্তিতও হতে পারে ('slightly altering its meaning or its relation to the

rest of the poem')। অনেক সময় তেপাটিতে একটা লঘু ভঙ্গিও দেখা যায়। একটি উৎকৃষ্ট ফরাসী তেপাটির উদাহরণ হচ্ছে ঃ

Le fremier jour du mois de mai — ক
Fut le plus heureux de ma vie : — খ
Le beau dessein que je formais, — ক
Le fremier jour du mois de mai ! — ক
Je vous vis et je vous aim ais. — ক
Si ce dessein vous plut, sylvie, — খ
Le premier jour du mois de mai — ক
Fut le plus heureux de ma vie — খ

—Jacques Ranchin.

[ইংরেজী অনুবাদ ঃ

The first day of the month of May was the gladdest day in my life. The nice incident which I met with on the first day of May ! I saw you and I loved you. If that incident pleased you, Sylvie, the first day of May was the gladdest day in my life.]

প্রমথ চৌধুরী গোটা আষ্টেক তেপাটি রচনা করেছেন—মূলের আদর্শের কোথাও আছে সার্থক অনুসরণ, কোথাও বা পরিবর্তন।

জান সখি কেন ভালবাসি — ক
ওই তব ফোটা মুখখানি, — খ
ওই তব চোখভরা হাসি — ক
জান সখি কেন ভালবাসি ? — ক

যবে আমি তোমা কাছে আসি ক
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী। খ
তাই সখি আমি ভালবাসি ক
ওই তব গোটা মুখখানি॥ খ

—মিলন, প. চা.।

এখানেও দশমাত্রার আটটি চরণ আছে এবং মিলের পদ্ধতি দ্বিবিধ এবং ফরাসী তেপাটির আদর্শসঙ্গত। চতুর্থ ও সপ্তম চরণ প্রথম চরণের এবং অষ্টম চরণ দ্বিতীয় চরণের পুনরাবৃত্তি (সামান্য পরিবর্তিত)। পুনরুক্ত চরণগুলির সংস্থাপন অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক। অন্যদিকে ঃ

আকাশের মাটি লেপা ঘরে ক
রবি এঁকে দেয় আলপনা। খ
দেখ সখি মেঘের উপরে ক
কত ছবি আঁকে রবি-করে। ক
কত রঙে কত রূপ ধরে ক
ছবি যেন কবিকল্পনা। খ
বুক মোর আছে মেঘে ভরে ক
তাহে সখি দাও আলপনা। খ

—মধ্যাহ্ন, প. চা.।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এখানে তেপাটি রচনার বিধিবদ্ধ আদর্শ রক্ষিত হয় নি। কারণ, চতুর্থ ও সপ্তম চরণ প্রথম চরণের এবং অষ্টম চরণ দ্বিতীয় চরণের পুনরুল্লেখ নয়।

যে-সমস্ত দেশী ছন্দের কবিতা তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে ছড়ার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। ছন্দোবিজ্ঞানের মতে, ছড়ার ছন্দ চতুর্মাত্রিক পর্বের ছন্দ এবং তাতে অক্ষরমাত্রই একমাত্রিক।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ছড়া 'বর্ষায়' চার মাত্রার পর্ব নির্ধারণ করা কঠিন এবং অক্ষরমাত্রই একমাত্রার ধরলে ছন্দের জাতি নির্ণয় করা হয়ে পড়ে কঠিনতর।

যেমন ঃ

চিল খায় ঘুরপাক,	=	৪ অক্ষর ৪ মাত্রা
ডালে বসে' কাঁপে কাক,	=	৭ অক্ষর ৭ মাত্রা
আকাশেতে বাজে ঢাক	=	৭ অক্ষর ৭ মাত্রা
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।	=	৩ অক্ষর ৩ মাত্রা

উদ্ধৃতাংশে এক অক্ষর একমাত্রা ধরলে প্রতি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যার মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দেয়, তাতে চার মাত্রার পর্ব-বিভাগ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রীতি অনুযায়ী মাত্রানির্ণয় করলে উদ্ধৃতাংশের পর্ব-বিভাগ করার অসুবিধা হয় না।

২	২	২	২		
চিল	খায়	ঘুর	পাক	=৬+২	মাত্রা
১ ১	১ ১	১ ১	২		
ডালে	বসে	কাঁপে	কাক	=৬+২	,,
১ ১ ১ ১		১ ১	২		
আকাশেতে		বাজে	ঢাক	=৬+২	,,
	২	২	২		
	ড্যাঙ	ড্যাঙ	ড্যাঙ	=৬	,,

অর্থাৎ 'বর্ষা' মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ছড়া লেখার এই চেষ্টা বিস্ময়ের নয় কি? তবে ছন্দের ঢঙ যা-ই হোক, কবিতাটি সুখপাঠ্য।

ইতিপূর্বে প্রমথ চৌধুরীর রচনার গঠন-পারিপাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু ত্রুটি কি নেই? বীরবলী গল্প ও

প্রবন্ধের একটি তথাকথিত ত্রুটি—অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা। মূল বিষয়বস্তু বা কাহিনীর বহির্ভূত নানা কথার সমাবেশ তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'সুরের কথা' নামক প্রবন্ধের প্রথম অংশ (১) অবান্তর, তা না থাকলে প্রবন্ধটির অঙ্গহানি হতো না। মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত নানা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্যেই 'তর্জমা' প্রবন্ধটি অযথা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধের আরম্ভটা আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ বা ঐ জাতীয় আলোচনার দ্বারা পরিপূর্ণ। আর যে সমস্ত প্রবন্ধে অবান্তর বিষয়ের আলোচনা নেই, সেখানেও মাঝে মাঝে ছড়া কাটতে বা অপ্রাসঙ্গিক প্রবচনমূলক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। 'ছোটগল্প' নামক গল্পটির প্রথম দিকে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অহেতুক আলোচনা পাঠকের রসবোধকে কি পীড়িত করে না? 'আহুতি' গল্পে রুদ্রপুরের ধ্বংস কাহিনীর আগে যে দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তা গদ্যশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হোলেও গল্পের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয় কি? 'ফরমায়েসি গল্পের' কাহিনী পদে পদে বক্তা ও শ্রোতাদের অবান্তর তর্ক-বিতর্কের দ্বারা কণ্টকিত। 'বড়বাবুর বড়দিন' গল্পের বড়বাবুর চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা দেওয়া হয়েছে (এই প্রসঙ্গ গল্প-সাহিত্য অধ্যায়েও দ্রষ্টব্য)।

তবে প্রমথ চৌধুরী যে নিখুঁত প্রবন্ধ ও নিটোল গল্প লিখতে পারতেন—'খেয়াল খাতা', 'সবুজ-পত্র', 'ফাল্গুন, 'বর্ষার কথার' মতো প্রবন্ধ কিংবা 'চার-ইয়ারী-কথার' মতো গল্প তার নিদর্শন। তাই অবান্তর প্রসঙ্গের বিষয়টাকে অন্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে গণ্য করা হলেও প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে ঠিক ত্রুটি কিনা—তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। কারণ, আমরা আগেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরীর গল্প হচ্ছে

মজলিশী খোশগল্প, তাঁর প্রবন্ধ হচ্ছে মজলিশী আলোচনা। মজলিশী আলোচনা বা গল্প বস্তুতঃ কোনো নিয়ম মেনে চলে না। সেখানে পদে পদে নানা কূট তর্ক, তীক্ষ্ণ মন্তব্য, অকারণ অবারণ উক্তি স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক। আসলে এই ধরণের অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে মননধর্ম ও Wit-এর লীলাখেলা দেখানোর একটা সুযোগ প্রমথ চৌধুরী দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, তর্ক-বিতর্কমূলক আবহাওয়াতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তিকে জড়তামুক্ত ও শাণিত করার সম্ভাবনাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এই সমস্ত কারণেই মনে হয়, গল্পে কিংবা প্রবন্ধে অবান্তর বিষয়ের অবতারণাকে প্রমথ চৌধুরীর অক্ষমতা বা রচনাগত ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা উচিত কিনা সন্দেহ।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি অনেকটা প্রবন্ধধর্মী। অধিকাংশ গল্পেরই আরম্ভ দেখে ঠিক বোঝা যায় না, রচনাটি প্রবন্ধ না গল্প। বস্তুতঃ, লেখকের নিজেরও এই সম্বন্ধে সন্দেহ ছিলো। 'গল্প লেখা' নামক গল্পটির শেষে আছে ঃ

'আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দিও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ ?

—একাধারে ও দুই-ই।'

প্রকৃতপক্ষে কথাগুলি শুধু এই গল্পটি সম্বন্ধেই খাটে না, প্রমথ চৌধুরীর সব গল্প সম্বন্ধেই অল্প-বিস্তর খাটে। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, তাঁর প্রবন্ধগুলিও নাকি গল্পাত্মক হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। প্রবন্ধের চিরাচরিত টেকনিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো না বটে, কিন্তু তাই বলে তাঁর প্রবন্ধকে গল্পাত্মক বলার মতো প্রমাণ কোথায় ? গল্পের প্রবন্ধ হয়ে ওঠার উদাহরণ

আছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধের গল্প হয়ে ওঠার উদাহরণ নেই। 'গর্জন-সরস্বতী-সংবাদ' জাতীয় প্রবন্ধ কথোপকথনমূলক হলেও গল্প বলে সন্দেহ করার কারণ নেই। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা মননধর্মী, তাঁর সব রচনাই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। তাই তাঁর গল্পের প্রবন্ধ হয়ে ওঠার কারণ আছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধ গল্প হয়ে উঠবে কেন ?

নীল-লোহিত ও ঘোষাল প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য চরিত্র-সৃষ্টি। গল্প-বলিয়ে হিসেবে ঘোষালের তুলনা মেলা ভার। তবে তাঁর গল্পে গল্পরস যত আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে বাক্য ও বাক্যরস। 'ঘোষালের হেঁয়ালিতে' সখীরাণী ঘোষাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে: 'তার দু আনা গল্প আর পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা তর্ক অর্থাৎ বাক্যি।' সখীরাণীর এই মন্তব্য বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কারণ ঘোষাল প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। বীরবলের যে-কোনো গল্প পড়লেই নিটোল কাহিনীর চেয়ে কথার ফুলঝুরি ও তর্কের জটাজাল নিঃসন্দেহে বেশি করে চোখে পড়ে।

নানা প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করে প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য এতক্ষণ ব্যাখ্যা করা হলো। এইবার সমগ্রভাবে একটি প্রবন্ধ ও একটি গল্প বিশ্লেষণ করে দেখা যাক তাদের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে।

'বই পড়া' (শ্রাবণ, ১৩২৫) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। এযুগে আমরা বই পড়ি নে, সংবাদপত্র পড়ি। অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলে আমাদের সাহিত্যে অরুচি ধরে গেছে। এই মানসিক মন্দাগ্নি থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের বই পড়তে হবে। প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদের এই হচ্ছে মোটামুটি বক্তব্য। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে অবান্তর ভাবে স্থান পেয়েছে—(ক) এযুগের মানুষের অতিরিক্ত চা-পানের কথা (খ) চা-পানের

ফলাফল সম্পর্কে ইংরেজ কবির মন্তব্য (গ) চা-পান সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত। কি ভাবে মূল বক্তব্যের মধ্যে এই সমস্ত অতিরিক্ত কথা এসে গেলো, তা একটু বিচাব করে দেখা দরকার।

এযুগের মানুষের সংবাদপত্র পাঠেব বদ-অভ্যাস-ছাড়া আব কি বদ-অভাস আছে—এ-কথা চিন্তা করতেই তাঁর মনে পড়ে গেলো চা-পানের কথা। সঙ্গে সঙ্গে চা-পান সম্পর্কে ইংবেজ কবিব মন্তব্য লিপিবদ্ধ কবার এবং সেই সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ কবাব লোভ তিনি সংবরণ করতে পাবলেন না। তাছাড়া, চা আব সংবাদপত্রেব কথা এক সঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁর মনে হলো—অতিবিক্ত চা পানের ফলে যেমন আহারে অরুচি হয়, তেমনি অতিবিক্ত স বাদ পাঠেব ফলে মানসিক মন্দাগ্নি হয়। দু'য়ের ফলাফলের এই সামঞ্জস্যে খুশি হয়ে তিনি সেই পথেই বই পড়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনাব আসল সিদ্ধান্তে এসে পৌছোলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অবান্তর প্রসঙ্গেব ঘোরানো পথে নিজেব বক্তব্যের বথকে চালিয়ে নিতে প্রমথ চৌধুরী মনের দিক থেকে উল্লাস বোধ করেন। আর একটি কথা। নিজের সিদ্ধান্তে পৌছোনোব জন্যে তিনি এখানে যুক্তিই অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সে-যুক্তি একটু হালক ধবনের ; ভারে কাটে না, কাটে ধারে। তাছাড়া, কথাব আলঙ্কারিক মারপ্যাঁচ ও বাঁকা ভাবার নিদর্শনও এই অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ্য করি—(ক) চা-পান করলে নেশা না-হোক, চা-পানের নেশা হয় (খ) এই সত্যটার চারদিকে আজ প্রদক্ষিণ করবার সঙ্কল্প করেছি।

প্রবন্ধটিব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে নবম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুবী হিন্দুযুগে বই পড়া যে নাগরিকদের মধ্যে ফ্যাসান ছিলো এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিনি এতো বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যাতে পাঠকের পক্ষে আসল

বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখানে তাঁর কথা হচ্ছে—(ক) সাহিত্য-চর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকা উচিত নয় এবং কোনোও সভ্যজাতি কস্মিনকালে বঞ্চিত থাকার চেষ্টা করে নি। (খ) নিদ্রা কলহে দিন যাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা প্রশংসনীয় এ-কথা সংস্কৃতে বলা হয়েছে। (গ) কাব্যামৃত রসাস্বাদন করবার জন্যে সংস্কৃত কবির উপদেশ সেকালে কেউ গ্রাহ্য করতো কিনা, সন্দেহ আছে, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীরও সন্দেহ ছিলো। (ঘ) কিন্তু সম্প্রতি তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, হিন্দুযুগে নাগরিকদের মধ্যে বই পড়ার ফ্যাসান ছিলো। (ঙ) 'নাগরিক' শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ বাঙলায় নেই, ইংরেজীতে তাকে man-about-town বলা যায়। (চ) প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার পরিচয় হচ্ছে—সেকালে এদেশে যেমনি ত্যাগী পুরুষ, তেমনি ভোগী পুরুষ ছিলো। (ছ) ভারতবর্ষের আরণ্যক ধর্মের সঙ্গে আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে, কিন্তু নাগরিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ অনেকের কাছে অবিদিত। তাই সে-যুগের নাগরিক সভ্যতার দেহ ও আত্মার পরিচয় নেওয়া আমাদের কর্তব্য। (জ) সেকালের নাগরিক সভ্যতার বিবরণ আছে দেড় হাজার বছর পূর্বে ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের রচিত কামসূত্রে। (ঝ) তারপর কামসূত্র থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। (ঞ) সেই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের যথার্থ অর্থ অভিধান ও বিভিন্ন টীকার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গ-বহির্ভূত নানা অতিরিক্ত কথা এসে গেছে। যেমন 'নিচোল' শব্দ বাঙলায় কি অর্থে ব্যবহার করা হয় তারই আলোচনা। (ট) নাগরিক গৃহসজ্জার বর্ণনার মধ্যে বইয়ের কথা আছে। (ঠ) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সব বই কি পড়া হতো, না শুধু

ঘর সাজাবার জন্যেই সংগ্রহ করা হতো? (ড) টীকার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, সেকালের লোকেরা বই পড়তেন, ঘরে শুধু সাজিয়ে রাখতেন না। (ঢ) আর যে বই পড়া হতো, তা নিশ্চয়ই 'তখনকার বই', কারণ classical বই কেউ পড়ার জন্যে কেনে না। (ণ) বর্তমানে য়ুরোপের সভ্যসমাজেও দেখা যায়, 'এখনকার বই' পড়া ফ্যাসানের একটি অঙ্গ। (ত) ফরাসী নাগরিকেরা যেমন Anatole France তেমনি ইংরেজ নাগরিকেরা Kipling-এর বই পড়ি নি বলতে লজ্জা বোধ করে। (থ) বিলেতে এক ইংরেজ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়েছিলো; ভদ্রলোক Oscar Wilde-এর বই পড়ি নি বলতে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার কৈফিয়ৎ দিতেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তার কারণ, চল্‌তি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নেই জানলে তার দেশে কেউ তাকে বিদগ্ধ জন বলে মান্য করবে না। (দ) 'বিদগ্ধ' শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে Cultured, বাৎস্যায়নের মতে 'নাগরিক'। এদেশে পুরাকালে Culture জিনিসটা ছিলো নাগরিকতার একটি প্রধান গুণ। (ধ) সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্য পর্যায় শব্দ।

অনুচ্ছেদ কয়টির বিষয়বস্তুর এই সারসঙ্কলন থেকে অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না যে, অনেক অবান্তর কথা এখানে সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুতঃ, সারসঙ্কলনের (গ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ) (থ), (দ), (ধ), ইত্যাদি অংশগুলি না থাকলেও প্রবন্ধটির অঙ্গহানি হতো বলে মনে হয় না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিষয়ের মূলধারাকে ছেড়ে যত্র-তত্র চলে যাওয়াই প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব ছিলো। যুক্তিধারার অস্খলিত অনুসরণের চেয়ে একটা রসালাপে জমে-ওঠা মজলিশী আবহাওয়া গড়ে তোলাই তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। মনকে একেবারে ছেড়ে দিতে না পারলে তাঁর লেখা

সত্য সত্যই সাহিত্য হয়ে ওঠে না, এ-কথা তিনি নিজেই এক চিঠিতে বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে হয়। নাগরিক সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এখানে যে পরিমাণ আয়োজন করেছেন, তাতে তাঁর মধ্যে একটি বিদগ্ধ পণ্ডিতেরই সন্ধান পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যাতেও একটু বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশের চেষ্টা আছে (অবশ্য নিজের অনন্য ভঙ্গিতেই তিনি তা করেছেন, তাই তাঁর পাণ্ডিত্য কোথাও ভারসর্বস্ব হয়ে ওঠে নি)। তিনি একদা অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : ··· 'আমার যে পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা আছে, মাথায় কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে— তাই প্রমাণ করবার লোভ আমি সংবরণ করতে পারিনে।' রাধারাণী দেবীকে লেখা এক চিঠিতেও আছে : 'আমার অন্তরে একটি amateur scholar আছে এবং সে ব্যক্তি থেকে থেকে নিজেকেই জানান দিতে চায়।' আলোচ্য অনুচ্ছেদগুলি পড়বার সময় একথাগুলি বারে বারে মনে পড়ে। কিন্তু এখানে কোনো পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা আছে বলে তিনি নিজে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন, প্রবন্ধটির শেষ দিকে তাঁর মুখে শুনতে পাই : 'নাগরিক সভ্যতার উল্লেখটা, কতকটা ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া হয়েছে। একাজ আমি বিদ্যে দেখবার জন্য করিনি, পুঁথি বাড়াবার জন্যও করিনি। এই ডিমোক্রাটিক যুগে aristocratic সভ্যতার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যেই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।' প্রমথ চৌধুরীর এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

এখানে প্রমথ চৌধুরী একটি paradoxical উক্তিও করেছেন। Oscar Wildeর বই-পড়া সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'ও-সব বই পড়েছি স্বীকার করতে আমরা লজ্জিত হই।' এই ধরনের

উক্তি কি কখনো গ্রহণীয়? কারণ Oscar Wilde-এর বই পড়েছি এ-কথা বলতে গিয়ে আমরা বরং গর্বিত বোধ করি। আলোচ্য অংশে প্রমথ চৌধুরী সুযোগ মতো বিদ্রূপের পথও নিয়েছেন। 'নিজের কলমের কালি, লেখকেরা যে অমৃত বলে চালিয়ে দিতে সদাই উৎসুক, তার পরিচয় একালেও পাওয়া যায়।'—এই উক্তির মধ্যে লেখকদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ আছে, তবে সে-ব্যঙ্গে নির্মম জ্বালা নেই।

. এর পরের তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেও অবান্তর কথার অভাব নেই। কাউকে সখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ না দেবার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বাঙালা জাতির স্বভাবধর্ম, দুরবস্থা, রসবিমুখতা, শিক্ষামুখতা, শিক্ষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিজের বিশ্বাস, সে-বিষয়ে লোকের সন্দেহের কারণ—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তার সবই অত্যাবশ্যক নয়। গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্য সম্বন্ধে লোকের ঔদাসীন্য, অর্থ সম্বন্ধে সচেতনতা, গণতন্ত্রকে ভুল অর্থে গ্রহণ, আমাদের গণতন্ত্রের দোষগুলি আত্মসাৎ করার চেষ্টা—এই সব আলোচনাও ঠিক মূল প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ে না। যাঁরা হাজারখানা Law report কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কেনেন না—এ-কথা বলতে গিয়ে তিনি আইন ব্যবসা, নজির আওড়ানো, মামলায় হারা, জজের চরিত্র, পেশাদারের মহাভ্রান্তি ইত্যাদি কতো অতিরিক্ত কথাই না বলে ফেললেন। জ্ঞানের ভাণ্ডার ও ধনের ভাণ্ডারের মধ্যে পার্থক্য, মনের সমৃদ্ধির ওপর জ্ঞানের সমৃদ্ধির নির্ভরতা, মনের কাজে সাহিত্যের সহায়তা—ইত্যাদি যুক্তিপরম্পরার মধ্যে যথেষ্ট অতিকথনের প্রমাণ আছে; আলোচ্য অংশেও লেখক যে ভাবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন তাতে একদিকে তাঁর মনের বিচরণপ্রিয়তা ও মজলিশী মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে বক্তব্য বিষয়ে পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু এইভাবে মজলিশী আলোচনার ঢঙে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে অতি দ্রুত যত্র-তত্র চলে যাওয়ার মধ্যে আরেকটি বিপদও আছে—বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অসংলগ্নতা বা অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে। এখানেও বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্য না থাকলেও নিগূঢ় সামঞ্জস্যের অভাব যে আছে তাতে, কোনো সন্দেহ নেই।

আলোচ্য অনুচ্ছেদগুলিতে paradoxical উক্তি না থাকলেও অতিরঞ্জিত উক্তির অভাব নেই। যেমন—(ক) বই পড়ার সখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সখ ···। (খ) ডিমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, তাঁদের শিষ্যেরা তাঁদের কথা উল্টো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড় মানুষ। (গ) আমাদের মানতেই হবে যে, লাইব্রেরির মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। যে ধরণের বাক্যরচনায় প্রমথ চৌধুরী তৃপ্তি বোধ করতেন, তারও উদাহরণ এখানে পাই—'এযুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী'। অসার্থক অলঙ্করণ আলোচ্য অংশে অনুপস্থিত নয়—'দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মন-গঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে; এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।' প্রবচনমূলক সংক্ষিপ্ত উক্তির উদাহরণ হচ্ছে: 'ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।'

তার পরের চারটি অনুচ্ছেদে প্রমথ চৌধুরী অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি প্রথমেই এমন একটি অভিনব মন্তব্য করেছেন, যা শুনে পাঠকদের মধ্যে কেউ চমকে উঠতে পারেন, আবার কেউ বা রসিকতা মনে করে হাসতেও পারেন: 'আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল কলেজের চাইতে কিছু বেশি।' এই ধরণের উক্তির নব্যতা

অনস্বীকার্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা ও লাইব্রেরির শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের যে বিশ্লেষণ এখানে পাই—তা যেমনি প্রাঞ্জল, তেমনি সঙ্গতিপূর্ণ। কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় এর চেয়ে সুন্দরতরভাবে প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ। স্কুল কলেজের প্রদত্ত শিক্ষার ত্রুটি বোঝাতে গিয়ে মায়ের সন্তানকে জোর করে দুধ খাওয়ানো সম্পর্কে তিনি যে-সমস্ত কথা বলেছেন তা অবান্তর নয়; তাতে লেখকের মূল বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রচনাংশটির সাহিত্যিক সৌষ্ঠবও দেখা দিয়েছে। এই অনুচ্ছেদগুলিতে দু'একটি প্রবচনধর্মী সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি চোখে পড়ে—(ক) 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্ব-শিক্ষিত।' (খ) 'গুরু উত্তরসাধক মাত্র।' অন্যদিকে 'আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।'—এই ধরনের উক্তির মধ্যে যে অলঙ্করণ দেখি তাতে বীরবলসুলভ মৌলিকতা নেই।

শেষের তিনটি অনুচ্ছেদে প্রমথ চৌধুরী নোতুন কিছু বলেন নি; পূর্বোক্ত কথাগুলিকেই নোতুন করে ঝালাই করে নিয়েছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পেটের দায়ে বই পড়েন, তাই শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তি-মনকে সজাগ ও সবল করতে পারে না, জীবনে আনন্দ জাগাতে পারে না। জাতির মনের স্ফূর্তির পক্ষে এসমস্তই ক্ষতিকর। ব্যক্তির মন ও জাতির মনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে লাইব্রেরির মারফৎ আনন্দ আহরণ করা উচিত। কাব্যানন্দে আমাদের অরুচির কারণ আমাদের শিক্ষা—এ-কথা বলেই প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যচর্চার সপক্ষে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। শেষ অনুচ্ছেদটির মর্মকথার সঙ্গে প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে লেখক গ্রীক সভ্যতার প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই অনুচ্ছেদটি না থাকলেও প্রবন্ধটির কোনো ক্ষতি

হতো না। এখানেও প্রমথ চৌধুরী একটি paradoxical উক্তি করেছেন ; সাধারণতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কেতাবী বলা হয়ে থাকে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মতে তারা মোটেই কেতাবী নয়।

'বই পড়া' প্রবন্ধটি পড়লে প্রমথ চৌধুরীর লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। 'বহুবিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা'—তাঁর এই গুণটির সাক্ষাৎ এখানেও পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির প্রতিটি শব্দ তিনি যাচাই করেছেন, প্রতিটি বাক্যাংশের যথার্থ অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, অর্থ-ব্যাপারে যে যে সন্দেহ জাগে তারও উল্লেখ করেছেন—তারপর সকলের শেষে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অন্যত্রও দেখি, প্রতিটি মন্তব্যের পরিপোষক যুক্তি দিতে তাঁর আগ্রহ প্রচুর—কখনো বলছেন : 'আমার কথার আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য', আবার কখনো বলছেন : 'উপরোক্ত বর্ণনা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।' এই ধরনের বিচারপ্রাণতা ও যুক্তিনিষ্ঠাই প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য প্রমথ চৌধুরী এই প্রবন্ধের মধ্যে যে-সমস্ত যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, তার সবই যে গুরুগম্ভীর ও বিচারসহ এমন নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে যুক্তির ভান গ্রহণ করেছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন এমন ভঙ্গি নিয়েছেন—কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিষয়টাকে পাঠকের কাছে হাস্যকর করে তোলা, কিংবা পাঠকের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ স্পৃহা জাগিয়ে তোলা। যেমন তিনি বলেছেন : 'কামসূত্রের বর্ণনাকে আমরা সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য, যেহেতু কামসূত্রকে আমরা শাস্ত্র বলে গণ্য করে এসেছি এবং তার রচয়িতা ন্যায়দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন দেড়

হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছেন।' প্রাচীন বলেই এবং শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়ে এসেছি বলেই কোনো গ্রন্থের বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।—এই উক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য জোরালো যুক্তি নয় এবং এই যুক্তি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর নিজের মনেই খুব শ্রদ্ধা ছিলো বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। বস্তুতঃ, এই ধরনের যুক্তির বিরোধিতাই কি তিনি সারাজীবন করে আসেন নি? শাস্ত্রবাক্যকে আপ্তবাক্য বলে স্বীকার করার বিপক্ষে কি তিনি ছিলেন না? তবে হতে পারে পাঠকের মনে ধাঁধা লাগানোর উদ্দেশ্যেই তিনি এই উক্তি করেছেন।

'বই পড়া' প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বলবার ভঙ্গি যেমনি ঋজু তেমনি লঘু। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠি লিখেছিলেন: 'তোমার বইপড়া প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে। কিন্তু তারা এমন ভান করচে যেন তাদের কোন গৌরব নেই অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোন ধার ধারে না।'

সমস্ত প্রবন্ধটির মধ্যেই একটা মজলিশী আবহাওয়া আছে। অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটির মধ্যে যে অন্তঃসঙ্গতির অভাব দেখা দিয়েছে—তার কারণ, মজলিশী আলোচনার ঢঙেই প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। 'যদি অনুমতি করেন ত এই সুযোগে প্রাচীন ভারতবর্ষের নাগরিক সভ্যতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই,' 'আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যের বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেঁকে, তা হলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন', 'অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন', 'আপনাদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে'—ইত্যাদি বাক্য বা বাক্যাংশগুলিও 'বই পড়া' প্রবন্ধের মজলিশী ঢঙের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মজলিশে যেমন এক বা

একাধিক শ্রোতাকে সামনে রেখে আলোচনা চলে এবং সেই আলোচনার ঢঙ থেকেই শ্রোতার অস্তিত্ব বোঝা যায়, তেমনি এখানেও যেন পাঠককে শ্রোতার আসনে বসানো হয়েছে এবং আলোচনার ঢঙ থেকেই পাঠক-শ্রোতার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রবন্ধ রচনার এই মজলিশী রীতিটি আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে একটা নোতুন স্বাদ যে এনে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার 'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর' নামক গল্পটি বিশ্লেষণ করা যাক। গল্পটির পটভূমিকায় আছে একটি মজলিশ (নবতর-জীবন-সমিতি) এবং সেই মজলিশের সভ্য হচ্ছে রূপেন্দ্র, রসিক-লাল, নীল-লোহিত, লেখক ইত্যাদি। মজলিশে রূপেন্দ্র স্বয়ম্বর প্রথার সপক্ষে একটি বক্তৃতা করেন এবং মজলিশের নিয়মানুসারেই বক্তৃতার শেষে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়, তা-ই শেষ পরিণতি লাভ করে একটি স্বয়ম্বরের বর্ণনাতে। ফলে, গল্পটির আদি ও উদ্যোগপর্বে এমন সব আলোচনা ও ঘটনা আছে—স্বয়ম্বরের গল্পের সঙ্গে যার কোনো নিকট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

রূপেন্দ্রের 'মহাবক্তৃতার' যে তিনটি কারণ ও মজলিশের সভ্যদের মনোযোগের সঙ্গে সেই বক্তৃতা শোনার যে একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক রসিকতার অভাব নেই। মালশ্রী ও রাজা ঋষভরঞ্জনের উদ্ভট নামের সুযোগ নিয়ে নবতর-জীবন-সমিতির সভ্যদের সরস আলোচনা উপভোগ্য। উদ্যোগপর্বে নীল-লোহিতের লীল লাল সিংয়ে রূপান্তর গ্রহণ, সবরকম ভোজপুরী দেহাতী বুলিতে নীল-লোহিতের ছত্রীর দলকে ঠকানো, রাম গোলাম সিং ও রাম গোপাল সিংয়ের লীল. লালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব, ট্রেনের musical soiree-এর বর্ণনা, নীল-লোহিতের গানে ওস্তাদ হওয়া সম্বন্ধে আলোচনা, নুরনগর অভিমুখে quick march

করার কথা, বাঙালী লাঠিয়ালদের বর্ণনা, সকলের তাল পাকিয়ে ছাতু খাওয়া—ইত্যাদি প্রত্যেকটি চিত্র ব্যঙ্গাত্মক রসে ভরপূর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মজলিশের গাল-গল্প যেমন নানা অবান্তর আলোচনার দ্বারা কণ্টকিত, তেমনি এই গল্পটিও নবতর-জীবন-সমিতির সভ্যদের আলাপ-আলোচনা ও নানা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার দ্বারা জর্জরিত। মূল গল্পের দিকে চলতে চলতে লেখক কেবলই এদিক-ওদিক তাকিয়েছেন, এবং নানাচিত্র ও চরিত্রের বিদ্রূপাত্মক সরস বর্ণনা দিয়েই গল্পের প্রায় অর্ধেক জমিয়ে তুলেছেন। মূল স্বয়ম্বর গল্পে পৌঁছোবার কোনো তাগিদ বা আগ্রহ যেন তাঁর নেই। নীল-লোহিত নবতর-জীবন-সমিতির সভ্যদের উদ্দেশে বলেছেন: 'তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি।···গল্প যাক চুলোয়, তার আশে-পাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই দেখতে চাও।' আসলে এই স্বভাব শুধু নীল-লোহিতের শ্রোতাদের নয়, এই স্বভাব হচ্ছে গল্পের লেখক স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীরও।

এই গল্পে অনেক চরিত্র আছে এবং সেইসব চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির ব্যঙ্গ-রূপও ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোনো চরিত্রই লেখকের দ্বারা 'সৃষ্ট' নয়, সবই তাঁর দ্বারা 'বর্ণিত'। গল্পের চরিত্র যখন সক্রিয় জীবনধর্মের রূপবৈচিত্র্য ও বহুবিধ প্রকৃতি-রহস্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে না, বরং লেখকের কলমের কারিগরিতেই রূপ লাভ করে, তখন তাদের ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবন্ত মানুষ নয়, কলের মানুষ বলেই মনে হয়। 'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বরে' এক নীল-লোহিত ছাড়া সবই যেন লেখকের খুশিমাফিক এক একটা কলের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক গল্পে এই ধরনের কলের মানুষ রূপায়িত করাই প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য।

সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাণিপ্রার্থীকে এক একটি 'বাঁদর' করে তোলাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য। প্রমথ চৌধুরী সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি দিয়ে সভাটি সাজিয়েছেন এবং প্রত্যেককে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যাতে মনে হয়, তাদের সকলের সঙ্গে তাঁর ঠাট্টার সম্পর্ক। এই ধরনের বিদ্রূপপরায়ণতা বা পরিহাস-মুখিতাই প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গল্পের শেষে মালশ্রীর অসঙ্গত ও খেলো আচরণ পাঠকের প্রত্যাশাকে কঠিন আঘাত হানে। যখন বাঁদরজাতীয় বিভিন্ন পাণিপ্রার্থীকে উপেক্ষা করে মালশ্রী নীল-লোহিতকে বরণ করলো, তখন তার নারীজীবনকে ঘিরে পাঠকের সহানুভূতি ঘন হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, গল্পটি 'মধুরেণ' সমাপ্ত হবে মনে করে পাঠকের মধ্যে ততক্ষণে মধুর আমেজ জমে এসেছে। এমনি চরম মুহূর্তে স্বয়ং মালশ্রীকে একটি 'বাঁদরে' পরিণত করে লেখক পাঠকের দুর্বলতা ও প্রত্যাশাকে উপহাস করলেন! বস্তুতঃ, গল্পের চিরাচরিত উপসংহারকে ও মানুষের জীবন-সমস্যার পরিচিত পরিণতিকে নিয়ে এইভাবে বিদ্রূপ করাই প্রমথ চৌধুরীর স্বভাব। গল্পের এই জাতীয় পরিকল্পনা ও রূপায়ণ দেখে সকল পাঠকের খুশি না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ পেট ভরাবার মতো কিছু মিষ্টান্ন মুখের কাছে নিয়ে ছিনিয়ে আনার রসিকতাটা সকল পাঠকের পক্ষে সুখকর হবে এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু যারা হৃদয়ের সজলতার চেয়ে বুদ্ধির হীরক-দ্যুতিকে বেশি পছন্দ করেন, তাদের কাছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের রচনারীতির অভিনবত্ব নিশ্চয়ই অখুশির কারণ হবে না।

গল্পটির সভাপর্বে প্রমথ চৌধুরীর রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। প্রত্যেকটি পরিবেশ-চিত্র ও চরিত্র-চিত্র সংক্ষিপ্ত, অথচ উজ্জ্বল। মালশ্রীর স্বয়ম্বর-সভা-পরিক্রমা, মিস্ বিশ্বাস কর্তৃক প্রত্যেক পাণি-

প্রার্থীর পরিচয় প্রদান এবং একটিমাত্র শব্দ—'advance'—ব্যবহার করে মালশ্রীর একে একে সকলকে বর্জন করার যে বর্ণনা এখানে আমরা পাই তা যেমন বাহুল্যবর্জিত, তেমনি শাণিত। চিত্রটি যেন ইস্পাতের মূর্তির মতো কল্পনার ফার্নেস থেকে উঠে এসেছে। এই ধরনের শিল্প-সৌন্দর্য বাঙলা সাহিত্যে বিরল। 'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর' নামক গল্পটি সম্পূর্ণভাবে প্রবন্ধাত্মক না হলেও গল্পের স্বাভাবিক রূপ যেন তাতে নেই। প্রবন্ধ যেমন বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক হয়, গল্পটির গঠনও মাঝে মাঝে সেই ধরনের। গল্পটিতে চরিত্রগুলির জীবন-চর্যার ছবি আমরা নিজের চোখে দেখতে পাই নে, তার বর্ণনা আমরা লেখকের মুখে শুনতে পাই। তাই গল্পটি সমগ্রভাবে প্রবন্ধাত্মক না হলেও প্রবন্ধের কিছু বৈশিষ্ট্য তাতে আছেই।

নীল-লোহিত স্বয়ম্বরে 'tragedy' বর্ণনা করতে গিয়ে 'serious' হওয়ার ভান করেছে। শ্রোতাদের উদ্দেশে তার মন্তব্য হচ্ছে: 'বাঙালী জাতটে হাড়ে ছিবলে। কোনও serious জিনিষ তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না।' বস্তুতঃ, তার এই কৃত্রিম গাম্ভীর্য স্বয়ম্বরের ঘটনাকে ট্র্যাজিক করতে সাহায্য করে নি, তাকে একটা 'roaring farce'-এ পরিণত করে ফেলেছে। লেখকের অভিপ্রায়ও তা-ই। অন্যত্রও হাস্যরস উৎসারিত ও ঘনীভূত করবার জন্যে তিনি এই রীতি অবলম্বন করেছেন।

যে-ধরনের বাক্য-রচনার মধ্য দিয়ে গল্পটিতে বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস দেখা দিয়েছে, তার উদাহরণ হচ্ছে:

(ক) তুমি যদি ওঁকে বরণ করো ত উনি তার পরদিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন,—Lords Cricket Ground-এ ম্যাচ খেলতে।

(খ) ইনি বল্ ঠেকান শুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে।

(গ) ঐ যে ওঁর দু'হাত জোড়া দু'টো পাঁউরুটি রয়েছে, ও bread নয়—stone। ও-রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙ্গে আর দাঁতকপাটি লাগে।

(ঘ) ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম, সে কতকটা রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোলজাতীয় হকি-খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ্ লেগে।

(ঙ) এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলি গোছের, তার কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মত বলের দরকার নেই, কৃষ্ণের মত ছলই যথেষ্ট।

(চ) শুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস্ বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেল্‌তে লাগ্‌লেন।

(ছ) এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান দোখতা খেতে আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে।

'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পে প্রমথ চৌধুরীর রসিকতা সর্বত্র উঁচু শ্রেণীর নয়। যেমন—

(ক) এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁইই হয়ে থাকে। (অর্থাৎ যার নাম ঋষভ, তার গলা বাজখাঁইই হয়ে থাকে।)

(খ) আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মত,—আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন। এই ধরনের রসিকতাকেই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'বস্তাপচা'।

গল্পস্থিত কতকগুলি তুলনামূলক বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) দরওয়ানের সঙ্গে (গানের) ওস্তাদের তফাৎ কি ? দু'জনেই ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দু'জনেই মুগুর ও সুর ভাজে। কেন, তুমি কখনও কোন পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে

দেখো নি? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ,—যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।

(খ) ভোজপুরীদের সঙ্গে (বাঙালী) লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরীরা পাহারাওয়ালা।

(গ) পটলডাঙ্গার পণ্ডিতেরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠের খেলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় সমতুল্য, আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

Paradoxical উক্তির উদাহরণ:

(ক) মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মত মাথা ঘিরে রয়েছে।

(খ) শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

গল্পটিতে যে সামান্য সংলাপ আছে, তার মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের অভাব নেই। স্থানবিশেষে অস্ত্যর্থক ও ন্যস্তর্থক বাক্য পাশাপাশি সংযোজন করে তিনি সংলাপের মধ্যে তীক্ষ্ণতা এনেছেন। যেমন—

'—সেখানে যাই কি করে?

—নামরূপ ভাঁড়িয়ে।

—কি সেজে?

—বর সেজে নয়।'

প্রবচনমূলক সংক্ষিপ্ত উক্তির উদাহরণ:

(ক) ভক্তিরস অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

(খ) বড় মানুষের খোশ-খেয়ালও ত একরকম idealism.

'নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর' প্রধানতঃ বর্ণনামূলক গল্প। গল্পস্থিত বর্ণনাপ্রাচুর্যের মধ্যে 'epigram' বা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের অভাব নেই। গল্পটিতে অনেক অবান্তর ঘটনা বা দৃশ্য বা চরিত্রের বর্ণনা আছে—সে বর্ণনা অনেক সময় এসে গেছে epigram-এর টানে। আদিপর্ব ও উদ্যোগপর্বের সঙ্গে মূল গল্পের নিগূঢ় যোগ নেই—তথাপি এই পর্ব দু'টি যে সুখপাঠ্য, তা কি অন্ততঃ অংশতঃ epigram-চর্চার জন্যে নয়? পূর্বে যে তুলনামূলক বর্ণনার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে—তার মধ্যে কি epigram-এর লীলা নেই? পাণিপ্রার্থীদের চরিত্র-চিত্রণকে সার্থক করতে epigram কি সাহায্য করে নি? বস্তুতঃ, epigram যে রচনারীতিকে অভিনব করে তোলে এ-জ্ঞান প্রমথ চৌধুরীর একটু বেশিই ছিলো। মনে হয়, বীরবলের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষপর্বী উপন্যাসগুলিতে epigram-এর অফুরন্ত চর্চা করেছিলেন।

নিচের উদাহরণে 'idealist' শব্দটি নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর বাক্-চাতুরী লক্ষণীয়ঃ

'আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist। একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটিকে কার্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না।'

এই হলো প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচ্য বিষয়। একটা কথা এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য রচনাকে একটা সাধনা বলে মনে করতেন, অকাজ নয়। মনে অনুভূতি থাকলে রচনা 'সরস' হতে পারে, কিন্তু চেষ্টা না থাকলে 'সুন্দর' হয় না—এ কথা তিনি জানতেন। আরো জানতেনঃ 'ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনিই হয়।' তাই সাহিত্যের ফুল ফোটাতে গিয়ে অন্যমনস্কতা, অবহেলা থাকলে

চলে না ; থাকা চাই সযত্ন স্বচ্ছন্দ সাধনা। এই সব কারণেই বীরবল ধরে লিখতেন, অবলীলাক্রমে নয় ; তারপর সে-লেখা কেটে, ছেঁটে, ঘসে এক কথায় চতুর ও উজ্জ্বল করতে চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। যত্ন, মন ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে লিখতেন বলেই প্রমথ চৌধুরীর ষ্টাইলে নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তরকালের সাহিত্যিকদের রচনারীতির ওপর প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির প্রভাব কতখানি—এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের মনে হয়, ওই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এখনো আসে নি। প্রমথ চৌধুরী বাঙলা সাহিত্যে যে মনন-সাধনার সূত্রপাত করেছেন, যে অভিনব রচনারীতি প্রবর্তন করেছেন—নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যেই তা এখনো আশানুরূপ বিস্তার পায় নি। বাঙলার জলো আবহাওয়ায়, রবীন্দ্রনাথের মাধুর্যময় কাব্যপরিবেশে ও শরৎচন্দ্রের তরল হৃদয়ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। যেদিন প্রমথ চৌধুরীর মননধর্মকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার জন্যে বাঙালীর মানসিক প্রস্তুতি দেখা দেবে—সেইদিন তার রচনারীতিও বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অনেকটা অপরিহার্য হয়ে উঠবে ; কারণ বীরবলী মননধর্ম ও রচনারীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইতিমধ্যে রাবীন্দ্রিক রচনারীতির ব্যর্থ অনুকরণের (রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীর অনুকরণ অসম্ভব বলেই মনে হয়—তাঁর চিত্ররচনা-কৌশল, অলঙ্করণ-পদ্ধতি, গঠন-সৌষ্ঠব সাধারণ লেখকের অনায়ত্ত অলৌকিক প্রতিভার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়) ও বঙ্কিমী রচনারীতির অপেক্ষাকৃত সার্থক অনুসরণের ফাঁকে ফাঁকে বাঙলা সাহিত্যে বীরবলী রচনারীতির অনতিলক্ষ্য অনুবর্তন চলছে—অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (এঁর মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বীরবলী পন্থাই গ্রহণ করেছেন), সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুজতবা আলী, রঞ্জন

ইত্যাদি বহু লেখকের লেখার মধ্যেই তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে (সবুজপত্রীদের ওপর বীরবলের প্রভাবের কথা 'সবুজ-পত্র' অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের বাঙলা সাময়িক পত্রিকাগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয়, বর্তমান সময়ে প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির অনুসরণ (সার্থক বা অসার্থকভাবে) যেন অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে চলেছে। বস্তুতঃ, অধুনা বিশ্ব-সমাজ অচৈতন্য থেকে চৈতন্যের দিকে যে-ভাবে এগিয়ে চলেছে, বিশ্ব-সাহিত্য মনন-ধর্মের আশ্রয়ে যে-ভাবে বিকশিত হচ্ছে—বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যকে যদি তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়—তবে একদিন প্রমথ চৌধুরীর মননধর্ম ও রচনারীতিকে গ্রহণ করতেই হবে। সেদিন বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে সুদিন।

পরিশেষে জি. কে. চেষ্টারটন্ সম্বন্ধে ক্রিষ্টোফার হোলিস-এর কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। চেষ্টারটনীয় ষ্টাইলের আলোচনায় তিনি বলেছেন: "He wrote thus because he thought thus. He wrote thus because he could not write otherwise'. প্রমথ চৌধুরীর ষ্টাইল সম্পর্কেও পাঠকদের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

পরিশিষ্ট—১

গ্রন্থ-পরিচয়

বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের তারিখ প্রথমে, পরে বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থের ভূমিকা, উৎসর্গ ইত্যাদির তারিখ দেওয়া হলো।

১। তেল-নুন-লকড়ি (প্রবন্ধ-গ্রন্থ)—এই গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ সঠিকভাবে জানা না গেলেও এটিই যে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ গ্রন্থটি ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে বলে অনুমান করেন। পৃষ্ঠা ৪৮। মূল্য দেওয়া নেই। গ্রন্থটি ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে হরলাল ব্যানার্জী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা 'ঘোষ-প্রেস' থেকে এম্-এন্-ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত হয়।

সূচী-পত্র—ইঙ্গ-বঙ্গ জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা।

২। সনেট-পঞ্চাশৎ (কবিতা-সংগ্রহ)—১৯১৩ (ফাল্গুন, ১৯১৩)। পৃষ্ঠা ৫০। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র—সনেট, ভাষ; জয়দেব; ভর্তৃহরি; চোরকবি; বসন্তসেনা; পত্রলেখা; তাজমহল, বাঙ্গলার যমুনা; Bernard Shaw, বালিকা-বধূ, বন্ধুর প্রতি; ব্যর্থজীবন; মানব-সমাজ; হাসি ও কান্না; ধরণী, কাঁঠালী চাঁপা; করবী; কাঠ-মল্লিকা; রজনাগন্ধা, গোলাপ; ধুতুরার ফুল, অপরাহ্ণ, ব্যর্থ বৈরাগ্য, অন্বেষণ; আত্মপ্রকাশ, বিশ্বরূপ, শিব; বিশ্ব-ব্যাকরণ; বিশ্বকোষ; সুরা, রূপক; একদিন; ভুল; হাসি; রোগ-শয্যা, মুস্কিল-আশান্, বাহার, পূরবী; শিখা ও ফুল, গজল; পাষাণী; প্রিয়া; পরিচয়, ফুলের ঘুম; স্মৃতি; প্রতিমা, উপদেশ; স্বপ্ন-লঙ্কা, আত্মকথা।

৩। চার-ইয়ারী-কথা (গল্প-গ্রন্থ)—১৯১৬ (জানুয়ারী, ১৯১৬ গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ নয়, গল্পটি লেখার তারিখ)। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৯৭। মূল্য দেওয়া নেই।

সূচী-পত্র -গল্পটির পাঁচটি অংশ আছে—ভূমিকা, সেনের কথা, সীতেশের কথা, সোমনাথের কথা, আমার কথা।

৪। বীরবলের হালখাতা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯১৭ (১৩২৪—'বীরবলের হালখাতার' যে সংস্করণ 'বিশ্বভারতী' ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত করেন, তাতে প্রথম প্রকাশের এই তারিখ দেওয়া আছে)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ২৭৮। মূল্য দেওয়া নেই।

প্রমথ চৌধুরী

সূচী-পত্র—হালখাতা ; কথার কথা ; আমরা ও তোমরা ; খেয়ালখাতা ; মলাটসমালোচনা . সাহিত্যে চাবুক্ ; তরজমা ; বইয়ের ব্যবসা ; বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ ; নোবেল প্রাইজ ; সবুজ-পত্র ; বীরবলের চিঠি ; যৌবনে দাও রাজটীকা ; ইতিমধ্যে ; বর্ষার কথা ; পত্র ১ ; কৈফিয়ত ; নারীর পত্র ; নারীর পত্রের উত্তর ; চুটকি ; সাহিত্যে খেলা ; শিক্ষার নব আদর্শ ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল ; পত্র ২ ; প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস : টীকা ও টিপ্পনি , শিশু-সাহিত্য ; সুরের কথা ; রূপের কথা ; ফাল্গুন।

৫। নানা-কথা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯১৯। পৃষ্ঠা ৩৬২। মূল্য দেড় টাকা।

সূচী-পত্র—তেল-নুন-লকড়ি ; বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাঙলা ওরফে সাধুভাষা ; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা , বাঙলা ব্যাকরণ ; সনেট কেন চতুর্দশপদী ? ; ব্রাহ্মণ মহাসভা ; সবুজ-পত্রের মুখপত্র ; সাহিত্য-সম্মিলন , ভারতবর্ষের ঐক্য ; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র ; বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ , নূতন ও পুরাতন ; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ? , অভিভাষণ ; বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য ; অলঙ্কারের সূত্রপাত ; আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ ; আর্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয় ; সালতামামি ; প্রাণের কথা।

৬। পদ-চারণ (কবিতা-সংগ্রহ)—১৯২০ (১৯১৯)। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৮৪। মূল্য বার আনা।

সূচী-পত্র—ওঁ ; বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ; কবিতা লেখা ; বন্ধুর প্রতি ; ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা ? ; পূর্ণিমার খেয়াল ; 'The Book of Tea' ; সনেট-সুন্দরী ; অকাল বর্ষা (ভীমভাব) ; বর্ষা (কান্তভাব) , সনেট চতুষ্টয়—কবিতা, কাব্যকলা, আমার সনেট, আমার সমালোচক ; সনেট-সপ্তক , বর্ষা (ছড়া) , কৈফিয়ৎ (Terza Rima ছন্দে) ; পত্র ; দুয়ানি ; বনফুল ; চেরি পুষ্প ; ভাল তোমা বাসি যখন বলি ; প্রেমের খেয়াল ; দ্বিজেন্দ্রলাল ; স্নেহ-লতা ; খেয়ালের জন্ম (Terza Rima) ; তেপাটি (Triolet) —উষা, মধ্যাহ্ন ; সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রি ; মিলন ; বিরহ ; ছোট কালীবাবু , সমালোচকের প্রতি ; দোপাটি (গাথা সপ্তশতী থেকে অনূদিত) ; সিকি ; দুয়ানি ; সনেট ; খস্‌'ং ; তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন ; শরৎ ; সংসার ; কবির সাগর-সম্ভাষণ।

'উৎসর্গপত্রে' লেখক বলেছেন :—'গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason। এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই, সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।'

পরিশিষ্ট

৭। আহুতি (গল্প-সংগ্রহ)—(১৯১৯)। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১৯৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

সূচী-পত্র—আহুতি; বড়বাবুর বড় দিন; একটি সাদা গল্প; ফরমায়েসি-গল্প; ছোটগল্প; রায় ও শ্যাম।

৮। আমাদের শিক্ষা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯২০। পৃষ্ঠা ১০৪। মূল্য দশ আনা।

সূচী-পত্র—আমাদের শিক্ষা; বাংলার ভবিষ্যৎ, বই পড়া, আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্যা; নব-বিদ্যালয়, নব-বিদ্যালয় (২), নব-বিদ্যালয় (ভাষা-শিক্ষা)।

'ভূমিকায়' লেখক বলেছেন—'যে সাতটি প্রবন্ধ একত্র করে ছাপাচ্ছি, তার প্রথমটি বাদে বাকী কটি সবই ফরমায়েসি লেখা অর্থাৎ পরের অনুরোধে লেখা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এ তিনটি প্রবন্ধ তিনটি বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন সময়ে উক্ত। অতএব এ কটির মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু এখন পড়ে দেখছি যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মূল মতগুলি এ কটি লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমি দেশের লোককে এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হলে আমরা যথার্থ শিক্ষিত হব না। তৃতীয় প্রবন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইংরাজিতে যাকে বলে culture আর সংস্কৃতে বৈদগ্ধ্য, সেটি হচ্ছে সভ্যতার একটি উচ্চাঙ্গ এবং এ অঙ্গ পুষ্ট করবার প্রধান উপায় সাহিত্য চর্চা। চতুর্থ প্রবন্ধে আমি দুটি জিনিষের প্রতি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছি। আমার প্রথম কথা এই যে, স্কুলের শিক্ষা কাঁচা হলে কলেজের শিক্ষা ব্যর্থ হয়। সুতরাং স্কুলের শিক্ষার যাতে উন্নতি হয় সেই বিষয়ে প্রধানত সকলের উদ্যোগী হতে হবে। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, যে শিক্ষার বলে মানুষে কৃতী বৈশ্য হয় একমাত্র সে শিক্ষা আমাদের মধ্যে চলবে না এবং যদি চলে তার ফলও ভাল হবে না। বাঙালা জাতির মনে যে সহজ ব্রাহ্মণবুদ্ধি আছে সেটিকে নষ্ট করা, আর বাঙালার বিশেষত্বকে নষ্ট করা একই কথা।..... নব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনটি মাত্র প্রবন্ধ লিখে থামবার কারণ--তারপর যে সব বিষয়ের আলোচনা করতে হত, সে সব শিক্ষক ব্যতীত অপর কারও পক্ষে তেমন মনোজ্ঞ হত না।'

৯। নু-ইয়ারকি (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯২১ (ভূমিকার তারিখ—২৯শে জুলাই, ১৯২০)। পৃষ্ঠা ৶০ (ভূমিকা) + ১৭৫ (মূলগ্রন্থ)। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র—নু-ইয়ারকি, দেশের কথা (১); দেশের কথা (২), রায়তের কথা, নবযুগ।

'ভূমিকায়' লেখক বলেছেন: 'আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সাময়িক প্রসঙ্গ, এ প্রবন্ধ কটি তাই নিয়ে লেখা। সুতরাং প্রবন্ধ কটির ভিতর স্পষ্টত কোন যোগাযোগ নেই। তবুও এ কটি একত্র করে ছাপাবার কারণ, সব কটির ভিতর একটি আন্তরিক মিল আছে। গত চার বৎসরের ভিতর এদেশে যে সব রাজনৈতিক সমস্যা উঠেছে সেগুলির মর্ম আমি

একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি; কাজেই যে-দেশে মানুষের বর্তমান রাজনৈতিক মনোভাবের জন্ম সে দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিতে বাধ্য হয়েছি। আমার বিশ্বাস সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেখলে তার স্বরূপ আমাদের চোখে পড়ে না। মতামতের একটা ইতিহাস আছে, মানুষের মনোভাবও আচম্বিতে জন্মায় না। এবং সে ইতিহাসের জ্ঞানলাভ করলে আমাদের মতামত ভেঙ্গে পড়ে না, বরং তার ভিত আরও পাকা হয়।......এ প্রবন্ধ কটি যতদূর পারি সহজ করে সরল কবে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়েব নিকট এ প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সর্বজনবোধ্য হয়নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি তার চাইতে বেশী দোষী আলোচ্য বিষয়।'

১০। বীরবলের টিপ্পনী (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯২১ (১৩২৮)। পৃষ্ঠা ১২৪। মূল্য দেওয়া নেই।

সূচী-পত্র—কংগ্রেসের দলাদলি, 'এত্তো বড়' কিম্বা 'কিছু নয়'; সাহিত্য বনাম পলিটিক্স্; টীকা ও টিপ্পনী, পত্র; গত কংগ্রেস। পবিশিষ্ট—গুলিখোরের আবেদন-পত্র; গর্জন-সরস্বতী সংবাদ।

'মুখপত্রে' লেখক বলেছেন: 'দেশে যখন লর্ড কার্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে—যাঁদেব চোখ ও মুখ এক সঙ্গে দুই ফোটে--তাঁদেব মধ্যে আমিও ছিলুম একজন। সে সময়ে আমি স্বনামে বেনামে যে সকল লেখা লিখি--তার মধ্যে দুটি পুনঃ প্রকাশিত করছি। আমাব বিশ্বাস এ লেখা দুটি বাসি হলেও বিরস হয়নি, অতএব পাঠকদের কাছে অরুচিকর হবেনা। এর একটির বিষয় হচ্ছে University Bill অপরটির দিল্লীর দরবার। দুটিই ১৯০২ খৃঃ ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকী লেখাগুলি সবই কালকের। সুতরাং আশা করি আজ একদম সেকেলে হয়ে যায়নি। আর যদি বা তাই হয়ে থাকে তাহলে সেগুলির একটা মূল্য আছে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক মূল্য।'

১১। রায়তের কথা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯২৬। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ১।৴ (ভূমিকা ও টীকা)+৮০ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য বার আনা।

সূচী-পত্র—রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা; গ্রন্থকারের টীকা; রায়তের কথা; অভিভাষণ (উত্তর-বঙ্গ রায়ত কন্‌ফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ); পত্র।

'মুখপত্রে' লেখক বলেছেন: 'আমার লেখা রায়তের কথা যখন সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে, এ বিষয়ে তাঁর মতামতসম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য। এ লেখা 'টীকাসমেত' রায়তের কথার ভূমিকাস্বরূপে প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।'

পরিশিষ্ট

১২। প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী—১৯৩০। পৃষ্ঠা ৩১১। মূল্য দেড় টাকা।

সূচী-পত্র—চার-ইয়ারী-কথা (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) : আহুতি (সম্পূর্ণ গ্রন্থ), পদ-চারণ (সম্পূর্ণ গ্রন্থ); সনেট পঞ্চাশৎ (সম্পূর্ণ গ্রন্থ); বীরবলের হালখাতা (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ), অদৃষ্ট (একটি গল্প); সম্পাদক ও বন্ধু (একটি গল্প), কথা-সাহিত্য (একটি প্রবন্ধ), পূজার বলি (একটি গল্প), গল্প লেখা (একটি গল্প), নীল-লোহিত (একটি গল্প), নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা (একটি গল্প); সহযাত্রী (একটি গল্প), ভাববার কথা (একটি গল্প), দু-ইয়ারকি (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ), তেল, নুন, লকড়ি (সম্পূর্ণ গ্রন্থ), নানা-কথা (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ), "বীরবলের টিপ্পনী (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, 'দু-ইয়ারকির' অন্তর্গত 'নবযুগ' প্রবন্ধটি এর সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে), রায়তের কথা (অসম্পূর্ণ গ্রন্থ)।

১৩। নানা চর্চা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯৩২ (উৎসর্গ পত্রের তারিখ—১লা মার্চ, ১৯৩২। মুখপত্রের তারিখ—২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২)। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ২৭৬। মূল্য দেড় টাকা।

সূচী-পত্র- ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি; অন্-হিন্দুস্থান, মহাভারত ও গীতা, বৌদ্ধধর্ম; হর্ষ-চরিত; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজলী খাঁ, বীরবল; ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায়, বাঙালী পেট্রিয়টিজম্, পূর্ব ও পশ্চিম, যুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?, ভারতবর্ষ সভ্য কিনা; গোলটেবিল বৈঠক।

'মুখপত্রে' লেখক বলেছেন: 'এ গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ একত্র করা হয়েছে' যদিচ সেগুলি নানাসময়ে নানাবিষয়ে লেখা, তবুও এগুলির ভিতর একটি যোগসূত্র আছে, এ সবগুলিই আমাদের দেশের বিষয় আলোচনা। এ একরকম ভারতবর্ষের হিস্টরি জিওগ্রাফির বই। হিস্টরি বলছি এই জন্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে যেমন এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, তেমনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলেও এক জাতীয় প্রবন্ধ আছে। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তিকে অবলম্বন করে যে প্রবন্ধ লেখা হয়, তাকেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা যায়। আশা করি এ প্রবন্ধগুলি পাঠকদের মনে ভারতবর্ষের বিচিত্র অতীত এবং বর্তমান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রেক করবে।'

১৪। নীললোহিত (গল্প-সংগ্রহ)—১৩৩৯? শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা—১৩১। মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র—নীল-লোহিত, নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা, নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর; অদৃষ্ট; সম্পাদক ও বন্ধু, গল্প লেখা, পূজার বলি; সহযাত্রী; ঝাঁপান খেলা, দিদিমার গল্প; ভূতের গল্প।

১৫। নীল-লোহিতের আদিপ্রেম—(গল্প-সংগ্রহ)—১৩৪১?। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১০৫। মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র——নীল লোহিতের আদিপ্রেম , ট্রাজেডির সূত্রপাত , অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি , অ্যাড্‌ভেঞ্চার—স্থলে , অ্যাডভেঞ্চার—জলে , ভাববার কথা।

'উৎসর্গ-পত্রে' লেখক বলেছেন : 'আমার এদানিকের লেখা ক'টি গল্প তোমাকে উপহার দিচ্ছি। পড়ে ফেলো, হয়ত মন্দ লাগবে না, যদিচ গল্প কটি পাঁচমিশালী। আর সব ক টিকে গল্প বলা যায় কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে এ লেখাগুলিকে গল্প বলছি এই কারণে যে, এ যুগে গল্প সাহিত্যের কোন ধরাবাঁধা বিষয়ও নেই, রূপও নেই। একালে, প্রবন্ধ হোক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত হোক যে লেখার ভিতরে মানুষের মনের কিংবা চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় তাই গল্প বলে গ্রাহ্য হয়।'

১৬। ঘরে বাইরে (প্রবন্ধ সংগ্রহ)—১৯৩৬ (২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৬)। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ১২৭। মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র—প্রথম প্রস্তাব (১৩৪০ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিরোধ, হিন্দু সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর অনশন ইত্যাদির আলোচনা), দ্বিতীয় প্রস্তাব (আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন, বাঙলা ভাষায় অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনার সম্ভাব্যতা, গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত ভারতীয় শাসনতন্ত্র, দেশে শিক্ষার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা), তৃতীয় প্রস্তাব (সাহিত্যিকের রাজনীতি আলোচনা করার অধিকার, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন, পুণা সম্মেলন ও কংগ্রেস, বাঙলার রাজনীতি, ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা), চতুর্থ প্রস্তাব (আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা, বাঙলাকে শিক্ষার বাহন করার যৌক্তিকতা, সাধু বনাম চলতি ভাষা, বীরবলী ভঙ্গী, বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা), পঞ্চম প্রস্তাব (পুজো, বিজয়া, ভাসান, পত্রিকার পুজো-সংখ্যা, উদয়ন পত্রিকার পুজো সংখ্যা, বাঙলা বানান সমস্যা, বীরবলের পুনরাবির্ভাবের অসম্ভাব্যতা ইত্যাদির ওপর আলোচনা), ষষ্ঠ প্রস্তাব (শিকার, শিকারকাহিনী, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, Wells ও Shaw, ভারতবর্ষের স্বরাজ, Parliamentary Democracy ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা), সপ্তম প্রস্তাব (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাস্ত্র, বসুবন্ধুর সমাজ ও রাজসৃষ্টি সম্বন্ধে মত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা), অষ্টম প্রস্তাব (ধূর্জটিপ্রসাদের 'চিন্তয়সি' গ্রন্থ, বেহারের ভূমিকম্পে বাঙালীর সাহায্য, মনোজগতে ভূমিকম্পের প্রভাব, ১৮৯৭-এর উত্তরবঙ্গের ভূমিকম্প, সেই সময়ে গ্রন্থকারের মনের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা), নবম প্রস্তাব (নেপালের হিস্টরি ও জিওগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা)।

'মুখপত্রে' লেখক বলেছেন :—'১৩৪০ বঙ্গাব্দে চোখে পড়বার মতো নানারূপ ঘটনার বিষয় আমি উদয়ন পত্রিকায় আমার মোৎ-ফরক্কা মতামত প্রকাশ করি। সেই পূর্ব লেখাগুলি একত্র করে আমি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করছি। যখন এ লেখাগুলি প্রথমে প্রকাশিত

হয়েছিল, তখন অনেকের কাছে তা গ্রাহ্য হয়েছিল। সুতরাং আশা করি এখন তা অপাঠ্য বলে গণ্য হবে না। বিশেষতঃ যে সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার একটিও যখন আজ পর্যন্ত মীমাংসিত হয়নি। এ সমালোচনাগুলির 'ঘরে বাইরে' নাম আমি দিইনি, দিয়েছিলেন উদয়ন পত্রিকার সম্পাদক। আমি ও-নামে আপত্তি করিনি। কারণ যে সব কথা আমি বলেছি, সে সব ঘরেরও কথা, বাইরেরও কথা।'

১৭। ঘোষালের ত্রিকথা (গল্প-সংগ্রহ)—(মুখপত্রের তারিখ ২৮. ৯. ৩৭. উৎসর্গপত্রের তারিখ ৩০. ৯. ৩৭.)। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্রকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৯৩। মূল্য পাঁচ সিকা।

সূচী-পত্র—ফরমায়েসি গল্প; ঘোষালের হেঁয়ালি, বীণাবাই।

'মুখপত্রে' লেখক বলেছেন:—'মাসখানেক পূর্বে ঘোষালের বেনামীতে আমার লেখা—'বীণাবাই' নামক গল্পের প্রশংসাসূত্রে বাতায়ন পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার অন্তরে উক্ত প্রবন্ধের লেখক একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ঘোষালের গল্পগুলি একত্র করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা উচিত।...ঘোষালের গল্প একশ্রেণীর পাঠকের অত্যন্ত প্রিয়। 'ফরমায়েসি গল্প' নামক প্রথম গল্পটি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে নতুন-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে আহুতি নামক গল্প-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ঘোষালের হেঁয়ালি' নামক দ্বিতীয় গল্পটি বছর দুয়েক আগে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত আর তৃতীয় গল্প 'বীণাবাই' দু-মাস আগে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। আশাকরি, 'ঘোষালের ত্রিকথা'—পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে।'

১৮। অনুকথা সপ্তক (গল্প-সংগ্রহ)—১৯৩৯ (১৩৪৬)। শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৫৯। মূল্য এক টাকা।

সূচী-পত্র—মন্ত্রশক্তি, যথ, ঝোট্টন ও লোট্টন, মেরি ক্রিস্‌মাস, ফার্স্ট ক্লাশ ভূত, স্বল্প-গল্প, প্রগতি রহস্য।

'উৎসর্গ-পত্রে' লেখক বলেছেন:—'এই গল্পগুলি সবই ছোটগল্প। ছোটগল্পের সংস্কৃত নাম আমি জানিনে—তাই এদের নাম দিয়েছি অণুকথা। এইসব একরত্তি কথার ভিতর কোন বড় কথা নেই, তা সত্ত্বেও এদের অন্তরে যদি কিছু গুণ থাকে ত, তা তোমার মত সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।'

১৯। প্রাচীন হিন্দুস্থান (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—১৯৪০ (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ১১৭। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র—ভূ-বৃত্তান্ত, ইতিবৃত্তান্ত।

২০। গল্প-সংগ্রহ--১৯৪১ (প্রথম সংস্করণ, ২০শে ভাদ্র, ১৩৪৮)। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত। কালীপ্রসাদ চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত (উৎসর্গ-পত্রের তারিখ—৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা ।৷০ (ভূমিকা, সূচীপত্র ইত্যাদি) + ৫০৭ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

প্রমথ চৌধুরী

সূচী-পত্র—প্রবাস-স্মৃতি, চার-ইয়ারী কথা, আহুতি, বড়বাবুর বড়দিন, একটি সাদা গল্প; ছোটগল্প, রাম ও শ্যাম, নীল-লোহিত, নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা, নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর, নীল-লোহিতের আদিপ্রেম, অদৃষ্ট, সম্পাদক ও বন্ধু, গল্প লেখা, পূজার বলি, সহযাত্রী, ঝাঁপান খেলা, দিদিমার গল্প, ভূতের গল্প, ট্রাজেডির সূত্রপাত, অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি, অ্যাডভেঞ্চার—স্থলে, অ্যাডভেঞ্চার—জলে, ভাববার কথা, ফরমায়েসি গল্প; ঘোষালের হেঁয়ালি, বীণাবাই, পুতুলের বিবাহ-বিভ্রাট, মন্ত্রশক্তি, যখ, ঝোট্টন ও লোট্টন; মেরি ক্রিস্‌মাস; ফার্স্টক্লাস ভূত, স্বল্প-গল্প, প্রগতিরহস্য, জুড়ি দৃশ্য, চাহার দরবেশ; সারদাদাদার সন্ন্যাস।

২১। বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা)—(১৯৪৪। প্রেসের তারিখ- ডিসেম্বর, ১৯৪৪) পৃষ্ঠা ১৭। মূল্য আট আনা।

সূচী-পত্র—বাংলা ভাষা সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনার পর নবাবী আমল ও ইংরেজী আমলের বাঙলা সাহিত্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

২২। আত্মকথা (আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব)—(গ্রন্থের তারিখ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, প্রকাশকের নিবেদনের তারিখ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩, ভূমিকার তারিখ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫২, গ্রন্থকারের কৈফিয়তের তারিখ—১৯৪২)। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা ৷৶০ (নামপত্র, উৎসর্গ-পত্র, প্রকাশকের নিবেদন, কৈফিয়ত ইত্যাদি)+১১৪ (মূল গ্রন্থ)। মূল্য আড়াই টাকা।

সূচী-পত্র—জন্ম থেকে বিলাত গমন পর্যন্ত আত্মকথা এতে আলোচিত হয়েছে।

২৩। প্রবন্ধ-সংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)—'বিশ্বভারতী' কর্তৃক প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা সম্বলিত।

এছাড়া প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে 'হিন্দুসংগীত'—১৯৪৫ [প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫২, প্রমথ চৌধুরীর রচনা—হিন্দুসংগীত, সুরের কথা।], দিলীপকুমার রায় ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে 'পত্রাবলী' [মুখপত্রের তারিখ—১লা অক্টোবর, ১৯৩১। প্রমথ চৌধুরীর রচনা—মুখপত্র (/০—৶০), বীরবলের পত্র (৪১—৫২), বীরবলের পত্র (৯০—১০৮)। ফ্রান্সের নব মনোভাব (১২৭—১৪৪)] প্রকাশ করেন। তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ হচ্ছে—'Tales of four friends' [194৹]। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ ও একবিংশ অধিবেশনে প্রদত্ত প্রমথ চৌধুরীর মুদ্রিত অভিভাষণের কথাও-এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর নিম্নলিখিত গল্পগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে—'সেকালের গল্প' [১৩৩৯], নীল-লোহিতের আদিপ্রেম' [১৩৩৯], 'ট্রাজেডির সূত্রপাত' [১৩৪০] ও 'দুই না এক' [১৩৫১]। এছাড়া আরো দু'একটি পুস্তিকা তিনি মুদ্রিত করেছিলেন।

পরিশিষ্ট—২

(ক) জীবন-পঞ্জী

জন্ম—৭ই আগষ্ট, ১৮৬৮। যশোহরে।

পৈতৃক বাস-ভূমি—পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে।

পিতা—দুর্গাদাস চৌধরী (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট)।

শিক্ষা—কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, হেয়ার স্কুল, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডন।

ডিগ্রী- বি এ. (দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান), এম. এ (ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান), বার-অ্যাট-ল।

বিবাহ—রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবীর সঙ্গে।

কর্ম—কলকাতা হাইকোর্ট ও দার্জিলিং কোর্টে ব্যারিষ্টার হিসেবে যোগ দিলেও মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করেন নি কোনোদিন। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন, দক্ষিণেশ্বরের ও গোপাললাল শীল এষ্টেটের রিসিভার এবং ঠাকুর এষ্টেটের ম্যানেজার হন।

সম্মান-লাভ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক লাভ (১৯৩৮) করেন। ১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে দেশবাসী কর্তৃক সম্বর্ধিত হন।

মৃত্যু—২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ (১৩৫৩ সালের ১৬ই ভাদ্র সোমবার রাত্রিতে)

(খ) পত্রিকা-সম্পাদনা

সবুজ-পত্র—প্রথম পর্যায় :

১৩২১ (বৈশাখ)—১৩২৯ (বৈশাখ)?

দ্বিতীয় পর্যায় :

১৩৩২ (ভাদ্র)—১৩৩৪ (ভাদ্র)। মাসের হিসেবে গোলমাল আছে। মোট দু'বছর।

রূপ ও রীতি—১৩৪৭ (কার্তিক)—১৩৪৯ (শ্রাবণ)।

বিশ্বভারতী পত্রিকা—১৩৪৯ (শ্রাবণ)—১৩৫০ (আষাঢ়)।

পরিশিষ্ট—৩

সবুজ-পত্রের সূচীপত্র

'সবুজ-পত্র'—১৩২১

বৈশাখ ঃ

১। মুখপত্র—সম্পাদক। ২। সবুজ-পত্র—বীরবল। ৩। সবুজের অভিযান (কবিতা) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪। বিবেচনা ও অবিবেচনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। হালদার-গোষ্ঠী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সবুজ পাতার গান (কবিতা)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। সাহিত্য-সম্মিলন—প্রমথ চৌধুরী। ২। বাংলা ছন্দ (পত্র)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩। আমরা চলি সমুখ পানে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। হৈমন্তী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। গমনাগমন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। যৌবনে দাও রাজটীকা—বীরবল।

আষাঢ় ঃ

১। শংখ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। আষাঢ়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। বোষ্টমী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। খেয়ালের জন্ম (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। ভারতবর্ষের ঐক্য—প্রমথ চৌধুরী। ৬। বর্ষার কথা—বীরবল। ৭। আষাঢ়ের গান (কবিতা)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রাবণ ঃ

১। সর্বনেশে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। বাস্তব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। বাংলা ছন্দ (পত্র)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। স্ত্রীর পত্র (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। পত্র—বীরবল ৬। উপমা ও অনুপ্রাস—অজিতকুমার চক্রবর্তী। ৭। সহজিয়া (কবিতা)—দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি। ৮। দেবতা (কবিতা)—কালিদাস রায়।

ভাদ্র ঃ

১। লোকহিত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ভাইফোঁটা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। পাড়ি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। সমাজের জীবন—প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। ৫। মন্তব্য (সমাজের জীবন সম্বন্ধে)—সম্পাদক। ৬। অনার্য বাঙালী—বীরেন্দ্রকুমার বসু। ৭। ইউরোপে কুরুক্ষেত্র —প্রমথ চৌধুরী।

পরিশিষ্ট

আশ্বিন ঃ

১। আমার জগৎ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। শেষের রাত্রি (গল্প) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্য—রমাপ্রসাদ চন্দ। ৪। সাহিত্যে আভিজাত্য—মহীতোষকুমার রায়চৌধুরী।

কার্তিক ঃ

১। সন্ধ্যার যাত্রী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। অপরিচিতা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। শেষ প্রণাম (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। যৌথ পরিবার—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ৫। হাসি—সতীশচন্দ্র ঘটক। ৬। নারীর পত্র (বীরবলের মারফত প্রাপ্ত)। ৭। নারীর পত্রের উত্তর—বীরবল।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ—প্রমথ চৌধুরী। ২। ছবি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। জ্যাঠামশায় (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। তাজমহল (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। ফরাসী গীতাঞ্জলির ভুমিকা (ইন্দিরা দেবীর দ্বারা অনূদিত)—আঁদ্রে গীদ। ৬। তেপাটি (কবিতা)—প্রমথ চৌধুরী।

পৌষ ঃ

১। চঞ্চলা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। লড়াইয়ের মূল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। তাজমহল (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। খৃষ্ট ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। নূতন ও পুরাতন—প্রমথ চৌধুরী। ৬। শচীশ (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাঘ ঃ

১। মা-হারা—সরযুবালা দাসগুপ্তা। ২। উপহার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। দামিনী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। বিচার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। সাহিত্যে বাস্তবতা—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। ৬। বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি—প্রমথ চৌধুরী।

ফাল্গুন ঃ

১। শ্রীবিলাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। দুই নারী (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। কর্মযজ্ঞ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। অভিভাষণ—প্রমথ চৌধুরী। ৫। এবার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আবার (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চৈত্র ঃ

১। ফাল্গুনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফাল্গুনী নাটকের মূল সুর ধরিয়ে দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বসন্তের পালা' নামক একটি পালা রচনা করে মূল নাটকটির আগে জুড়ে দিয়েছিলেন।

পালাটির পত্রসংখ্যা আলাদা এবং কাগজের ধঁওও ভিন্ন ধরনের। তাই চৈত্র সংখ্যার (১৩২১) সূচীপত্রের মধ্যে এই পালাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না, 'সবুজ-পত্রের' সম্পাদকেরও যে তা অভিপ্রেত ছিলো না তা বর্ষশেষের পূর্ণাংগ সূচীপত্র পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়।

সবুজ-পত্র—১৩২২

বৈশাখ ঃ

১। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। আমার গান (কবিতা)—রবান্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। তুমি-আমি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। ডায়ারি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। সম্বন্ধ—ইন্দিরা দেবী। ৬। অন্নপূর্ণা (নাটক)—সরযুবালা দাসগুপ্তা।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। কবির কৈফিয়ত্—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। চুট্‌কি (উপন্যাস)—বীরবল। ৪। হিতসাধন—বিধুশেখর ভট্টাচার্য। ৫। দ্বিজেন্দ্র লালের স্মৃতি সভায় কথিত—প্রমথ চৌধুরী। সোনার কাঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ় ঃ

১। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। বেদনা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। যৌবনের পত্র (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। সুরো [গল্প]—মাধুরীলতা দেবী। ৫। ছবির অঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। ভাষার কথা—প্রমথ চৌধুরী। ৭। অব্যক্ত বাসনা (অনূদিত কবিতা)—প্রিয়নাথ সেন।

শ্রাবণ ঃ

১। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। অনাদৃতা [গল্প]—মাধুরীলতা দেবী। ৩। নব্য-দর্শন—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। ৪। সাহিত্যে খেলা—বীরবল। ৫। টীকা টিপ্পনী— ৬। যাত্রা [কবিতা]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাদ্র ও আশ্বিন ঃ

১। ঐতিহাসিক—কিরণশঙ্কর রায়। ২। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। চোর (গল্প)—মাধুরীলতা দেবী। ৪। আদর্শ—ইন্দিরা দেবী। ৫। প্রিগ্—বীরেন্দ্র কুমার বসু। ৬। কৃপণতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭। অজানা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮। শরৎ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯। টীকা টিপ্পনী—১০। স্ত্রীশিক্ষা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট

কার্তিক ঃ

১। বর্তমান বঙ্গসাহিত্য—প্রমথ চৌধুরী। ২। অভিনবের ডায়ারী—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। ৩। বলাকা—(কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। আমার তুমি [কবিতা]—কালিদাস রায়।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। নূতন বসন [কবিতা]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ঘরে-বাইরে [উপন্যাস]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। অলঙ্কারের সূত্রপাত—প্রমথ চৌধুরী। ৪। টীকা টিপ্পনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌষ ঃ

১। শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। নব্য-দর্শন—প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। ৩। পুস্তক প্রশংসা—প্রমথ চৌধুরী। ৪। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। শেক্সপীয়র (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। শিক্ষা বিস্তার—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ৭। মনীষা মঙ্গল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাঘ ঃ

১। ঘরে-বাইরে [উপন্যাস]—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। বৈরাগ্য সাধন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। আর্যধর্মের সহিত বাহ্যধর্মের যোগাযোগ—প্রমথ চৌধুরী। ৪। শিক্ষার নব আদর্শ—বীরবল।

ফাল্গুন ঃ

১। রূপ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। চেয়ে দেখা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। আর্য সভ্যতার সহিত বঙ্গ সভ্যতার যোগাযোগ—প্রমথ চৌধুরী। ৫। কংগ্রেসের আইডিয়াল—বীরবল। ৭। মধ্যাহ্নে (কবিতা)—প্রিয়নাথ সেন।

চৈত্র ঃ

১। ছাত্র শাসনতন্ত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। চার-ইয়ারী-কথা (গল্প)- প্রমথ চৌধুরী। ৩। 'যে কথা বলিতে চাই' (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। ছাত্রের পত্র—সুবোধ চট্টোপাধ্যায়। ৫। নামশূন্যা কন্যা—দেবেন্দ্রনাথ সেন।

'সবুজ-পত্র'—১৩২৩

বৈশাখ ঃ

১। নববর্ষের আশীর্বাদ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। পত্র—বীরবল। ৪। চার-ইয়ারী কথা—প্রমথ চৌধুরী। ৫। জাপান যাত্রীর পত্র (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রমথ চৌধুরী

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়—প্রমথ চৌধুরী। ২। চার-ইয়ারী কথা (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। জাপান যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ় ঃ

১। সমুদ্র যাত্রা—প্রমথ চৌধুরী। ২। জাপান যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। পুস্তক প্রশংসা—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান—প্রমথ চৌধুরী। ৫। প্রত্নতত্ত্বের পারস্য উপন্যাস—বীরবল। ৬। আহুতি (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী।

শ্রাবণ ঃ

১। জাপান যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। গ্রাম্য সাহিত্য সভা—কিরণশঙ্কর রায়। ৩। সোদাহরণ অলঙ্কার—ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র। ৪। পত্র (কবিতা)—সতীশচন্দ্র ঘটক। ৫। স্বপ্ন-তত্ত্ব—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। টীকা টিপ্পনী—বীরবল।

ভাদ্র ঃ

১। জাপান যাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। বড়বাবুর বড়দিন (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ৩। একটি জরুরী প্রস্তাব—ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র। ৪। কবির বিদায় (গল্প)—কিরণশঙ্কর রায়।

আশ্বিন ও কার্তিক ঃ

১। জাপানের পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। নভেল কেন পড়ি—ননীবালা গুপ্ত (বরদা চরণ গুপ্তের ছদ্ম নাম)। ৩। বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা—হারিতকৃষ্ণ দেব। ৪। ফরাসী ও জার্মান (ভাষার কথা)—সতীশচন্দ্র ঘটক। ৫। হিন্দু সঙ্গীত (পত্র)—বিশ্বপতি চৌধুরী। ৬। হিন্দু সঙ্গীত [উত্তর]—প্রমথ চৌধুরী। ৭। বাঙলার গান—অমরবন্ধু গুহ। ৮। রাগ ও মেলডি—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯। স্বপ্নহার [গল্প]—কিরণশঙ্কর রায়। ১০। প্রাণ ও মরণ (কবিতা)—সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য। ১১। সনেট (কবিতা)—প্রমথ চৌধুরী।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। জাপানের পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। প্রিয়নাথ সেন—প্রমথ চৌধুরী। ৩। দাদার ডায়েরী—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৪। শিশু সাহিত্য—বীরবল। ৫। একটি সাদা গল্প (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ৬। দরবেশের উপদেশ—উপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

পৌষ ঃ

১। সুরের কথা—বীরবল। ২। বিয়ের সম্বন্ধ (গল্প)—ভবতারণ সরকার। ৩। সঙ্গীত পরিচয়—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ৪। সাহিত্যের ভাষা—প্রমথ চৌধুরী।

পরিশিষ্ট

মাঘ ঃ

১। 'নতুন কিছু'—বরদাচরণ গুপ্ত। দাদার ডায়েরী—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৩। স্বপ্ন ও জাগরণ—বীরেশ্বর মজুমদার। ৪। সজীব অতীত—বীরেন্দ্রকুমার বসু। ৫। বাঙলার ইতিহাস—অরুণচন্দ্র সেন। ৬। তারিখের শাসন—কিরণশঙ্কর রায়। ৭। সমুদ্র বক্ষে—যোগেন্দ্রনাথ সরকার শর্মা। ৮। দাঁড় কাক [গল্প]—সতীশচন্দ্র ঘটক। ৯। শিশু শিক্ষা—মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ফাল্গুন ঃ

১। আমাদের শিক্ষা—প্রমথ চৌধুরী। ২। সত্যনিষ্ঠা—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ৩। শিক্ষার লক্ষ্য—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ৪। দাদার ডায়েরী—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৫। লোক শিক্ষা—বরদাচরণ গুপ্ত। ৬। রূপের কথা—বীরবল।

চৈত্র ঃ

১। সম্পাদকের নিবেদন। ২। শিশুশিক্ষাব মূলমন্ত্র—শরৎকুমারী চোধুরাণী। ৩। আমাদের অহঙ্কার—কিরণশঙ্কর রায়। ৪। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উক্তি—সুশীলকুমার দাসগুপ্ত। ৫। ভাষার কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। ফাল্গুন—বীরবল। ৭। সালতামামি—প্রমথ চৌধুরী।

'সবুজ-পত্র'—১৩২৪

বৈশাখ ঃ

১। সম্পাদকের কৈফিয়ত। ২। সাহিত্যের সার্থকতা—বীরবল। ৩। লিখিবার ভাষা (বঙ্কিমেব মত)—প্রমথ চৌধুরী। ৪। বর্তমান সাহিত্য—বরদাচরণ গুপ্ত। ৫। জাপানের কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। ভাষার কথা—নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ৭। ভাষার কথা সম্পর্কে মন্তব্য—সম্পাদক।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২। ভাষাব কথা—সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী ৩। ভাষার কথা সম্পর্কে মন্তব্য—সম্পাদক। ৪। পরমায়ু (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫। একটি ঘটনা (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ। ৬। ধরতাই বুলি—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৭। টী-পার্টি—হারিতকৃষ্ণ দেব। ৮। তপস্বিনী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ় ঃ

১। মুখ রক্ষা (গল্প)—সতীশচন্দ্র ঘটক। ২। সংস্কৃতির প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য—দয়াল চন্দ্র ঘোষ। ৩। পয়লা নম্বর (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। কৌতুকময়ী (কবিতা)—সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রমথ চৌধুরী

শ্রাবণ ঃ

১। প্রাণের কথা—প্রমথ চৌধুরী। ২। কথা ও সুর—প্রমথ চৌধুরী। ৩। বাঙ্‌লা ভাষার কুলের খবর—প্রমথ চৌধুরী। ৪। অহল্যা—বীরবল। ৫। দুখানি চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬। নূতন ও পুরাতন—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাদ্র ঃ

১। সংগীতের মুক্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। স্বামী-স্ত্রী—বরদাচরণ গুপ্ত। ৩। অচলায়তন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৪। শিক্ষা-সমস্যা—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক ঃ

১। অন্ন-চিন্তা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২। সাহিত্য বিচার—শিশিরকুমার সেন। ৩। আচার ও ও বিচার—দয়ালচন্দ্র ঘোষ। ৪। শরৎ (কবিতা)—প্রমথ চৌধুরী। ৫। কংগ্রেসের দলাদলি —বীরবল। ৬। আমার ধর্ম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭। বুদ্ধিমানের কর্ম নয়—বরদাচরণ গুপ্ত। ৮। দুখানি ফরাসী চিঠি—মেটারলিঙ্ক ও রোম্যাঁ রোলাঁ। ৯। গীতি কবিতা—সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১০, সনেট (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ—প্রমথ চৌধুরী ২। বাঙ্গলার রেখাপ বর্ণমালা—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩। পঙ্কক—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৌষ ঃ

১। পাত্র ও পাত্রী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ভদ্রতা—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ৩। লাভালাভ—বিশ্বপতি চৌধুরী। ৪। 'ঘরে-বাইরে'—অরবিন্দ সেন।

মাঘ ঃ

১। শক্তিমানের ধর্ম—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২। সুর ও তাল—শিশিরকুমার সেন। ১। গ্রীসে ভাষার লড়াই—নীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। ৪। পত্র—প্রমথ চৌধুরী। ৫। বালাই (গল্প) —প্রবোধ ঘোষ। ৬। তোতাকাহিনী (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফাল্গুন ঃ

১। বেহিসাবের নিকাশ—বরদাচরণ গুপ্ত। ২। জাতীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা—বীরেশ্বর মজুমদার। ৩। হৈরা (গল্প)—সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য। ৪। বিদ্যাপতি—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ৫। বাজে তর্ক—কান্তিচন্দ্র সেন।

চৈত্র ঃ

১। ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ফরমায়েসী (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী।

পরিশিষ্ট

'সবুজ-পত্র'—১৩২৫

বৈশাখ ঃ

১। যুক্তি (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২। ভারতবর্ষ (মানসী মূর্তি)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৩। নব বিদ্যালয়—প্রমথ চৌধুরী। ৪। গুরু—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ৫। নববর্ষ—বিশ্বপতি চৌধুরী। ৬। পত্র—বীরবল। ৭। দেশের কথা—প্রমথ চৌধুরী।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। বাঙালীর শিক্ষা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২। বিবাহের পণ—হরপ্রসাদ বাগ্‌চি। ৩। নবীন সাহিত্যিক—বরদাচরণ গুপ্ত। ৪। পত্র—বীরবল। ৫। রবীন্দ্রনাথের পত্র। ৬। ছিন্ন পত্র (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আষাঢ় ঃ

১। নব বিদ্যালয়—প্রমথ চৌধুরী। ২। ছু-ছু-বার—বিশ্বপতি চৌধুরী। ৩। কালো মেয়ে (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪। প্রাক্‌টিক্যাল—কিরণশঙ্কর রায়। ৫। সমুদ্রের ডাক (গল্প) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। 6. Indian Literature—Pramatha Chaudhury.

শ্রাবণ ঃ

১। বইপড়া—প্রমথ চৌধুরী। ২। সাহিত্যের জাত রক্ষা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৩। ছোট গল্প (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী। ৪। 'এতো বড়ো' কিম্বা 'কিছু নয়'—প্রমথ চৌধুরী। ৫। ছোট কালীবাবু (তেপাটি কবিতা)—প্রমথ চৌধুরী।

ভাদ্র ঃ

১। পত্র—বীরবল। ২। শাস্ত্র ও স্বাধীনতা—দয়ালচন্দ্র ঘোষ। ৩। পয়ার—প্রমথ চৌধুরী। ৪। একটি সত্যি গল্প (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৫। বন্ধু (গল্প)—বীরেশ্বর মজুমদার।

আশ্বিন ঃ

১। স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর পত্র। ২। পত্র—বীরবল। ৩। সাহিত্যের জাত রক্ষা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৪। রোম—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ৫। নব বিদ্যালয় (পত্র)—প্রমথ চৌধুরী।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ঃ

১। গ্রীস ও রোম—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ২। একটি প্রেমের গান—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৩। বাঙ্‌লা কি পড়ব ?—প্রমথ চৌধুরী। ৪। একখানি ছোট্ট উপন্যাস (গল্প)—বীরেশ্বর মজুমদার। ৫। বাঙ্‌লা ভাষার কুলজী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৬। রাম ও শ্যাম (গল্প)—বীরবল।

প্রমথ চৌধুরী

পৌষ ঃ

১। একতারা (সমালোচনা)—সতীশচন্দ্র ঘটক। ২। সাহিত্য ও নীতি—যতীন্দ্রনাথ বসু। ৩। অবরোধের কথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৪। রুবেইয়াত্-ই-ওমর খৈয়াম (কবিতা) —কান্তিচন্দ্র ঘোষ। ৫। দেশের কথা—প্রমথ চৌধুরী।

মাঘ ঃ

১। ভূতের বোঝা—দয়ালচন্দ্র ঘোষ। ২। অভিভাষণ—আশুতোষ চৌধুরী। ৩। খাটি বাঙালী—কিরণশঙ্কর রায়। ৪। পাটেল বিল—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৫। দেবী (কবিতা)—কালিদাস রায়।

ফাল্গুন ঃ

১। নীতি শিক্ষা—ইস্কুল মাষ্টার; ২। ভারতবর্ষ সভ্য কিনা—বীরবল; ৩। নব বসন্তে—প্রিয়ম্বদা দেবী; ৪। স্বর্গ-মর্ত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৫। পাটেল বিল—ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী।

চৈত্র ঃ

১। একটি অসম্ভব গল্প (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী; ২। সামাজিক সাহিত্য—বরদাচরণ গুপ্ত; ৩। আর্যামি—অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

'সবুজ-পত্র'—১৩২৬

বৈশাখ ঃ

১। গান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ২। রবীন্দ্রনাথের পত্র; ৩। খোলা চিঠি—প্রমথ চৌধুরী; ৪। সম্পাদকের নিবেদন—প্রমথ চৌধুরী; ৫। নববর্ষ—বীরবল; ৬। ভবভূতি (কবিতা) —শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা; ৭। প্রতিধ্বনি (কবিতা) শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা; ৮। প্রেম (কবিতা) —কান্তিচন্দ্র ঘোষ; ৯। রূপ (কবিতা)—সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য; ১০। উড়ো চিঠি—মৃত্যুঞ্জয়; ১১। মুক্তির ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—অতুল চন্দ্র গুপ্ত।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। ওমর খৈয়াম—প্রমথ চৌধুরী; ২। উপকথা (অনূদিত গল্প)—প্রমথ চৌধুরী; ৩। অতীতের বোঝা—ওয়াজেদ আলি; ৪। নেশার কাজ (গল্প)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ; ৫। সাহিত্য-চর্চা (অনুবাদ সাহিত্য)—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী; ৬। দু-ইয়ারকি—প্রমথ চৌধুরী; ৭। সচ্চিদানন্দ—সরলাদেবী চৌধুরাণী।

পরিশিষ্ট

আষাঢ় ঃ

১। ঝিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী (অনুবাদিকা—প্রিয়ম্বদা দেবী) ; ২। আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্যা—প্রমথ চৌধুরী ; ১। কথিকা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ৪। একখানি পত্র—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ; ৫। মুক্তি (গল্প)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

শ্রাবণ ঃ

১। কথিকা (গল্প) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। ঝিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী (অনুবাদিকা—প্রিয়ম্বদা দেবী) ; ৩। পত্র—শিশিরকুমার সেন ; ৪। ইঙ্গ সবুজ-পত্র—বীরবল ৫। ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্ (গল্প)—সুরেশানন্দ ভটাচার্য ; ৬। মানুষ ও সমাজ—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৭। ভাই বোন (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ।

ভাদ্র ঃ

১। কথিকা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। বিজ্ঞাপন-রহস্য—বীরবল ; ৩। ভারতের নারী—বীরেন্দ্রকুমার দত্ত ; ৪। মেয়ের বাপ (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ ; ৫। মিলনাকাঙ্ক্ষা (কবিতা)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ ; ৬। বিরহাকাঙ্ক্ষা (কবিতা)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ ; ৭। সোহাগ (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ; ৮। কবি—কান্তিচন্দ্র ঘোষ ; ৯। উন্মাদয়ন্তী জাতক—সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য (অনূদিত) ; ১০। মহাদেব (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী , ১১। নবীনের প্রতি (কবিতা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

আশ্বিন ঃ

১। নতুন রূপকথা (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ২। দৃষ্টি (কবিতা)—হেমেন্দ্রলাল রায় ; ৩। ঝিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী (অনুবাদিকা—প্রিয়ম্বদা দেবী), ৪। বিসর্জন (গল্প)—বীরেশ্বর মজুমদার ;

কার্তিক ঃ

১। বাঁশী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। সভ্যতার কষ্টি পাথর—ওয়াজেদ আলি ; ৩। ঝিলে জঙ্গলে শিকার—কুমুদনাথ চৌধুরী (অনুবাদিকা—প্রিয়ম্বদা দেবী) ; ৪। 'আনন্দ মঠ'—কিরণ শঙ্কর রায় ; ৫। উপকথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। অদৃষ্ট ? (অনূদিত গল্প)—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী , ২। অদৃষ্ট (গল্প)—প্রমথ চৌধুরী ; ৩। নবযুগের কথা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; ৪। বাদল ধারা (কবিতা)—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার ; ৫। কথিকা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌষ ঃ

১। বন্ধু—সরলা দেবী ; ২। উড়ো চিঠি—অশান্ত ; ৩। শিল্পী (গল্প)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ ; ৪। ভারতের নারী—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫। আলো ও ছায়া (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ ; ৬। ঝিলে জঙ্গলে শিকার (প্রিয়ম্বদা দেবী অনূদিত)—কুমুদনাথ চৌধুরী ; ৭। ডিমোক্রাসি—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মাঘ ঃ

১। প্রাচ্যে শক্তিবাদ—প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত ; ২। সাহিত্য বনাম পলিটিক্স—বীরবল ৩। টীকা ও টিপ্পনী—বীরবল।

ফাল্গুন ও চৈত্র ঃ

১। আমার কথা (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। রেণার কয়েক পৃষ্ঠা (ফরাসী থেকে অনূদিত)। ৩। পত্র—বীরবল ; ৪। বাপ ও ছেলে (গল্প)—সতীশচন্দ্র ঘটক। ৫। রায়তের কথা—প্রমথ চৌধুরী।

'সবুজ-পত্র'—১৩২৭

বৈশাখ ঃ

১। সম্পাদকের নিবেদন ; ২। অশান্তের দল (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৩। পত্র—বিল্বপত্র ; ৪। শাস্ত্র ও স্বাধীনতা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৫। ফাঁকা (গল্প)—সতীশচন্দ্র ঘটক ; ৬। প্রজাস্বত্বের কথা—হৃষীকেশ সেন ; ৭। আর্য-অনার্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ৮। পাগল (কবিতা)—যোগীন্দ্রনাথ রায়। ৯। পত্র—বীরবল।

জ্যৈষ্ঠ ঃ

১। নব রূপকথা—প্রমথ চৌধুরী ; ২। ওমর খৈয়াম —তরিকুল আলম ; ৩। টীকা ও টিপ্পনী—প্রমথ চৌধুরী ; ৪। উপকথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৫। মন বদলানো—মণি গুপ্ত ; ৬। পলাশ (কবিতা)—যোগীন্দ্রনাথ রায়। ৭। মাভৈঃ (কবিতা)—যোগীন্দ্রনাথ রায়। ৮। স্বাভাবিক নেতা—হৃষীকেশ সেন। ৯। সত্যদৃষ্টি (কবিতা)—অমিয় চক্রবর্তী। ১০। স্মৃতির ক্ষণিকতা (কবিতা)—অমিয় চক্রবর্তী। ১১। মোসলেম ভারত—প্রমথ চৌধুরী।

আষাঢ় ঃ

১। আষাঢ়ে গল্প (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২। জয়দেব—প্রমথ চৌধুরী। ৩। অনুরোধ (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৪। প্রজাস্বত্বের কথা (২)—হৃষীকেশ সেন।

পরিশিষ্ট

শ্রাবণ ঃ

১। বৈশ্য—অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২। পুতলি (গল্প)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ। ৩। দ্বীপান্তরের বাঁশী (আলোচনা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৪। বিচার (কথিকা)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়; ৫। চিঠি (কবিতা)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ৬। আজ ঈদ—তরিকুল আলম। আদিম মানব—প্রমথ চৌধুরী।

ভাদ্র ঃ

১.। শিল্পীর সাধনা (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ২। অভিভাষণ—প্রমথ চৌধুরী। ৩। বিলাতের পত্র—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪। কৈফিয়ত—প্রমথ চৌধুরী।

আশ্বিন ঃ

১। রামমোহন রায়—প্রমথ চৌধুরী। ২। ননকো-অপারেশন—তারাদাস দত্ত; ৩। কবি কথা (কবিতা)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ। ৪। উড়ো চিঠি—অশান্ত। ৫। গত কংগ্রেস—বীরবল।

কার্তিক ঃ

১। কাব্য ও কল্পনা—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। ২। প্রজাস্বত্বের কথা (৩)—হৃষীকেশ সেন; ৪। রমণী (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৪। রাস্কেল (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ; ৫। বিলাতের পত্র—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; ৬। বাঙ্লার কথা—প্রমথ চৌধুরী; ৯। ভুল স্বীকার—প্রমথ চৌধুরী।

অগ্রহায়ণ ঃ

১। বাঙালী-পেট্রিয়টিজম্ প্রমথ চৌধুরী, ২। রামমোহন রায় ও যুগধর্ম—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; ৩। প্রেমের সমাধি (কবিতা)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ; ৪। মুখ চেনা—তারাদাস দত্ত; ৫। ত্যাগী (কথিকা)—কান্তিচন্দ্র ঘোষ; ৬। পুরোনো কথা—বীরবল।

পৌষ ঃ

১। উকিলের কথা—জুনিয়র উকিল; ২। গৌরী দানের ফল (গল্প) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী; ৩। প্রাপ্তি (কবিতা)—যোগীন্দ্রনাথ রায়; ৪। বাঙালী যুবকের মনের কথা (তিনটি যুবকের তিনখানি পত্রের কিয়দংশ); ৫, সহজিয়া (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী; ৫। দুই বন্ধু (অনূদিত গল্প)—ননীমাধব চৌধুরী; ৬। 'ডেট্রাক্টিব'এর ওজর—মণি গুপ্ত; ৪। ভুল (গল্প)—প্রবোধ ঘোষ।

মাঘ ঃ

১। উড়ো চিঠি—মৃত্যুঞ্জয়, ২। 'দাস মনোভাব'—নগেন্দ্র গুহ রায়; ৩। প্রকৃতির অভিসার (কবিতা)—ভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী; ৪। প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)—ভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী; ৫। বন্ধু (গল্প) প্রবোধ ঘোষ; ৬। বাঙালী যুবক ও নন্-কো-অপারেসন (নন্ কো-অপারেসন সম্পর্কে কয়েকটি যুবকের মনোভাব), ৭। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

ফাল্গুন ও চৈত্র ঃ

১। বসন্ত বাতাসে (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী, ২। মাঘের প্রতিশোধ (অনূদিত গল্প) ননীমাধব চৌধুরী, ৩। আবুল ফজলের পত্র—আবুল ফজল; ৪। একখানি পত্র...

৫। সেবিকা (কবিতা)- কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ৬। গীতায় অর্জুন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৬। গাছ—সতীশচন্দ্র ঘটক ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮। দাস্য ভাব—রঙীন হালদার; ৯। সম্পাদকের নিবেদন।

'সবুজ-পত্র'—১৩২৮

১৩২৮ এর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা বের হয় নি।
প্রমথ চৌধুরীর কৈফিয়ত প্রকাশিত হয়েছে শ্রাবণের (১৩২৮) 'সম্পাদকের' নিবেদনে।

আষাঢ় ঃ

১। Slave Mentality বা শূদ্র আত্মা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ২। দেশের শিক্ষা—সতীশচন্দ্র ঘটক, ৩। রুশীয় কৃষক—হৃষীকেশ সেন, ৪। আমার খুড়ো (অনূদিত গল্প)—ননীমাধব চৌধুরী, ৫। কুঁজ্যার ভবিষ্যৎ (অনূদিত সাহিত্য)—কিরণশঙ্কর রায়, ৬। সম্পাদকের নিবেদন—প্রমথ চৌধুরী।

ভাদ্র ঃ

১। আমাদের সংগীত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ২। শিক্ষার মিলন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৩। অভিভাষণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৪। পট (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৫। অভিনন্দন (রবীন্দ্রনাথকে)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬। আশীর্বচন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; ৭। রবি প্রশস্তি (কবিতা)—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

আশ্বিন ঃ

১: নির্বাসিতের আত্মকথা—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী; ২। কবি মধুসূদন (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী; ৩। বিদ্রোহী (কবিতা)—সতীশচন্দ্র ঘটক; ৪। দরিদ্র নারায়ণায় নমঃ—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; ৫। উড়ো চিঠি—হাবিলদার, ৬। হিন্দু জাতির পরিণাম—রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৭। টিপ্পনী—বীরবল, ৮। ভারতের শিক্ষার আদর্শ (অনুবাদ সাহিত্য) —অমূল্যরতন প্রামাণিক ; ৯। নারীর পত্র—জনৈক বঙ্গনারী।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ঃ

১। লেখকের প্রার্থনা (অনুবাদ সাহিত্য)—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ২। ভারতের শিক্ষার আদর্শ (অনুবাদ সাহিত্য)—অমূল্যরতন প্রামাণিক, ৩। পত্র—বীরবল, ৪। ফরাসী-কবি 'বোদেলের'—নলিনীকান্ত গুপ্ত, ৫। বিলাত প্রবাসীর পত্র—নাম নেই, ৬। বেদুইন (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৭। উড়ো চিঠি—অতিথি, ৮। নৃত্য শিক্ষক (অনূদিত গল্প)—ননীমাধব চৌধুরী।

পৌষ ঃ

১। ভারতের শিক্ষার আদর্শ (অনুবাদ সাহিত্য)—অমূল্যরতন প্রামাণিক, ২। যুগল পত্র —দিলীপকুমার রায় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৩। জার্মাণী সম্বন্ধে দুই চারিটি সাধারণ কথা— দিলীপকুমার রায় ; ৪। দিল মহলের গল্প (গল্প)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৫। গেল মাঘ (কবিতা)—প্রিয়ম্বদা দেবী।

মাঘ ও ফাল্গুন ঃ

১। ভারতের শিক্ষার আদর্শ (অনুবাদ সাহিত্য)—অমূল্যরতন প্রামাণিক ; ২। স্বর্ণ বনাম লোহ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ ; ৩। সিদ্ধি (গল্প)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ৪। বসন্তের রাণী— বীরবল ; ৫। চিরন্তনী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৬। গীতাঞ্জলি ও সত্য কবিতা (আলোচনা)— অমিয় চক্রবর্তী, ৭। বক্‌শীস্ (গল্প)—সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, ৮। কঃ পন্থা—বীরবল ; ৯। জেনোয়া কনফারেন্স—প্রমথ চৌধুরী।

চৈত্র (১৩২৮) ও বৈশাখ (১৩২৯) ঃ

১। জাপানের জাতীয়তা (অনুবাদ সাহিত্য)—অমূল্যরতন প্রামাণিক ; ২। পঁচিশে বৈশাখ (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। যুদ্ধের কথা (প্রশ্ন)—বীরবল ; ৪। যুদ্ধের কথা (উত্তর)—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ৫। যুদ্ধের কথা (প্রত্যুত্তর)—বীরবল ; ৬। জুলি রোমেন (অনুবাদ সাহিত্য)—ননীমাধব চৌধুরী, ৭। গৃহলক্ষ্মী—সোণামাখা দেবী, ৮। আমাদের শিক্ষা সঙ্কট (১)—বীরবল ; ৯। আমাদের শিক্ষা সঙ্কট (২)—বীরবল।

'সবুজ-পত্র'—১৩৩৩-৩৪

(দশম বর্ষ)

আশ্বিন ঃ ১৩৩৩

১। রবীন্দ্রনাথের পত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা (আলোচনা)— প্রমথ চৌধুরী ; ৩। বাঙলা ভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ;

৪। দ্বন্দ্ব (কবিতা)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; ৫। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—প্রসন্নকুমার সমাদ্দার ; ৬। উভয় সঙ্কট—প্রমথ চৌধুরী ; ৭। নারীর দান (কবিতা)—জাহাংগীর বকিল ; ৮। সাধুমা'র কথা—নাম নেই ; ৯। ভারতবর্ষে (অনুবাদ সাহিত্য)—মাদাম লেভি ; ১০। চুপচুপ—বীরবল।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ঃ

১। গাছ—সতীশচন্দ্র ঘটক ও জ্যোতি বাচস্পতি ; ২। বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যে মানবতার বিকাশ—রমেশ বসু ; ৩। রবীন্দ্রনাথ—দিলীপকুমার রায় ; ৪। কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; ৫। সমালোচনা—প্রমথ চৌধুরী , ৬। পাবনার কথা—প্রমথ চৌধুরী ; ৭। গণেশ—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; ৮। সাধুমা'র কথা—নাম নেই ; ৯। নটরাজের নৈবেদ্য—গোপাল হালদার ; ১০। গাত-পঞ্চক্ (গান)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌষ ঃ ১৩৩৩

১। রবীন্দ্রনাথ—দিলীপকুমার রায় ; ২। কথা সাহিত্য—প্রমথ চৌধুরী ; ৩। ভারতের শিল্পী—কুমারলাল দাসগুপ্ত ; ৪। সাধুমা'র কথা—নাম নেই ; ৫। মনের পথে—বীরবল ; ৬। নূতন লেখক—প্রমথ চৌধুরী , ৭। 'জানিনা'—জাহাংগীর বকিল ; ৮। গাছের ভিতরটা—সতীশচন্দ্র ঘটক ও জ্যোতি বাচস্পতি , ৯। ভারতবর্ষে (অনুবাদ সাহিত্য)—মাদাম লেভি।

মাঘ ঃ ১৩৩৩

১। অভিভাষণ—প্রমথ চৌধুরী , ২। পেন্সনের পর (গল্প)—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৩। উপসংহার—দিল্লীপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি ; ৪। দিল্লীর সম্মিলনী ও 'ডাকঘর'—অবনীনাথ রায়।

ফাল্গুন ১৩৩৩

১। সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ২। গাছ—সতীশচন্দ্র ঘটক ও জ্যোতি বাচস্পতি ; ৩। সাধুমা'র কথা—নাম নেই ; ৪। কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত ; ৫। একখানি পত্র—প্রশান্ত মহলানবিশ।

চৈত্র ১৩৩৩ ঃ

১। বীরবল প্রমথ চৌধুরী ; ২। সুন্দর ও সৌন্দর্য—যামিনীকান্ত সেন ; ৩। অভিভাষণ—মিসেস আর. এস. হোসেন ; ৪। সাধুমা'র কথা—নাম নেই ; ৫। সিন্ধু পারে (কবিতা)—শ্রী।

বৈশাখ ১৩৩৪ ঃ

১। শেষ মধু (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২। অনু-হিন্দুস্থান—প্রমথ চৌধুরী ; ৩। গাছ—সতীশচন্দ্র ঘটক ; ৪। চৈতালি—প্রমথনাথ বিশি ; ৫। পাখীর কথা—নাম নেই।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় : ১৩৩৪

১। ভ্রাম্যমানের জল্পনা—দিলীপকুমার রায়, ২। গানের কথা—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩। বীরবলের পত্র—বীরবল, ৪। পরিচ্ছদ কলা—যামিনীকান্ত সেন, ৫। গাছ—সতীশচন্দ্র ঘটক, ৬। লেখা—প্রমথ চৌধুরী, ৭। সাধুমা'র কথা—নাম নেই।

শ্রাবণ ও ভাদ্র : ১৩৩৪

১। বঙ্কিম সাহিত্যে মানবতার আদর্শ—রমেশ বসু, ২। ভ্রাম্যমানের জল্পনা—দিলীপকুমার রায়, ৩। বার্ধক্য ও বৃদ্ধের 'আবদাব'—নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, ৪। চীন ও ইউরোপ (অনুবাদ সাহিত্য)—ননীমাধব চৌধুরী, ৫। রবীন্দ্রনাথ ও টম্সন্—প্রমথ চৌধুরী, ৬। ফরাসী সাহিত্য—প্রমথ চৌধুরী, ৭। পূর্ব ও পশ্চিম—প্রমথ চৌধুরী, ৮। পূর্ব ও পশ্চিম প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৯। বর্ষ শেষ—প্রমথ চৌধুরী।

পরিশিষ্ট—৪

নামাবলী

[যে সমস্ত জীবিত ও মৃত লেখকের রচনা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকা।]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, কালিদাস রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পুলিনবিহারী সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, মন্মথমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সুকুমার সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, Andre Gide, G. K. Chesterton, G. E. B. Saintsbury, Middleton Murry, M. Evans, W. Pater, W. C. Hazlitt.

সমাপ্ত